KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩৫/? ৩৫/?	Year of Publication : শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor দিলীপকুমার গুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত ॥ চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রাবণ –

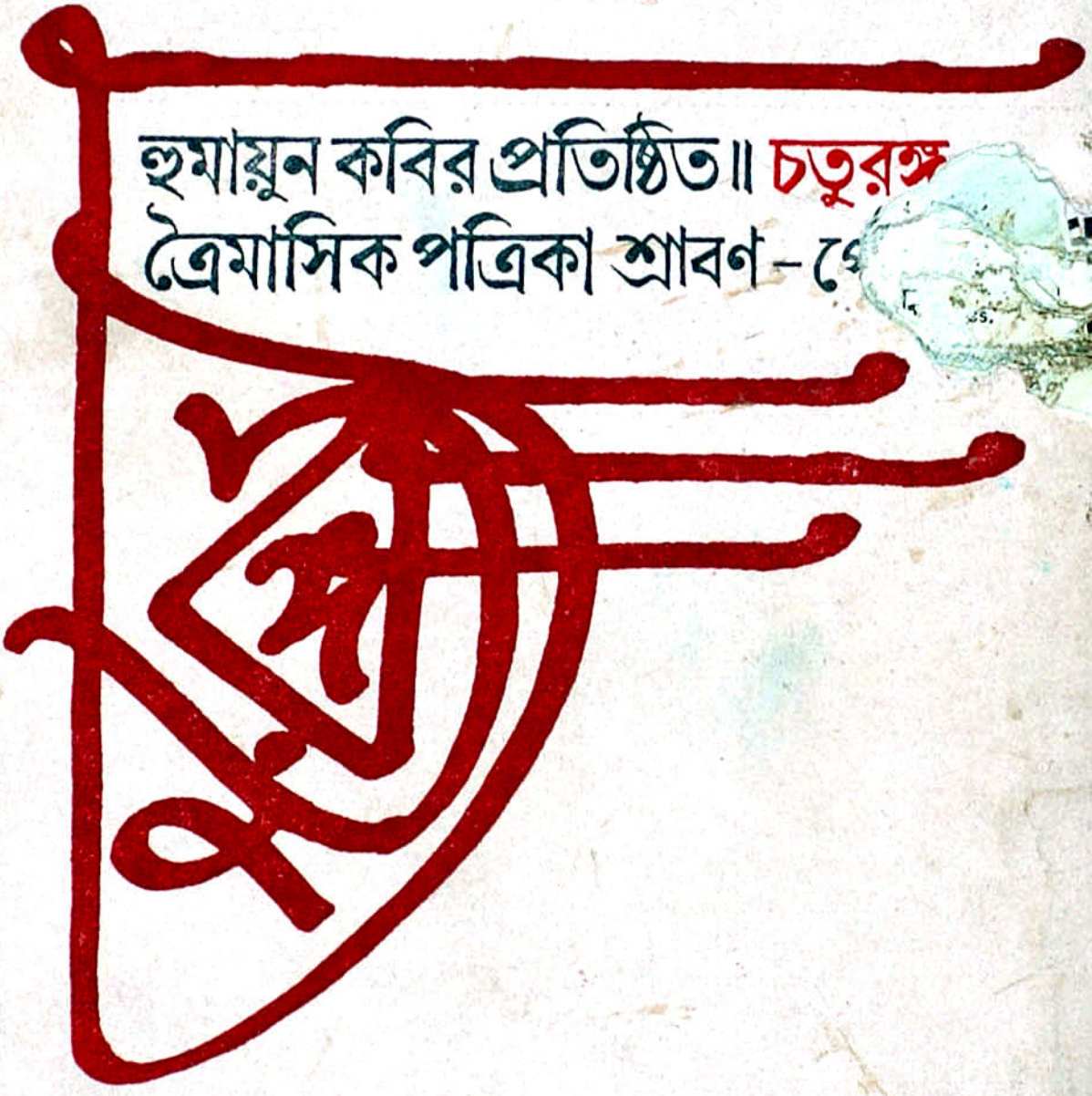

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৪৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সন্দীপ দত্ত
১৮/এম, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৫ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০

সূচিপত্র

রমাকান্ত চক্রবর্তী। উনিশ শতকের 'কলিকাতা-সভ্যতা' এবং 'বাঙাল' ১১১
লোকনাথ ভট্টাচার্য। মুঠো ১২১
শামসুর রাহমান। এক ধরনের অহংকার ১২২
সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় প্রকৃতি ১২৪
ফণিভূষণ আচার্য। ক্ষয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ উদ্ভিদ ১২৫
সুনীথ মজুমদার। মুখোমুখি ১২৬
অসীম রায়। আবহমান কাল ১২৭
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পকৃতি ১৭৮
দিনেশচন্দ্র রায়। ঐরাবতের মৃত্যু ১৮৫
রনে দেকার্ত। রীতি বিষয়ক আলোচনা ২০০
সমালোচনা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, স্বপন মজুমদার ২১৪

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক নালন্দা প্রেস, ১৫১-১৪৩ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। বিজ্ঞাপন এবং কভার রে এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ৩এ, ম্যাজ লেন, কলিকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত।

চতুরঙ্গ

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, মুদ্রণের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসের ব্যয়াধিক্যের চাপে প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে সার্বিক সংকট দেখা দিয়েছে ত্রৈমাসিক পত্র হলেও, বলা বাহুল্য, **চতুরঙ্গ** তা থেকে অব্যাহতি পায়নি। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিপর্যস্ত অবস্থায় পত্রিকার গঠন-পারিপাট্যের মানও যথেষ্ট উন্নত রাখা সম্ভব হল না। সময়সীমা লঙ্ঘনের অনিবার্য ফলস্বরূপ বর্তমান সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ একত্রে যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল। **এই সংখ্যা থেকে মূল্য ১·৭৫ পয়সা ধার্য করা হয়েছে।**

আগামী সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপনের হারও আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি করা হল।
প্রতি পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা,
অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা।

কার্যালয় : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু
কলিকাতা-১৩

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৫ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০

উনিশ শতকের ‘কলিকাতা-সভ্যতা’ এবং ‘বাঙাল’

রমাকান্ত চক্রবর্তী

‘বাঙাল’ কথাটির আভিধানিক অর্থ দুটি : [১] পূর্ববঙ্গবাসী; [২] গ্রাম্য ও অমার্জিত লোক। দ্বিতীয় অর্থে স্কচ্-রা বৃটেনের বাঙাল; ইউক্রেনের অধিবাসিগণ রাশিয়ার বাঙাল; দক্ষিণ জার্মানীর লোকরা উত্তর জার্মানীর বাঙাল; তাঙ ও মিঙ যুগের চৈনিক উপন্যাসে দক্ষিণ চীনের সমুদ্রোপকূলবর্তী অধিবাসিগণ চীনের বাঙাল। এরিস্টোফেনিস্-এর নাটকে স্পার্টার লোকরা এথেন্স-এর বাঙাল, এবং আলিফ্ লায়লা-য় মরুবাসী বেদুইন, বাগদাদের বাঙাল।

বাঙলাদেশে পূর্ববঙ্গের লোক দুটি বিশেষ অর্থে ‘বাঙাল’। একটি অর্থ, উচ্চারণ-বৈষম্য-দ্যোতক। অপর অর্থ নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক। ‘বাঙাল’ কথাটির বাঙলা অর্থে কিছু পরিমাণে প্রাদেশিকতা আছে। অভিধানের দু’টি অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি অর্থ হয়ে যায়। ‘বাঙাল মনুষ্য নয়.........’—এই প্রবচন এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত। ‘বাঙাল’ উচ্চারণ যে কতগুলি ভাষা-তাত্ত্বিক নিয়মের ফলশ্রুতি—এই আবিষ্কার খুবই অর্বাচীন।

দুটি বিশেষ অর্থে ‘বাঙাল’-এর অস্তিত্ব বৃন্দাবন দাস রচিত “চৈতন্য-ভাগবতে” প্রথম দেখা যায়। এই গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত”র পূর্বেই রচিত হয়েছিল; তখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বেঁচেছিলেন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, চৈতন্যদেব প্রথম যৌবনে অর্থ উপার্জনের জন্য পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি ‘বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া/বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥’ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদে-শান্তিপুরের লোকদের পূর্বদেশী ‘বাঙ্গাল’ সম্পর্কে এই নাসিকাকুঞ্চনের তথ্য নিশ্চয় কৌতূহলোদ্দীপক। (দ্রষ্টব্য : বৃন্দাবন দাস, “চৈতন্য-ভাগবত”, আদি, ১২)। মহাপ্রভুর অপর সমসাময়িক জীবনী লেখক লোচন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে লিখেছিলেন : ‘পাণ্ডব-বর্জিত দেশ সর্বলোকে গায়। গঙ্গা হআ গঙ্গা নহ এই সাক্ষী তায় ॥” (“চৈতন্যমঙ্গল”, পৃঃ ৪৭) অথচ, প্রায় চারশ’ বছর আগের প্রাচীন পদকর্তা, এবং বাঙলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তক, লোচন-দাস তাঁর পদাবলীতে বহু বাঙাল কথা ব্যবহার করেছিলেন। যথা : ‘হাইস্যা হাইস্যা ঘর সান্ধাইল বিনোদনাগর কালা’; ‘কিসের কতা কৈতেছিলি নন্দের পোয়ের সনে’; ‘কিসের

লাইগ্যা ডর করিব বাপের ঘরের ঝি'; ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য-হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী") মুকুন্দরামও 'বাঙ্গাল' মাঝিদের সামুদ্রিক ঝড়ে ভয় পেয়ে 'বাফৈ বাফৈ' বলে কান্নার উল্লেখ করেছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালটার হামিলটন কলিকাতার পরিবেশে বাঙালদের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন; তিনি লিখেছিলেন :

The people of Calcutta who speak the Gour dialect of the Bengalese, although confounded by the natives of Western Hindostan with the Bengalese, take in their turn the trouble to ridicule the inhabitants of Dacca, who are the proper Bengalese; and Calcutta being now the capital, the men of rank at Dacca are becoming ashamed of their provincial accent, and endeavour to imitate the Baboos . . . of the modern metropolis. (*Description of Hindostan*, Vol. 1, p. 186)

লক্ষণীয়, হামিলটন্ 'গৌড়'-ভাষাকে আসল বাঙলা ভাষা বলে বিবেচনা করেননি। তাঁর মতে, আসল বাঙলা ভাষা ছিল ঢাকাই ভাষা। ঢাকা-র লোকরা উচ্চারণে কলিকাতার ভঙ্গীর অনুকরণ করত,—এ-খবরও তিনি রেখেছিলেন।

ঊনিশশতকের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের কত লোক কলকাতায় এসেছিল, তা জানারা কোন উপায় নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে রামতনু লাহিড়ীর বাল্যকালে 'পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল'। শাস্ত্রী মশাইয়ের মতে এ-সব লোকের নৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত কলুষিত। সে যাই হোক্, 'বাঙাল' কথার ব্যাকরণ সর্বপ্রথমে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (?) তাঁর "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" গ্রন্থে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দ। (ড· তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। এখানে একটি জায়গায় 'কুকুর'-এর বহুবচনে 'কুকুরেরান', এবং 'বালকের সম্বোধনে 'টি' ও যুবতীর সম্বোধনে 'টে' শব্দ ব্যবহারের নজির দেখানো হয়েছে। তখন কী ছিল, জানি না; কিন্তু 'টে' শব্দটি রাজশাহী-মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত। একটি সুপ্রচলিত গম্ভীরা গানে আছে 'স্বামীর গুণ আর বুলব কত। সহবে কে আর আমার মত টে' ॥ আসলে বাঙাল 'টি' হয়ে যায় 'ডি', যেমন, 'ভাইডি'।

উইলিয়াম কেরি রচিত "কথোপকথন"-এ 'বাঙাল' কথোপকথন নেই; কিন্তু কেরি-র প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত ভাওয়াল পরগনার আঞ্চলিক ভাষায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লিখেছিলেন মানোএল দা অসুম্পসাঁও।

পূর্ববঙ্গীয় প্রাচীন লোকায়ত সাহিত্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। "মৈমনসিংহ-গীতিকা"র অনেক পালাগানেই বাণিজ্যে যাওয়ার বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে 'গঙ্গা' শব্দটি বিরল। পূর্ববঙ্গের গানে, লোকসাহিত্যে চৈতন্যজন্মধন্য নদীয়ার উল্লেখও খুবই অর্বাচীন। উত্তরবঙ্গের লোকগীতে পশ্চিমবঙ্গ অনুল্লিখিত। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, জয়নারায়ণ সেন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর "হরিলীলা" কাব্যেও কাশ্মীর, কর্ণাট ইত্যাদি দেশের উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ নেই। "হরিলীলা"র ভাষা অত্যন্ত বেশিরকমের বিদগ্ধ; শুধু এক জায়গায় টক্ তেঁতুলের অম্বল অর্থে বাঙাল 'চুকা' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।

তার মানে এই নয় যে পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত এবং গঙ্গা-বিধৌত এই দুই বাঙলার মধ্যে

যোগাযোগ ছিল না। 'কুলপঞ্জী' জাতীয় 'ঘটক'-দের লেখা পুঁথিগুলো পড়লেই দেখা যাবে, উভয় বঙ্গের উচ্চবর্ণ হিন্দুরা দলে দলে পরিবার-পরিজন নিয়ে এ-পার থেকে ও-পারে গেছেন। এই গতায়াত বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। যাওয়া-আসার কারণও ছিল নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা" গ্রন্থে শুধু ন্যায় পড়ার জন্য বাঙালি, অবাঙালি ছাত্রদের উভয় বঙ্গের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হওয়ার বহু বিবরণ আছে। হান্টার-এর সুবিখ্যাত *Annals of Rural Bengal* বইতে বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যাওয়ার বর্ণনা আছে। পথঘাট বিপদসঙ্কুল; যাতায়াতের ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত; নিবিড় কোনো আর্থিক যোগাযোগও নেই; তার পরেও বাঙাল-রা ব্যবসার খাতিরে, কিম্বা চাকরির চেষ্টায় এদেশে এসেছে, এবং এখানে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছে। আনুমানিক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'কামিনীকুমার' কাব্যে একটি "বাঙ্গাল" স্বামীর বর্ণনা এ-ধরনের : "অন্ধকার বিনা কভু নাহি করে কাজ/কেম্বাই এম্বাই বলে হায় এ কি লাজ॥ সাধ করে পায়ে পরেছিনু গোল মল/তবধ্বনি নটী বলে নাহি খায় জল ॥ অথচ, এ-দেশে এসে বিয়ে করার জন্য স্বামীটিকে কিছু কম মেহনত্ করতে হয়নি। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নৌকায় ঢাকা থেকে কলকাতায় যেতে ৩৭ই দিন লাগত। (*Calcutta Gazette, April* 21, 1785) কলকাতা থেকে নৌকায় ঢাকা যেতে বিশপ্ হেবার-কে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। এ-দেশী স্ত্রীলোকটি তাঁর 'বাঙাল' স্বামী সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুক, অন্ততঃ বিশপ হেবার্-এর সাক্ষ্যে (*Narrative of a Journey etc.,* Vol. 1, p. 143) দেখা যায়, 'বাঙাল' মানেই ভূত ছিল না। তাঁর মতে ঢাকার সমকালীন নবাব সামস্-উদ্-দৌলা সেক্স্পীয়ার পড়েছিলেন, ভালো ইংরাজিও লিখতেন। রামমোহন রায় উত্তরবঙ্গের রঙপুর অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন। ধর্মাচরণের ব্যাপারে উভয়বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান প্রায় একই রকমের ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলো সাধারণ ব্রত ছিল। অঞ্চল, পরিবেশ এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে ঐ-সব ব্রত অনুষ্ঠানের কিছু তারতম্য নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো মৌলিক বিভিন্নতা ছিল কি না সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, চতুর্দশ শতকে রচিত "শক্তিসঙ্গমতন্ত্র" অনুসারে উভয় বঙ্গের তান্ত্রিক বামাচার একরকমেরই ছিল। উভয়বঙ্গের আউল-বাউলদের রীতি-নীতি এবং ধ্যান-ধারণার মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয় বঙ্গের মেহনতী মানুষদের জীবনাচরণের উনিশ-বিশ ছিল না। "বাঙাল" নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা উচ্চ-বর্ণের লোকদের সৃষ্টি।

অথচ, রামমোহন-দ্বারকানাথের যুগে নিদেনপক্ষে দুজন বাঙাল কলকাতার বিদগ্ধ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একজন, মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ (১৭৯০-১৮৬৬)। অপর জন, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ্ চক্রবর্তী (১৮২৭-১৮৭৪)। রাঢ়িখালের ভগবানচন্দ্র বসু পরবর্তী কালে কলকাতার সমাজে নাম করেন। সূর্যকুমার বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে মেম-সাহেব বিয়ে করেন। এ-সম্পর্কে প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হয় : অজপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে (ভুল) পাণ্ডববর্জিত দেশে ঐ সূর্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন... এখানে যতদিন ছিলেন কিছুই মানিতেন্ না, সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন...ধন্য বিবিলোভ, হে খৃষ্টধর্ম, চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আকর্ষণ করহ।

"প্রভাকর"-এ পূর্ববঙ্গ প্রসঙ্গ বিশেষ নেই; কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'বাঙ্গাল' দেশ সম্পর্কে কোনো কারণে উৎসাহিত হয়েছিলেন; তিনি একবার ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রামে বেড়াতে যান। 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' তাঁর একটি নতুন ধরনের রচনা। রঙ্গব্যঙ্গ-প্রিয় গুপ্ত-কবি

চাটগাঁ-বরিশালের ভাষার দুর্জ্ঞেয়তা সম্পর্কে রসাল কিছু মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তাতে হাস্য-রসই প্রধান, বক্রোক্তি নয়। সংবাদ প্রভাকর-এ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল 'গবর্ণমেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন' ছাপা হয়। তাতে কলকাতা থেকে জমুনা নামক স্টীমার-এর লখিয়া নামক গাধাবোট-সহ ঢাকা যাওয়ার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ এ-সময় থেকেই ঢাকা-কলকাতার মধ্যে 'বাষ্পীয় পোত' চলাচল করতে থাকে, এবং সম্ভবতঃ ওই জমুনার একটি কেবিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চড়ে গিয়েছিলেন। ("আত্মচরিত", পৃঃ ১৪৭)

তুলনামূলক বিচারে পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো সাংবাদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলিকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের খবর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে। 'ও-পার' বাঙলার খবর থাকত খুবই কম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পত্রিকায় বিখ্যাত সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষ একবার মন্তব্য করেছিলেন :

"The ridicule and scorn with which the Gunga-dwelling Ryot looks upon his Dacca and Jessore brethren are much like [those] with which the Northumbrian boor is treated by the peasant of Middlesex. The so-called elite who by their supreme good luck are washed into civilisation by the waters of the holy stream sneeringly point at the huge donkeyishness of the chillieaters who are swelled into jug-bellied beauties by perpetual enlargement of the spleen and who talk a loathsome jargon of *OYS and AYEEBOs*. Nor is this egotistical leer utterly unfounded... it arises partly also from *the rather outlandish rudeness, the grosser superstition and the deeper ignorance that still brood over Eastern Bengal. That superstition is mainly attributable to non-intercommunication between one tract and the more enlightened parts.* The non-conducting medium of bad roads and no roads insulates western civilisation to a few miles around Calcutta. (italics is mine)
Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, ed., M. N. Ghose, p. 240.)

পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অবস্থার জন্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ যোগাযোগব্যবস্থার অপকর্ষের উপরে সমস্ত দোষ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, যে-সব বড় বড় পশ্চিমবঙ্গীয় জমিদার পূর্ববঙ্গে বিরাট বিরাট জমিদারি চালাতেন, তাঁরা তাঁদের 'সভ্যতা'র বাহাদুরি সত্ত্বেও তাঁদের 'বাঙাল' প্রজাদের উন্নতির জন্য কি করেছিলেন? ১২৬৭ সালে একটি বিপুলকলেবর বই কলিকাতায় ছাপা হয়েছিল। বইটির নাম "সংশোধিত নিয়ম-পত্র"। তার বিষয়-বস্তু, 'রপ্তপুরাদি প্রদেশান্তর্গত পরগণে পাতিলাদহ প্রভৃতি অধিকৃত ভূম্যাদির রাজস্বাদিকর্ম-নির্ব্বাহক সাময়িক বিধি।' বইটি ছাপিয়েছিলেন কলিকাতার একজন জমিদার, পি· কে· ঠাকুর। হাজার পাতার এই বইতে অনেক খোঁজ করে 'ডাক্তারখানার বিষয়' শীর্ষক একটি অধ্যায় দেখা গেল; কিন্তু জমিদারের তরফ থেকে স্কুল বা পাঠশালা পরিচালনার কোনই উল্লেখ নেই। ১২৬৭ সালের 'সংশোধিত' জমিদারি আইনে যদিও-বা জমিদারদের 'ডাক্তারখানা' রাখার নিয়ম হয়েছিল, শিক্ষা-প্রসারের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ তাতে ছিল না। গরীবের রক্ত 'বিধিবদ্ধভাবে' শোষণ করার নানা নির্দেশ এই 'নিয়ম-পত্রে' ছিল।

পূর্ববঙ্গে সে-সময় উচ্চশিক্ষা লাভের বিশেষ কোনো উপায় ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেও সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে ১৫টির বেশি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল কিনা, সন্দেহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার অনুসারে ঐ সময়ে সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল মাত্র ৩টি; এফ্·এ· কলেজ ছিল মাত্র ৬টি; এবং আইন পড়াবার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৪টি কলেজে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেও সেখানে একটিও ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না। এখনো পর্যন্ত যাঁরা বাঙালি রেনেসাঁসের জিগির তুলে তার সঙ্গে বৃটিশ শাসনের সংযোগ দেখাতে ব্যস্ত, তাঁদের নিশ্চয় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুঃসহ দৈন্যের বিবরণ জানা আছে!

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের একটি হিশাব অনুসারে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭০ (*The Bengal Educational Directory* 1919) অথচ, সে-অনুপাতে কলেজের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই, স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গের ছাত্ররাই কলকাতার বড় বড় বেসরকারি কলেজগুলোতে ভিড় জমিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরীশচন্দ্র বসু যখন কলকাতায় বড় বড় কলেজ স্থাপন করেছিলেন, তখনও বিস্তর 'বাঙাল' ছাত্র সে-সব কলেজে ভিড় করেছিল। আর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে স্কুল স্থাপনের কথাই যদি ধরা যায়, তাহ'লেও দেখা যাবে, স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জমিদার, কিংবা বধিষ্ণু হিন্দু-মুসলমান 'ভদ্রলোক'-রাই সে-সব স্কুল স্থাপন করেছিলেন, এদেশী লাহা, ঠাকুর, দেব, ঘোষ অথবা মিত্র-রা নয়।

শিক্ষার দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত 'বাঙাল'রা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসেছিল; কিছু 'হিন্দু'-বাঙাল এখানে এসেছিল দৈনিক গঙ্গাস্নানের পুণ্যলোভাতুর হয়ে। অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, তাঁর ছেলেবেলায় বড়বাজারের দু' শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে প্রথমটি ছিল 'পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গঙ্গাতীরে বাস করে নিত্য গঙ্গাস্নান করবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা...বড়বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন শেঠ ও বসাক মহাশয়রা।' ['ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃঃ ২-৪] কলিকাতার হিন্দু-পরিবারে পুজো-আর্চার ব্যাপারে 'বাঙাল' পুরোহিতদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্যের সূত্রপাত হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। বাগবাজার, শোভাবাজার, শ্যামপুকুর ও কালীঘাটে ঐ-সব পুরোহিতপল্লী এখনও দেখা যায়।

এরা ছাড়াও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকের মধ্যভাগেই এসেছিল অসংখ্য পেশাদার 'ভদ্রলোক' বাঙাল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কেরানি, বেশকিছু ছিল শিক্ষক এবং উকিল। পূর্ববঙ্গের মহকুমা, কিংবা জেলা সহরে যদিও-বা শিক্ষক ও উকিলদের কিছু কিছু চাকরি জুটত, তবুও তা সংখ্যার অনুপাতে ছিল খুবই কম। স্বাভাবিক কারণেই এদের 'মক্কা' ছিল কলিকাতা। উনিশ শতকের শেষভাগে 'বাঙাল'দের উত্তর ভারতের বিভিন্ন সহরে কেরানি, উকিল, এবং অধ্যাপকরূপে আবির্ভাব হতে থাকে।

এই সব মধ্যবিত্ত 'বাঙাল' ছাড়াও কলিকাতায় এবং তার উপকণ্ঠে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় এসেছিল অসংখ্য 'বাঙাল' মাঝি, মজুর, কুলী। খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ এখনো পর্যন্ত পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান মাঝি-মাল্লাদের বাসস্থান। উনিশ শতকের মধ্যভাগেই ছোটখাটো 'বাঙাল' মুসলমান ব্যবসায়ী, কারিগর, দোকানদার ইত্যাদি মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করতে থাকে। হুতোমের 'নকশা'য় এবং পরবর্তী কালে গিরীশচন্দ্র ঘোষের বহু

নাটকে কলকাতার কুলী রূপে 'বাঙাল' চরিত্র দেখানো হয়েছে। স্পষ্টভাবে 'হিন্দুস্থানী' কুলীর উল্লেখ ঊনিশ-শতকের শেষার্ধে রচিত বাঙলা-সাহিত্যে খুব বেশি দেখা যায় না।

নিম্নবিত্ত, দরিদ্র 'বাঙাল'রা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত "গোপাল ভাঁড়ের অদ্ভুত গল্প"-জাতীয় বইতে কমিক চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। এ-সব বইয়ের লেখকরা 'বাঙাল' চরিত্র নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির উৎসাহ কোথা থেকে পেল, তা বলা যায় না; তবে নিচের দু-একটি নমুনা থেকেই বোঝা যাবে, এ-জাতীয় প্রয়াস নিছক স্থূলতায় পরিণত হয়। নমুনা :

১· "পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গাল দাঁড়িমাঝি কলিকাতায় আসিয়া এক পয়সার জিলিপি খাইয়া সর্দার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল : চাচা! এই যে গুরান, ইয়ার গোয়ার মন্দি রস, ইয়ারে কি কয়? তাহার চাচা দম্ভ করিয়া কহিল : হা পুঙ্গির পুত! ইহারে জিলাঙ্কি কয়।"

২· "এক বাঙ্গাল মুসলমান কচুরী খাইয়া তাহার মাতুলকে কহিল : ফজলে মামু! এই যে কচুরী খালাম, ইয়ার গোয়ার মন্দি কেলাই আলো ক্যামনে? মাতুল কহিল, আরে পুঙ্গির পুত্তু! তা-ও সমঝাবার পারস্ নাই! গম আর কলাই এক লগে বুনছিল্" ('গোপাল ভাঁড়ের অদ্ভুত গল্প' ১০৫-১০৬)

এ-ধরনের বিদ্রূপ দাশরথি রায়ের পাঁচালীতেও দেখা যায়। সেখানে 'বাঙাল'-এর একটি অভিধা হ'ল দুশ্চরিত্র এবং বেশ্যাসক্ত। একজন 'ডাকসাইটে' বেশ্যার বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন : 'ঢাকাপটীর ঢাক-বাজানি ঢাকাই বাবুর ঢেম্নী।' পূর্ববঙ্গের পল্লী-সঙ্গীতের জঘন্য 'প্যারোডি' করে তিনি লিখেছিলেন :

বাহার-যৎ।
বঁধু! যেহানে কোকিলা, সেহানে না যায়।
ঐ কোকিলা পুঙ্গির বাই ডাকে হে তোমায় ॥ ইত্যাদি

এই ধরনের স্থূল রসিকতার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যাবে জে· চৌধুরি রচিত, এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, "কান্তলালের কলিকাতা দর্শন" নামক উপন্যাসে। নায়ক কান্তলাল, বলা বাহুল্য, 'বাঙাল'। এমন-যে প্রতিভাবান শিল্পী 'পরশুরাম' তিনিও 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে এক বাঙাল, এবং মুসলমান মুহুরির মুখ দিয়ে 'হালার পো হালা' গালিটি বলিয়ে ছেড়েছেন।

'বাঙাল' সম্পর্কে গোপালভাঁড় ও দাশু রায়ের রীতি হুতোম-এর "নকশা", "আলালের ঘরের দুলাল", এবং ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত "সমাজ-কুচিত্র" জাতীয় গ্রন্থে দেখা যায়। "মাহেশের স্নানযাত্রা" নকশায় নৌকার মাঝি 'বাঙাল। তার খাদ্য ভাত, কড়াইয়ের ডাল, শুঁটকী মাছ আর লঙ্কা। একটি নকশায় হাফ্-আখড়াই গানের দোহার 'ঢাকাই কামার'। নকশায় বর্ণিত একটি মুটে বাঙাল, এবং বিশ্রী রকমের স্পষ্টভাষী। সে প্রেমানন্দ-জ্ঞানানন্দের কীর্তন গান শুনে মন্তব্য করেছিল : 'পুঙ্গির বাই গাড়ীর মন্দি ক্যালাওতি লাগাইছেন।' একটি নকশার অন্যতম প্রধান চরিত্র 'বীরকৃষ্ণ দাঁ' ঢাকার লোক, এবং আড়তদার। মাহেশের স্নানযাত্রা প্রসঙ্গে হুতোম তীর্থযাত্রী জনৈক পূর্ববঙ্গীয় জমিদারের বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে : ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত, ও তেলের কুপোর মত শরীর; দাঁতে মিশি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলি......মৈমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি করেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'-কে "আম" ও 'দাদা' ও 'কাকা'তে 'দাঁদাঁ' 'কাঁকাঁ' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কবলান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পুজো করেন।'

"আলালের ঘরের দুলাল"-এ একটি মোসাহেব চরিত্র আসামী, এবং তার নাম 'ঢেঁকিয়াল ফুক্কন।' তিনি 'কর্ত্তার নিকট বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিতেছেন;—এ-বছর একটু লেরাং ভেরাং আছে, কিন্তু একটি যাগ করলে সব.........বশীবুত অবে।

সরস্বতী পুজা বর্ণনা করে ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় 'দুজন বিক্রমপুরী বাবু'-র বর্ণনা করে লিখেছেন :

দুজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কলকেতা দেখতে এসেছিলেন। মেছোবাজারের শোভাদর্শন তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মস্ত একটা তেতালা বাড়ীতে আলো জ্বলচে ও গান-বাজনা হচ্চে দেখে, গড়্গড়্ শব্দে উপরে উঠতে লাগলেন। ব্রাহ্ম যাচ্চেন মনে করে প্রহরীরা বারণ কল্লেনা। তাঁরা সমাজঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন। একজন বল্লেন এহানে তা নয়, আমরা যাহার লাগ্যে আইছি। দ্বিতীয় বাবু—'অয় বাগ্য' বলেই নেমে গেলেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবশ্য স্বীকার করেছেন যে 'ঢাকা আজকাল অপেক্ষাকৃত সভ্যতম স্থান হয়ে উঠেচে।' ("সমাজ-কুচিত্র", পৃঃ ১৭২)।

এক সময়ে অসমিয়া ভাষাকে বাঙলা ভাষা থেকে আলাদা ভাবে বিচার করা হয়েছিল। এই বিচারের প্রতিবাদ করে একজন লেখক "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় লিখেছিলেন যদি বিক্রমপুর অঞ্চলের ভাষা বাঙলা ভাষা হয়, তবে নিশ্চয় অসমিয়া ভাষাও বাঙলা ভাষা।লেখকের বক্তব্য : 'এক বাঙ্গালায় প্রদেশভেদে বিভক্তির এই প্রকার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়,......যথা 'কোথা হইতে', 'কোত্থেকে', 'কোনখান থন', 'কৈত্মনে', 'কৈত্থইজা', কৈ গণে ইত্যাদি......বিক্রমপুর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের ভাষাকে সকলেই বাঙ্গালা বলেন। যদি কোথা হইতে, আর কোনখান থনে ...প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য, ভাষা এক থাকিল, তবে কোথা হইতে, আর কোরপরা (অসমিয়া), এই প্রভেদের জন্য জন্য ভাষা পৃথক বলিতে হইতে কেন পাঠকগণই বিবেচনা করুন।" (বিনয় ঘোষ, "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫) "সোমপ্রকাশ"এ, ভুলুয়া অঞ্চলের হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইন চালু হলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার সম্পর্কে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন ছাপা হয়। তিনি লিখেছিলেন; 'যে স্থানে যাই সে স্থানেই ঐ কথা শুনিতে পাই, কেহ বলে, 'রামমাণিক্য বাই, হুনুচনি, রাঁড়ির হাঙ্গা আইব'......রামমালা নাম্নী অত্যল্প বয়স্কা এক বিধবা গৃহমধ্যে শয়নে ছিল, মাণিক্যমালা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল : 'রামমাল্য কণ্ডাইলো......ও পোড়াকওয়ালি, তুই আর হোতনের দিন পাচ্নানি......তরা হগ্গলে হুনুচনি, রাঁড়ির হাঙ্গার আইন্ আইচে......' তচ্ছুবণে তাহারা কহিল, 'তর এই কতা কনে কইচে, কণডাই হুনুচশ্......' মাণিক্যমালা কহিল, 'হাঁচা, হাঁচা; আমাগো বাড়ীর বুড়াতে পানপাড়া কাচারিৎ গেছিল্ হেইতে হমাচারের কাগজ হুনি আই কইচে।' [তদেব, পৃঃ ৭৭৬-৭৭]

সিসিল বিডন্-এর শাসনকালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হয়। রিচার্ড টেম্পল-এর আমলে (১৮৭৪-৭৭) প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গে রেলপথ বিস্তৃত হয়। তার ফলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার কোনো অসুবিধা রইল না। "সোমপ্রকাশ"-এ উদ্ধৃত একটি পত্রে দেখা যায়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আসামের গোলদারী ও 'মুদি' ব্যবসা 'বাঙাল'-দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'হরিদ্রাগ্রামের' পোস্ট-মাস্টারকে একজন 'বিক্রমপুরের লোক'রূপে চিত্রিত করেছেন। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন দ্রষ্টব্য। এ-সময়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে এসে বাঙাল যুবকের 'নিমচাঁদ' হয়ে যাওয়ার সত্যি ঘটনা জানা ছিল বলেই দীনবন্ধু মিত্র "সধবার একাদশী"তে রামমাণিক্যকে টেনে

এনেছেন। এ-সম্পর্কে দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন : 'কলিকাতা-সমাজের অভিজ্ঞতা-শূন্য পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ["দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী", বসুমতী সং, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা]

রামমাণিক্যের একটি কথায় জানা যায়, 'বিক্রমপুর-ক্কলকত্তা অষ্ট দিনের ব্যবধান।' রামমাণিক্যের দুঃখ, নানারকম চেষ্টা করেও সে ক'লকাতার বাবু হয়ে উঠতে পারেনি; 'ক্কলকাত্তার মত না করচি কি। মাগীবাড়ী গেছি......গোরার বারীর বিস্‌কাট্‌ বক্কোন কর্‌চি, বাণ্ডিল্‌ (ব্রাণ্ডি) খাইচি—এতো কর্যাও ক্কলকাত্তার মত হবার পারলাম না......'

দীনবন্ধু অবশ্য "নবীন তপস্বিনী" নাটকে একটি 'রাজ-ঘটক'-এর বাঙাল দেশে মেয়ে দেখতে নাস্তানাবুদ হবার বিবরণ দিয়েছেন; মেয়েটির বিচিত্র বেশভূষা দেখে ঘটক-মশাই হেসে ফেলেছিলেন, তখন 'মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল, আমাকে মারবার উদ্‌যোগ কল্লে। কেহ বলে : 'হাস্‌ দিলে ক্যান্‌', 'মাগীবাড়ী আইচো নাহি', কেহ বলে, 'হালার পো হালারে আড্‌ডা চরে বৈকুন্টে পাটায়ে দেই।' মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নেই, সেখান হইতে পলায়ন করলেম'। এই বিবরণ শুনে রাজার ভাঁড় মাধব বলল : 'বাঙ্গালেরা কি মাত্তে জানে ?' এখানে উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় যাওয়ার ফলে এক উত্তরবঙ্গীয় মুসলমান এবং মহিলা-জমিদারের চরিত্রহানির বিবরণ দিয়েছেন মীর মশাররফ্‌ হোসেন, তাঁর "গাজী মিয়ার বস্তানী"তে। মহিলার নাম, 'বেগমঠাকরুণ।'

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছু 'বাঙাল' বিশেষ তৎপর হ'য়ে ওঠেন। এ'রা হলেন, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪); হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭), মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৮), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬), মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২), শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৮-১৯২৩), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)।

সম্ভবত শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ববঙ্গবাসীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা মনে রেখেই উল্লেখযোগ্য 'বাঙাল' চরিত্রের নিদর্শন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর বিশেষভাবে দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'বাঙাল মনুষ্য নয়' ভাবটি তখনও ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের মেট্রোপলিটান্‌ স্কুল-এ শিক্ষকতার কাজ না-পাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল এই যে, বিদ্যাসাগর তাঁকে 'বাঙাল' ভেবেছিলেন, এবং বলেছিলেন : 'তাই তো তুই যে বাঙ্গাল......এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া ইস্কুলের ছাত্র নয় যে তুই অনার্‌স্‌ পাশ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবে......তোকে তো একদিন পাগল করিয়া ছাড়িবে।' পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর তাঁর যোগ্যতা স্বীকার করেন। (দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য', পৃঃ ১৩০-৩২)

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় যথাক্রমে "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" উপন্যাস দুটি রচনা করেন। তাঁর বহু পূর্বেই অবশ্য যশোহরের পটভূমিতে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" লিখেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনা ও সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহ নিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত 'Arcyde' ছদ্মনামে লালবিহারী দে সম্পাদিত *Bengal Magazine*-এ বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রমেশচন্দ্র মৈমনসিংহের নেত্রকোণায়

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দত্ত হায়ার ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাঙাল' হলেও নবীনচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং মীর মশাররফ্‌ হোসেন এ-পার বাঙলায় সহজেই স্বীকৃতি লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন, 'বাঙাল' নিয়ে নয়; এমন কি "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙাল' নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন নি।

উনিশ শতকের শেষ দশকে "ছিন্নপত্রাবলী"তে রবীন্দ্রনাথ রূপসী বাঙলার যে সুন্দর ছবি এ'কেছিলেন, তা পদ্মা-বিধৌত পূর্ববঙ্গের ছবি। বাঙাল মাঝির গান শুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি।' তিনি অবশ্য 'যোবীত! ক্যান্‌ বা কর মন ভারী। পাবনা থ্যাহে এনে দেব ট্যাহা দামের মোটরী ॥', এই গান শুনে প্রচুর কৌতুক উপভোগ করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট 'বাঙাল' নিধিরামের কথাবার্তা আদৌ 'বাঙাল' নয়, এবং তার অন্তর্জলি-যাত্রার বিবরণও শোকাবহ। কিন্তু 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু 'ব্রাহ্ম' বাঙালদের খুব একহাত নিয়েছেন তাঁর 'বাবু' নাটকে। সেখানে একটি চরিত্র কন্দর্পকান্ত। সে 'ব্রাহ্ম', 'বাবু' এবং বাঙাল। বৃদ্ধা ঠাকুরমার 'বিধবা বিবাহ' দেবার জন্য সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; তার বক্তব্য :

'কও তো আজিমা! বসন্তকালে যহন দহিনা বাতাস ফুর্‌ফুর্‌ করবার লাগে, আমের ডাইলে বইসে কালা কোহিলা যহন কুহু কুহু ফুক্‌রাইবার লাগে, ফুলবাগিচায় ভোমরাগুলাইন যহন গুন্‌ গুন্‌ করবার লাগে, তখন তোমার প্রাণডা নি ক্যামন করে? তার 'আজিমা' অবশ্য তাঁর 'গুপাল' (গোপাল)-এর মস্তকে মাসেককাল মধ্যনারায়ণ তেল মালিসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

খাঁটি 'ঢাকাইয়া' ভাষায় একটি উপভোগ্য কবিতা লিখেছিলেন 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেন। কবিতার বিষয়বস্তু, বৃদ্ধ স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে তোয়াজ করা। তার কয়েকটি চরণ :

'বাজার হুন্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়।
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হইয়া উঠচে দায় ॥
আর্‌সি দিচি, কাঙ্কই দিচি
গাও মাজনের হাপান দিচি
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দেওন যায়?
উলের হুতা দিচি আইন্যা
কিসের লইগ্যা মন্‌ডা পাই না?
বুড়া বুড়া কইরা কেবল,
খ্যাপাইয়া ক্যান করছ পাগল?
যহন বিয়া করচ, ফ্যালবা ক্যাম্‌তে কইয়া দেও আমার ॥

(বাঙালের বৈরাগ্য, "বাণী")

এই সুন্দর কবিতাটি সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : এই কবিতায় 'নিছক হাস্যরসই আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্রূপ নাই।' খুবই খাঁটি কথা।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ-পার-ওপার বাঙলার মাঝখানে সীমারেখা মুছে গিয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা-ভাষাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন কোনো প্রতিবাদ হয়নি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে

আসামের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সরকারি অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতা এবং সে-সম্পর্কে কলিকাতার নেতাদের দীর্ঘকালের অবজ্ঞা, বোধ হয় লর্ড কার্জন ও তাঁর পরামর্শদাতাদের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে খানিকটা উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ। 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন' সে-দিন সত্যি সত্যি এক হয়ে গিয়েছিল। এজ্‌রা পাউন্ড বলেছিলেন 'Tagore has suny Bengal into a nation'।

অথচ দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিক ও সামাজিক নেতাদের পূর্ববঙ্গকে অবজ্ঞা করার একটি কু-ফল ফলেছিল। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁদের সীমাহীন অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা, তাঁদের সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখ পর্যন্ত না-থাকা, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক একতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করে তুলেছিল। এখনো পর্যন্ত 'বাঙালী' কথাটির অর্থ অনেকেই শুধু 'হিন্দু' মনে করেন; 'মুসলমান' শব্দের যে একটি 'বাঙালী' অর্থ হ'তে পারে তা তারা স্বীকার করেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভূত-প্রেত নিয়ে গল্প লিখেছেন; কিন্তু বাঙালী মুসলমানের সুখদুঃখ নিয়ে একটি কবিতা, একটি গল্প, একটি নাটক, একটি গান লেখেননি। অথচ তাঁর মুসলমান অনুরাগীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবিক আবেদনে পূর্ণ, জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তারপরেও কেন যে তিনি অখণ্ড বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমানদের বিষয়ে তেমন কিছু সাহিত্যিক উৎসাহ দেখাননি,—এ-প্রশ্ন থেকেই যায়। পূর্ববাঙলা ছিল মুসলমান-অধ্যুষিত; সেই পূর্ববাঙলাই ছিল বঙ্গসাহিত্যের অবহেলিত নায়িকা। এবং সে-কারণেই বাঙাল সাহিত্যে তাদের প্রবেশ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। এ-জন্য পরে বহু মূল্য দিতে হয়েছে।

মুঠো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কনুই-এর গুঁড়ি থেকে গাছ, শেষে চাঁপার কলির মতো আঙুলের ডগা। একটি মই। যার উপরে উঠলে আকাশ, অথবা উঠতে-উঠতে একবার সুড়ুৎ করে বাইরে পিছলে যেতে পারলেই

চেয়ারের হাতলের পরের শূন্যতা, তারো পরে ঘরের তরঙ্গে-তরঙ্গে নাচা, অবশেষে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া

পথে, পরে বনে, পরে হু-হু হাওয়ার দিগন্তে।

তাই পৌঁছোতে যে হবেই শেষ ধাপে, এমন কথা নেই, কারণ মূর্তিমান অনন্ত সর্বত্র, কারণ দ্বিতীয় ধাপ থেকে লাফ মারলেও মুক্তি, সহসা গোধূলি,

এসে ধাক্কা খাওয়া গ্রামের দুঃখের কিনারে।

কিম্বা তৃতীয় ধাপ, ঐ যেখানে কাঁকন সুরু হয়, পিছলে যাওয়া চলে সেখান হতেও, পরেই যাত্রার দামামা শোনা, আগুন-জ্বলা রাত্রির বৃহত্তর ব্যাপ্তি।

কিন্তু কোন্-কোন্ ধাপে কত সম্ভাবনা, তার ফিরিস্তিতে লাভ নেই, যেহেতু অমৃতের কাঙাল আমার চোখ কব্জি পেরিয়ে যেই পৌঁচেছে হাতের চেটোয়,

অমনি তুমি সুনিপুণ শিকারীর মতো মুঠোটা বন্ধ করলে।

এক ধরনের অহংকার

শামসুর রাহমান

এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।
বেজায় টলছে মাথা, পায়ের তলার মাটি সারা দিনমান
পলায়নপর,
সেই কবে থেকে তবু রয়েছি দাঁড়িয়ে।
অত্যন্ত জরুরী কোনো আবহাওয়া ঘোষণার মতো
দশদিক রটাচ্ছে কেবলি : হাড়ে ঘাস
গজাতে গজাতে
বুকে হিম নিয়ে তুমি বড়ো নির্বান্ধব, বড়ো একা হয়ে যাচ্ছো।

আমার ভূভাগ থেকে আমাকে উৎখাত করবার জন্যে কতো
পাইক পেয়াদা
আসছে চৌদিক থেকে, ওরা তড়িঘড়ি
আমার স্বপ্নের
বেবাক স্থাবর অস্থাবর
সম্পত্তি করবে ক্রোক, কেউ কেউ ডাকছে নীলাম
তারস্বরে, কিন্তু আমি উপদ্রুত কৃষকের মতো
এখনো দাঁড়িয়ে আছি চালে,
ছাড়াচ্ছিনে জলমগ্ন ভিটে।

আমার বিরুদ্ধে সুখ সারাক্ষণ লাগায় পোস্টার
দেয়ালে দেয়ালে,
আমার বিরুদ্ধে আশা ইস্তাহার বিলি করে অলিতে গলিতে,
আমার বিরুদ্ধে শান্তি করে সত্যাগ্রহ,
আমার ভেতর ক্ষয় দিয়েছে উড়িয়ে হাড় আর
করোটি-চিহ্নিত তার অসিত পতাকা।

আমার জনক এতো ব্যর্থতার শব আজীবন বয়েছেন
কাঁধে, বন্ধনার মায়াবী হরিণ তাঁকে এতো বেশী
ঘুরিয়েছে পথে ও বিপথে, আত্মহত্যা করবার
কথা ছিলো তাঁর, কিন্তু তিনি যেন সেই অশ্বারোহী,
জিনচ্যুত হয়েও যে ঘোড়ার কেশর ধ'রে ঝুলে থাকে
দাঁতে দাঁত ঘষে।

আমার জননী এতো বেশী দুঃখ সয়েছেন, এতো বেশী
ছোঁড়াখোঁড়া স্বপ্নের প্রাচীন কাঁথা করেছেন সেলাই নিভৃতে,
দেখেছেন এতো বেশী লাল ঘোড়া পাড়ায় পাড়ায়,
এতবার স্বপ্নে, জাগরণে

ভূমিকম্পে উঠেছেন কেঁপে, তাঁর ভয়ানক মাথার অসুখ
হওয়া ছিলো স্বাভাবিক; কিন্তু ঘোর উন্মত্ততা তাঁর
পাশাপাশি থেকেও কখনো তাঁকে স্বাভাবিকতার
ভাস্বর রেহেল থেকে পারেনি সরাতে এক চুলও।

বুঝি তাই দুঃসময়ে আমার আপন শিরা উপশিরা জেদী
অশ্বক্ষুরে প্রতিধ্বনিময়।
যেদিকেই বাড়াই না কেন পদযুগ,
কোনোদিন কোনো
গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবো না; আমি সেই অভিযান—
প্রিয় লোক, যার পদচ্ছাপ মরুভূমি ধ'রে রাখে
ক্ষণকাল, যার আর্ত উদাস কঙ্কাল থাকে প'ড়ে
বালির ওপর অসহায়, অথচ কাছেই হৃদ্য মরুদ্যান!

কী-যে হয়, একবার রক্তস্রোতে একবার পূর্ণাঙ্গ জ্যোৎস্নায়
ভেসে যায় হৃদয় আমার। যেদিকে বাড়াই হাত
সেদিকেই নামে ধস্, প্রসারিত হাতগুলো গহ্বরে হারায়
আর আমি নিজে যেন পৌরাণিক জন্তুর বিশাল
পিঠের ওপর একা রয়েছি দাঁড়িয়ে; চতুষ্পার্শে
অবিরল যাচ্ছে ব'য়ে লাভাস্রোত। কম্পমান ভূমি;
প্রলয়ে হইনি পলাতক,
নিজস্ব ভূভাগে একরোখা
এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।

দ্বিতীয় প্রকৃতি

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শেষ নীলিমার সুদূর খিলানে তারা
একে একে ফোটে সন্ধ্যার সম্মোহে,
বিশাল মঞ্চে জাগে থরশান সাড়া
সমবেত গীত-বাদ্যের সমারোহে।

এক হাতে ধরে চাঁদের বাঁকানো ফলা
পাপড়ি খোলে সে নৃত্যের সংলাপে,
বুকের উপরে বাসনার ছলাকলা,
কটী ঘিরে তার নারিকেল-বীথি কাঁপে।

স্বচ্ছ বাতাসে জড়ানো অঙ্গমালা,
ভিতরে গোপন গভীর সম্ভাবনা:
কখনো জাগায় আমন্ত্রণের জ্বালা
আবার কখনো তোলে নিষেধের ফণা।

কটাক্ষে ঘোরে দিগন্ত আয়োজন,
চুলে নদী বয় প্রবল সর্বনাশে,
বাহুর মোচড়ে তীব্র পর্যটন,
পদপাতে দ্যুতি রাত্রির ঘাসেঘাসে।

আবার কখনো নাভির অন্ধকারে
দূরের তুমুল জোনাকিরা ওঠে জ্বলে:
আদি প্রকৃতির সাবলীল সম্ভারে
মনে হয় তাকে দ্বিতীয় প্রকৃতি বলে।

ক্ষয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ উদ্ভিদ

ফণিভূষণ আচার্য

মানুষের ব্যথার ভেতর ফুটবে আতর গোলাপ   তুমি
কথা দিয়েছিলে   ভীষণ অস্পষ্ট কথা দিয়েছিলে
এভাবে কি ঠিক সকল বঙ্গজনকে কথা দেওয়া
কিছু কিছু ঠিক থাকে সব ঠিক থাকে না   কখনো
বিষণ্ণ রাইয়ের ক্ষেতে শীতের বিকেল চলে যেতে যেতে
ফিরে চায় মায়াময় দুলে যায় দীর্ঘনিশ্বাসের বালিকারা
ফুরায় যবের বেলা ব্যথার ভেতর ব্যথা বাড়ে
সারাদিন তুমি ঘরে চন্দন বাটছো একলা   দ্যাখো
শস্যের কিনার দিয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ উদ্ভিদ
ঘরের দরজা খুলে চলে যায় চালতাবনের রোদ
পথ চিনে চিনে গুলঞ্চলতার দিকে
গায়ের কাপড়ে পড়ে ভালোমন্দ টান
শীতের বিকেল চলে যেতে যেতে ফিরে চায়
শুকনো খড়ে রোদ
আকাশ-পেরোনো দীর্ঘ রেললাইন
জ্যামিতিতে বেঁকে গেছে চোখের কিনারে
এ সময়ে একা-একা রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকতে
ভয় হয়   একা-একা
বিলোল দাঁড়িয়ে থাকে নদীর পারের দুঃখী উদাসীন আলো
তুমি কথা দিয়েছিলে ভীষণ অস্পষ্ট কথা দিয়েছিলে কেন
কোনদিন আতর গোলাপ চূর্ণ ব্যথার ভেতর
ফোটে না   এভাবে তুমি কেন কথা দাও   রোজ আকাশের
কাপড় বদলানো চেয়ে দ্যাখা ভালো নয়   তুমি সব জানো
বিকেলের এই আলো বড়ো মায়াময় নয়নজলির জলে
মেছো বক ছায়া ফেলে হৃদয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডানা ঝাড়ে
কখন রাতের দিকে উড়ে যাবে   আতর গোলাপ
জরদ্গব ব্যথার ভেতর ফোটে না   এভাবে অস্পষ্ট কথা
কখনো দিয়ো না তুমি গৌড়ীয় জ্যোৎস্নায়

মুখোমুখি

সুনীথ মজুমদার

যাব ব'লে কতোবার ভেবেও যাইনি। ভেবেছি
কী ভাবে যাব ? দেখা হ'লে
আগের মতোই আবেগী উচ্ছ্বাস নিয়ে কথা হবে কিনা
এ-রকম ভাবতে-ভাবতে
যখন এই মাঠের মধ্যে এলোবেলে মুহূর্তকে
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নষ্ট করছি, তখন আচমকা তোমার প্রতীক্ষিত মুখ
নীরব হাসাস্বননে দেখা দিয়ে
আমাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়। সঠিক চিনেছি
তবু স্বভাবী দৃঢ়তায় আমি স্থির।

যাব ভেবেও ঠিক সে-মুহূর্তে কাছে যাওয়া অসম্ভব হ'লো
তোমার আঁখি-পক্ষ্মে গোপন নিবেদন
আগের মতোই আকৃতিময় কিনা, তোমার স্বিধাবিভক্ত জীবন
পুনর্বার ফিরে আসবে কিনা, এ-রকম ভাবতে-ভাবতে
আমার নিজস্ব আপিসকে ভাবনা সংহতি নেয় অক্ষরবৃত্তের।
আমার শুধু দূরে দাঁড়ানো, নিঃশব্দের ডানা মেলে দেয়া !

আর নিস্তব্ধ রাত্রি এসে
আমাকে নতুন বর্ণমালা লিখে নেবার প্ররোচনা দেয়।

আবহমান কাল

আবহমান কাল আমরা তুলেছি সোনালী ধান.....বুনেছি বাঁজ
অসীম রায়

[লেখকের নিবেদন : তিরিশ বছর ব্যাপী একটি পারিবারিক উত্থানপতনের কাহিনী যখন ধারাবাহিক-ভাবে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার কিছু পরেই অকস্মাৎ বন্ধ হয় তখন লেখকের বিহ্বলতা স্বাভাবিক। আটটি পর্বে সমাপ্ত উপন্যাসটির প্রথম পর্ব বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে। এক একটি সংখ্যা এক একটি পর্বে সমাপ্ত।]

জল ফুঁসছে, জল ফুলছে, বাদামি জল আছড়াচ্ছে দুই পাড়ে, ১৯৩৫ সালের এক রৌদ্র-করোজ্জ্বল সকাল। কখনও জল আদিগন্ত রুপোলী ইলিশ, আবার ঘন মেঘের ছায়ায় তার থমথমে সমাহিত বিস্তার। স্টিমার যখন চলে তখন ইঞ্জিনের ধক-ধকিতে পারের আওয়াজ কানে পৌঁছয় না, কিন্তু গঞ্জে পৌঁছনোর আগে যখন ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভাঙার শব্দ আসে। আর বাদামি জলে কমলালেবু রংয়ের পাল তুলে বড় বড় নৌকো আসে, বাতাসে বাতাসে মট্ মট্ করে মাস্তুলের জোড়। স্টিমারে পাক খাওয়া ঢেউ নাচায় নৌকোগুলো, জলের ওপর কখনও কখনও সাদা ফাটা তালিমারা আবার কখনও অক্ষত রোদ-বৃষ্টি লাগা ফ্যাকাসে গৈরিক পালগুলো ওঠে নামে।

—জলের একটা গন্ধ আছে, নারে ? দোতলার ডেকে রেলিংএর ওপর ঝুঁকে চোঙা বলে।

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্টীমারের বিশাল প্যাডেলের দিকে। কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে পড়ে দু'ভাইয়ের মুখে চোখে।

—নানা যেন দুধ জ্বাল দিচ্ছে, হাতায় করে দুধ উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে ! বুড়ী বললে।

—দ্যাখ্ দ্যাখ্, ডুবে গেল। চোঙা চেঁচিয়ে উঠল। এপার ওপার দেখা যায় না নদীর মাঝখান দিয়ে ডিঙ্গি বাইছে দশবারো বছরের ছেলেটা। স্টিমার কাছে আসতেই ঢেউয়ের উথালিপাথালিতে মনে হচ্ছে এই ডুবে গেল। বিশাল ঢেউয়ের নীচে ডিঙ্গি সমেত ছেলেটা এই অদৃশ্য হচ্ছে, এই ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দোতলার ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছেলেটাকে। কালো ভেজা গা ঝলকাচ্ছে রোদ্দুরে, ঠিক যন্ত্রের মতো ক্ষিপ্র গতিতে বৈঠা উঠছে নামছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই, সামনের অতিকায় গর্জমান ঢেউয়ের যমদূতগুলো ভ্রূক্ষেপ না করে সে বৈঠা বেয়ে চলেছে। স্টিমার অনেক দূর চলে গেলেও বিশাল জলরাশির ওপর কালো বিন্দুর মতো সে নড়ে।

এবার একটা গঞ্জ আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই পাড় থেকে ঝুপঝুপ শব্দ বেশ স্পষ্ট। ডাসমান ল্যাটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে পাটের গাঁট, গুড়ের নাগরীর পাহাড়। সবুজে নীল চকরাবকরা লুঙ্গির উপর জালিকাটা গেঞ্জি পরে দু-তিনটে লোক কাছি হাতে দাঁড়িয়ে, জাহাজ আসতেই কাছি ছুঁড়ে বাঁশের লম্বা পোল দিয়ে ফ্ল্যাটের গা ঠেকা দিয়ে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের এক পাশে চুল-কাটার সেলুন। সাদা বোর্ডের ওপর বড় বড় লাল হরপে লেখা : প্রফেসর রমণীমোহন কর্মকার। দুটো সরু লম্বা পাটাতন ফেলে দিতেই দুড়দাড় করে নীচতলার লোক ওঠে। ডগডগে লাল, সবুজ আর নীল শাড়ির প্রাধান্য বেশী। বেশীর ভাগেরই কাঁখে ছেলে, হাতে ছেলের হাত। সরু তক্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পরস্পরের সঙ্গে চাঁৎকার করে গল্প করতে করতে সামনের লোককে ডাক দিতে দিতে তারা নীচ তলায় ওঠে। অনেকের হাতে লাউ। কয়েকটা ছেলে আখ্ চিবোতে চিবোতে স্টিমারে ওঠে। পাকা কলা আর গুড়ের চাপা গন্ধে সমস্ত গঞ্জ এলাকা ভুর ভুর করে।

এতক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে যে লোকটা তার গলা প্রচুর সাবানের ফেনায় সাদা করে বসেছিল

তার দাড়ি কাটা হয়। স্টিমারের ঘণ্টা দেয়। লোকটা চেয়ার থেকে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ দৌড় মারে। তারপর শূন্যে লাফ মেরে অপসৃয়মান পাটাতনে উঠে প্রচুর গালাগাল দিতে দিতে ও খেতে খেতে জাহাজে ওঠে।

—আমাদের জাহাজের নাম কি বল তো? চোঙা জিজ্ঞেস করে ধাঁধার প্রশ্নের মতো। রেলিংয়ের ওপরে একটু ঝুঁকে টুটুল পড়ে পাশ থেকে,—কে-আই-ডবলিউ-আই।

—পারলি না, কিউই, কিউই। মানে কি বল তো?

—একটা পাখি, আমি দেখেছি, বাবার জুতোর কালির ঢাকনিতে। কিউই ব্র্যান্ড কালি।

—আমি চিড়িয়াখানায় দেখেছি।

টুটুল যদিও বাবার জুতোর কালির ঢাকনায় পাখিটার ছবি দেখেছে কিন্তু সেই পাখির সঙ্গে এই সুন্দর ভাসমান অবলীলাক্রমে জল কেটে যাওয়া জাহাজটার সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। বরঞ্চ 'সোয়ান' রাখলে পারত। 'সোয়ান' মানে রাজহাঁস, সম্প্রতি সে, জেনেছে।

এস. ডি. ও. ভবনাথ চৌধুরীর ছোট ছেলে তার দিদি-দাদার থেকে একটু আলাদা। ফেলে-আসা রাণাঘাটের জীবনটার আকর্ষণ এখনও তার কাছে প্রবল। আবহমানকাল আমরা তুলেছি সোনালী ধান বুনেছি বীজ।

বুড়ী ও চোঙা সশব্দে হেসে ওঠে।—চূর্ণী নদীতো একটা নালা রে, বুড়ী বললে।

বিশাল ঢেউ আর ফেনা সমুত্থিত প্যাডেলস্টিমারের অগ্রভাগের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে টুটুল বলে,—আমার ছোট নদীই ভাল লাগে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমার ভোঁ দেয়। আর আদিগন্ত বিস্তৃত নদীর মাঝখানে সেই গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে তার ছোট্ট হৃদয়ে। এ আর এক জগত, জলের জগত, মাঝ নদীতে ডিঙ্গি বাওয়া শক্তির জগত, গঞ্জে গঞ্জে প্রাণ-চাঞ্চল্যের জগত, নৌকোর হালে সাদা-দাড়ি মাল্লার স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার জগত—এ জগত রাণাঘাটের ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা এস. ডি. ও. কোয়ার্টারের দ্বীপ থেকে আলাদা। টুটুল বুক ভরে বাতাসে জলের গন্ধের সঙ্গে এই নবীন জগতের আঘ্রাণ নেয়। নেজের মনেই বলে,—এত জল, আমার ভয় করে।'

তোর ভয় করে, আমার ভাল লাগে। আমার বিপদ ভাল লাগে। চোঙা বললে।

এবার যে গঞ্জটা আসছে তা আগের চেয়েও বড়। কাদায় বাঁশপোতা ভিতের ওপর নদীর দিকে পেছন করে সার সার টিনের ঘর। তাদের একটায় মস্ত বড় করে সাইন বোর্ড 'গ্র্যান্ড হোটেল'। কাছেই ফ্ল্যাট, তার গায়েই আর এক হোটেল। মাংসের ঝোলের গন্ধ মিশে থাকে নদীর তীরে পলিমাটির গন্ধে।

ডেক চেয়ারে বসে আছেন ভবনাথ। চাঁদিতে টাক কিছুদিন হল বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে কোঁকড়া চুলের গুছি হাওয়ায় দোলে। এতক্ষণ রৌদ্রঝলকিত নদীবক্ষে গুনগুন করছিলেন। রাণাঘাটের গোপাল মাস্টার সম্প্রতি তাঁর বেহালায় শ্যামাসঙ্গীতের অব্যবহিত পরেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলছিলেন বুড়ীর দিদি গৌরীর জন্যে সেই গানটা : অয়ি ভুবন মন-মোহিনী, অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী......রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কোন গানের ভাষায় যদি যুক্তাক্ষর সন্ধি সমাসের বাহুল্য থাকে তবে সে গানগুলো তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট ঠেকে। স্বর্ণসুন্দরী পাশে বসে চোঙার পুল-ওভার বোনেন। একবার স্বামীর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন,—প্রতাপটার চিঠি পেতে এবার এত দেরী হচ্ছে কেন বল তো। তুমি গিয়েই টেলিগ্রাম করে দাও। আবার ঠান্ডাটান্ডা বেশী লাগলে......

ভবনাথ সেদিকে কান দেন না। বলেন,—ভোলার কথা মনে আছে?

—কোন কথা?

,—সেই রাতগুলোর কথা? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা। উঃ কি মুস্কিলেই ব্যাটারা ফেলেছিল। সতীন সেনের দল খঞ্জনী বাজিয়ে যাবেই সেই রাস্তা দিয়ে, আর ওঁদিকে সড়কি আর লাঠির একেবারে জঙ্গল। মিউজিক বিফোর মস্ক! উঃ কি সব দিন গিয়েছে!

—সেইরকম দেশেই তো আবার যাচ্ছো।

—তা যাচ্ছি। ভবনাথ বলেন লোকজনে টাপুর টুপুর জেটিটার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাশেই দুটো মস্ত গহনা নৌকায় গাদি করে লোক উঠছে। জানলা দিয়ে বোধহয় নববিবাহিত এক কিশোরী তাকিয়ে আছে জলের দিকে। 'গ্র্যান্ড হোটেল' থেকে লোকে বেরোচ্ছে পান চিবুতে চিবুতে, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছছে কেউ।

স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ চোখ তুলে বললেন,—এই যে সব কাগজে কাগজে লিখছে, ছেলেরা জেল খাটছে। তুমি ভাবতে পারো, ইংরেজরা নেই আমাদের দেশে? আমি ভাবতে পারি না।

—আমিও পারি না স্বর্ণ। আমাদের মধ্যে এতরকম দল, এত মত। ইংরেজ চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে জানো? ইংরেজদের আসার আগে অযোধ্যার রাজা যেমন দেশ শাসন করত ঠিক তেমনি। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, অরাজকতা।

অদূরে সাদা কালো স্টিমার খানা গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরী বলেন,—আমরা তো বলতে গেলে পার করে দিলাম আমাদের জীবন। ভাবছি ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের সময়ে পাল্টে যাবে অনেক কিছু। বলাই বলত—

—ও বাবা! তুমি এখনও বলাইকে ভুলতে পারো নি।

—নাঃ বলাইটা বেশ ছিল। একটু থেমে বললেন,—বলাই বলত মা, গাঁয়ের লোকে ইংরেজও বোঝে না, কংগ্রেসও বোঝে না, তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়।

ভবনাথ উৎসাহিত হয়ে বললেন,—আমিও তাই বলি স্বর্ণ, আমিও তাই বলি। গাঁয়ে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, শহরে চাকরীর ব্যবস্থা নেই, আগে তার একটা হিল্লে করো। বড়দা আমাকে খোঁটা দিতেন ইংরেজের গোলাম বলে, কিন্তু গোলাম না হয়ে যদি পাবনার বাড়িতে পড়ে থাকতাম, তাহলে কি এমন দেশের উপকারটা করতাম! যেখানেই গিয়েছি মেয়েদের স্কুল বসিয়েছি, রাস্তা বানিয়েছি, দু-চারটে লোকের চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। আর ইংরেজ লোকগুলো তো খারাপ না। এই ব্র্যান্ডি বলো, ফকাস বলো, চমৎকার এড্‌মিনিস্ট্রেটার। কোন ব্যাপারে মাথা গরম করেনা। সব ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করে। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে।

—আমার বাবা একটু ভয় ভয় করছে, তোমার এ নতুন জায়গা। যেরকম সব শুনছি টেররিস্টদের ব্যাপার।

'আমার তো আইন আছে স্বর্ণ। আমি আইনমাফিক চলব। আমায় কাউকে ভয় নেই।'

—মা, ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ! চোঙা দৌড়তে দৌড়তে আসে। স্বর্ণসুন্দরী নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর একটা গঞ্জ আসছে। কয়েকটা পানসী এগিয়ে আসছে মন্থরগতিতে।

স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন ক্যাবিনে। ক্যাবিনের ভেতর স্টোভ ফোঁস ফোঁস করছে। এক কোণে লুচি বেলছে গোপীনাথ। কিছুক্ষণ পর বড় বড় চাকা চাকা করে বেগুন ভাজা আর একথালা ভর্তি লুচি নিয়ে আসে গোপীনাথ। জলের হাওয়ায় প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের। কাড়াকাড়ি করে ছেলেমেয়েরা খায়। আর সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্নেহে ও প্রশান্তিতে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বন্দেমাতরম টেররিস্ট, ইংরেজ, চাকরীর জগতে উচ্চাশা তার মন থেকে সরে যায়। জন্তুর মতো বড়ো বড়ো মায়াবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন তিনি ঈশান চৌধুরী নন, নতুন নতুন দিকে কর্মৈষণায় উদ্যোগী পুরুষ নন, তিনি একজন শান্তিপ্রিয় আত্মমুখীন মানুষ। বাইরের জগতের উত্থান পতন আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করে কিন্তু তাঁকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে না। ইংরেজের চাকরী তাই কোনদিন তাঁর পক্ষে ঠিক একটা মিশান নয়। আর মিশান নয় বলেই যে ঝপাঝপ উন্নতি তাঁদের অফিসারদের ঘটে তা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেনি। ব্রান্ডি ফকাস সত্যিই ভাল এডমিনিস্ট্রেটার, তারা বাজে ঘোড়া ধরেন না। ইংরেজের চাকরী যাঁদের কাছে মিশান না, যাঁরা আইনের বইয়ের বাঁধা রাস্তায় যতটুকু বলা আছে ততটুকুই করবেন, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারা যায় যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করবেন এরকম লোক তাঁরা পছন্দ করেন না। তাঁরা নিজেরাই রুটিন বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু রুটিনের চৌহদ্দীতে কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে মুস্কিল, আরও কিছু উপরি আছে, ক্লাব আছে, মেলামেশা করার ব্যাপার আছে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হবার ব্যাপার আছে, এ সবের

মধ্যে যাঁরা নেই সে সব অফিসার কখনই আদর্শ অফিসার নন।

খাওয়া পর্ব মিটলে স্বর্ণসুন্দরী ধীরে ধীরে বললেন,—তোমার এই সাতে নেই পাঁচে নেই ভাবখানা আমি বুঝি না একদম। বাবা বলতেন, কাজ করতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সব সময় তাই নিয়ে ভাবতে হয়। শুধু ছাড়াছাড়াভাবে থাকলে চলে না।

ভবনাথ হাসেন।—তুমি যে কি বল স্বর্ণ! এমন চাকরি করছি, লোককে জেলে পাঠাচ্ছি, কলকাত্তায় বাড়ি বানাচ্ছি, ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছি, তবু তুমি বলবে ছাড়াছাড়াভাবে থাকি?

আর ভবনাথের সেই শান্ত চোখভরা কোমল দৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে পাবনা বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে ভবনাথের প্রপিতামহ রুদ্রনাথের ছবিখানা ভেসে ওঠে স্বর্ণর মনে। এমনি শান্ত কোমল মায়াবী চাহনি। এর ঠিক উল্টো ঈশান চৌধুরীর চোখ দুটো, তীক্ষ্ণ তীব্র, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার চাহনি। তার নিজের বাপের চোখও ছিল বেশ আয়ত ভাবগম্ভীর কিন্তু তা ভবনাথের মতো কোমল মায়াবী নয়। বেশ আত্মবিশ্বাসের ছায়া ছিল সে দৃষ্টিতে।

—এটা কি নদী?

—ধলেশ্বরী।

—সেই একইরকম তো দেখতে।

—একই রকম।

ভবনাথ ও স্বর্ণ দুজনেই সেই বিস্তীর্ণ বাদামি জলে রোদ্দুরের খেলা দেখতে থাকেন।

—আর দুবছর পর থেকেই আমার বৃহস্পতি খুব তুঙ্গী, বুঝলে স্বর্ণ।

—ওসব আমি বুঝি না। সাহেবদের সঙ্গে দহরম-মহরম করবে না! উন্নতি কি হেঁটে হেঁটে তোমার দোর গোড়ায় আসবে?

—প্রতাপটা ফার্স্ট চান্সে বোধ হয় পারবে না। কিন্তু সেকেন্ড চান্সে যদি পারে, তাহলে মার দিয়া। শিশুর মতো কলমল করে ভবনাথের মুখখানা।

—তোমার নিজের জামাকাপড়গুলো একটু ভাল করো। একটা ভাল সুট নেই তোমার। সেই কবে গোলাম মহম্মদ থেকে একটা সার্জের সুট করিয়েছিলে।

—চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

—ওসব কথা আমায় বোল না। ওরকম গেঁয়ো কথা ভাব বলেই এই দুর্দশা। স্বর্ণসুন্দরীর গলায় ঝাঁঝ।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ক্যাবিনের সামনেই ডেকের এককোনে চাক বেঁধে আছে।

—এরকম জল তুমি কখনো দেখেছো নানা? টুটুল প্রশ্ন করে।

—নানা সব দেখেছে, নানা সব দেখেছে। তুমি হিমালয় পাহাড়ে উঠেছো? বল উঠেছি। চোঙা বললে।

—দার্জিলিং-এ হিমালয় পাহাড় নেই? কত বরফ পাহাড়ের মাথায়!

—তুমি বিলেত গিয়েছো নানা, বিলেত? চোঙা মুখ ভেংচায়।

—এই যাঃ। বলে টুটুল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করতেই কুরুক্ষেত্র বাঁধে। দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকে গড়াতে থাকে। চোঙা টুটুলের চুল পড়পড় করে টানতে থাকে। থামাবার বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে বুড়ী দৌড়ুয় মায়ের সন্ধানে। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী যখন এলেন তখন ব্যাপারটা মিটে গেছে। দুজনেই সামনের রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এবার অনেক লোক নামে, অনেক লোক ওঠে। লোকজনের ওঠানামায় তাড়া নেই। জাহাজ বেশ খানিকক্ষণ থাকে। গুড়ের নাগরীতে ঢাকা কয়েকটা নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগে। ঝাঁকাভর্তি লাউ-শশা কুমড়ো নামে জাহাজ থেকে। ধুতি লুঙ্গি পাঞ্জাবী গেঞ্জি, হাফশার্ট, খালি গা কম। ক্বচিৎ প্যান্টপরা একটা দুটো লোক, শোলার টুপি মাথায় একটা সাহেবও দেখা গেল। দুতিনটে সম্পন্ন হিন্দু পরিবার উঠলেন জাহাজে। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, কপালে গোল

সিঁদুরের টিপ, কারুর হাতে পানের বাটা।

—কিসের জন্যে নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত বলতো? বুড়ী হঠাৎ ফস্ করে প্রশ্ন করলে।

দু ভাইকেই বিব্রত দেখায়, বিশেষ করে চোঙাকে।

বুড়ী উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, "ঢাকেশ্বরী কটন মিল।"

—মুন্সীগঞ্জ বলতো কিসের জন্যে বিখ্যাত?

—মুন্সীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ? পাটের জন্যে বুড়ীর গলায় মরিয়া ভাব।

ঠাই করে একটা বুড়ীর গালে চড় কষিয়ে চোঙা চেঁচায়—পারলি না, পারলি না।

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু সে চেপে ধরে, বল, বল, তুই বল।

এক মুহূর্ত বিপন্ন দেখায় চোঙাকে। তারপর তার দিদিকে রেলিং-এর দিকে ধাক্কা দিয়ে বললে,—এই জন্যে! বলেই সে দোতলার ডেক দিয়ে পাড়ি কি মরি করে দৌড়ায়।

সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে একদল বৌ ছোট ছেলে মেয়ে। ডেকের পেছন দিকে এক বৃদ্ধ নামাজ পড়ছে। চোঙা থমকে দাঁড়ায়। তারপর তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। ওপরের দিকে চার পাশটা খোলা, আরও হাওয়া, চোঙার মুখে কানে হাওয়া ঝাপটায়। দুপাশে খালি রেলিং তারপর স্টিমারের দীর্ঘ ছাতে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ির মুখে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটা ঘর। হুইলে বসে, সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা একটা লোক, পরনে পাটভাঙ্গা বেগনে লুঙ্গি।

বুড়ো কোন দিকে তাকায় না। ফুরফুরে হাওয়া তার দাড়ি সামনের দিকে ওড়ায় আরও ছুঁচলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখায় তার মুখ। সামনে খোলা কাচের জানলা দিয়ে আরও প্রসারিত লাগে নদীর বুক।

—এবার আমরা কোথায় আসছি?

—মুন্সীগঞ্জ।

পেছনে তাকাতেই চোঙার মেজাজ খারাপ হয়। বুড়ী ও টুলটুলও ওপরে উঠে এসেছে।

এবার সারেঙ আগুলে দিয়ে সামনের দিকে দেখায়। দিগন্তবিস্তৃতীর্ণ পাটক্ষেতের মাঝখানে ছোট একটা ফ্ল্যাট জলে ভাসছে। তিনজনই উদগ্রীব হয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। এই বিস্তীর্ণ বাদামি জলের গায়ে আকাশ পর্যন্ত ঘন সবুজের মাঝখানে তাদের জীবনযাত্রা আবার কিভাবে শুরু হবে ভেবে তারা অবাক হয়। সিঁড়ির নীচ থেকে গোপীনাথের হাঁক আসে। তারা উৎসাহে নামতে থাকে। মালপত্তর ইতিমধ্যেই নীচে নামানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ মানে সেই ভাসন্ত ফ্লাটখানা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। চোঙা আর সহ্য না করতে পেরে কট করে একটা চিমটি দিল বুড়ীকে। আবার একটা গোলমাল পাকাচ্ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজ ভোঁ দিতে সুরু করেছে। নদীর মাঝখান থেকে অর্ধবৃত্তাকারে পাক নিতে থাকে জাহাজখানা। জেটিতে পাটাতন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ছিপছিপে দাড়িওয়ালা লোক এক লাফে জাহাজে ওঠে। বেঁটে রোগা শক্ত চেহারার ওপর তার নীল উর্দিটা একটু বেমানান রকম বড় কিন্তু তার কাঁচা পাকা দাড়ি ভর্তি মুখ হাসিতে আধবোজা তীক্ষ্ণ চোখ, আর মাথায় পাগড়ির ওপর সদ্য পালিশ করা ইংরেজ রাজার তকমা—সবটা মিলিয়ে জাঁকাল চেহারা।

ভবনাথকে সেলাম করে স্বর্ণসুন্দরীর দিকে তার হাসিভরা মুখখানা তুলে বললে,—আমার নাম সামেদ। তারপর সামেদ আর্দালি টুটুলের হাত ধরে। টুটুল অবাক হয়ে শোনে, বাজখাঁই গলায় সামেদের চীৎকার, খবর্দার, হট্ যাও, হট্ যাও। যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা করে। ভবনাথ, স্বর্ণসুন্দরী, ছেলেমেয়েরা, কুলির মাথায় মাল এবং সবার শেষে সামেদ তক্তা পার হয়ে জেটিতে নেমে জেটি ছাড়ার পর যাত্রীরা একে একে নামে। উঁচু বাঁধের ওপর পায়ে চলার রাস্তা। মস্ত এক বাদাম গাছের চেটাল পাতাগুলো যেন এইমাত্র কেউ গলা তামায় চুবিয়ে তুলেছে। তার নীচেই খালে অপেক্ষমাণ নৌকো। সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য লাগে ছেলেমেয়েদের। টুটুলকে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে কি বললে চোঙা। বোধহয় নৌকোর পেছনে খাটো ছিপলে

ঘেরা পায়খানার ব্যবস্থাও তাদের অবাক করে।

নীল উর্দিপরা সামেদ নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক পতাকার মতো। খালের জল থেকে মৃদু কলকল আওয়াজ আসে, টুটুল হাত জলে ডুবিয়ে খানিকটা শেওলা দাম তুলে আবার ছুড়ে ফেলে দেয়। দুপাশে পড়ন্ত বাঁশ ঝোপ, জলের ওপর শুকনো পাতা একরাশ ছড়িয়ে আছে নুয়েপড়া কাঁঠাল। এক এক জায়গায় খালের দুপাশ দিয়ে নোয়ানো গাছ, বাঁশ ঝাড় নৌকোর ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ে। দেখতে দেখতে খাল চওড়া হয়। এক জায়গায় আর একটা খালের সংযোগে নদীর মতো দেখায়। জলে আরও বড় বড় ঢেউ দেয়। সামেদ জানিয়ে দেয়, এ জায়গার নাম কাটাখালি। নদীর সঙ্গে সরাসরি যোগ। বড় একটা নৌকো থেকে পালের মতো চেটাল জাল একবার জলে ডোবে, আবার ওঠে। যতবার ওপরে ওঠে চাঁদা, পুঁটি, আর রুপোলী ছোট ছোট মাছ ঝকমক করে রোদে। এবার বাঁক নেয় নৌকো। গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায়, তাদের গন্তব্যস্থল। সামেদ তার সরু লম্বা আঙুল তুলে দেখায় খাপরায় ছাওয়া সাদা ধপধপে একতলা বাড়ি। টুটুল চোঙা বুড়ী আগে থেকেই ইদ্রাকপুর ফোর্টের নাম শুনেছিল। একটা অদ্ভুত কেল্লা, যার সামনে দুটো কালো কামান মুখ উঁচিয়ে আছে এরকম কল্পনা তাদের তিনজনেরই মাথায় চেপে বসেছিল। কিন্তু কাছে আসতে সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু মনে হোল না। তবে চারপাশের উঁচু পুরু পাঁচিলের গায়ে গায়ে কামান দাগবার জন্যে বড় বড় ফোকরগুলো দেখে তাদের বিস্ময় জাগে। কোয়ার্টারের ঠিক নীচেই পুকুর, তার আগে সারি সারি কামিনী জবা আর ফুলন্ত ঝুমকো লতার গাছ। মগেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিন-চারশো বছর আগেকার এই কেল্লা মানে এখন মাটি ভর্তি তেতলা সমান উঁচু গোলাকার পুরু ইঁটের পাঁচিলের ওপর বিশাল বাঁধানো চত্বর, আর তার ওপর একতলা খাপরায় ছাওয়া সাদা ধবধবে সাব ডিভিসনাল অফিসারের কোয়ার্টার। ছেলেদের সবচেয়ে ভাল লাগে ওপরে ওঠবার বিস্তৃত সিঁড়ি, যেন বিশাল ঘাটের সিঁড়ি নেমেছে অনেক উঁচু থেকে। ছেলেরা রেস দেয় বুড়ীর এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগে না।

দুই

মাস তিনেক পর মর্নিং স্কুল সেরে টুটুল দৌড়ে বাড়ি ফিরছে। দু' চোখে জল ঝরছে আর সেই জল মুছবার চেষ্টায় হাতের কালি মুখে লেবড়ে একাকার। স্কুলের প্রায় গায়েই বিশাল জলের আয়তক্ষেত্র যেখানে সে আর দাদা পুঁটি মাছ ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ির ফটকের সামনেই হাওয়ায় দোলা, বিশাল তিন-চারটে শিরিষ, তার একটার নিচে কয়েক দিন আগে চোখফোটা অনির্বচনীয় শোভায় ঝলমল চারটে বাদামি সাদা কুকুরের বাচ্চার খেলা, জলের ধারে শ্যাওলা দামের ওপর কখনও স্পন্দিত কখনও স্থির নীলচে লম্বাটে দুটো ফড়িং, প্রকাণ্ড চওড়া ফাটা পুরনো ফটকের গায়ে স্পর্ধিত পঞ্চজবার ছড়া, তাদের বাড়ির নীচেই টলটলে জলেভরা ঘাট বাঁধানো পুকুর, সিঁড়িতে রিভলভার খুলে সাফ করতে ব্যস্ত ভবনাথের দুই বডিগার্ড, প্রাণপ্রসাদ আর রাম-স্বরূপ, এগুলোর কোনটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

ওপরেই তাদের পড়ার ঘরের সামনে গৃহশিক্ষক মধুবাবু দাঁড়িয়ে। দুই ছেলেকে ও মেয়েকে পড়ানোর বেতন দশ টাকার নোটখানা নীল শার্টের বুকপকেটে গুঁজতে গুঁজতে শীর্ণ বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটি থমকে দাঁড়ান।

—কি হল ? পরীক্ষা কেমন হল ?

টুটুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে,—আমি স্যার রাইনোসেরাস...স্যার...পারিনি।

—কি বানান লিখেছো ?

—আর এইচ আই এন ও সি ই আর ও ইউ এস এতক্ষণ মন্ত্রের মতো যে অক্ষরগুলো জপ করতে করতে আসছিল সেগুলো টুটুল উগরে দেয়।

মধুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন,—কেন, ঠিকই তো আছে। বিরক্ত হলেই শীর্ণ মুখখানা আরও ছুঁচলো দেখায় মধুবাবুর।

শার্টের হাতায় মুখ মুছতে মুছতে টুটুল হেসে ফেলে।

—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ? তাহলে ভাল করেছি।

দুদিন পর রেজাল্ট বেরোল। টুটুল বেয়াড়ারকম ভাল করেছে প্রায় সব বিষয়ে। দু' ক্লাস ওপরে চোঙা সপ্তম, বুড়ী পঞ্চম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ডিপার্টমেন্ট স্বর্ণময়ীর। ভবনাথের এদিকে তাকাবার সময় নেই। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই প্রাণ অস্থির। বজ্রযোগিনী গ্রামে কিছু বোমা ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গেছে। ঘন ঘন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসছে, তার সব-গুলোই নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

সেদিন দুপুরবেলায় চাতালের কোণে দুই ভাইয়ের তর্ক বাধে পরীক্ষার ফল নিয়ে। পরীক্ষায় কারা ভাল করে জানিস ? জানিস টুটুল ? কারা ভাল করে ?

যারা ভালভাবে পড়াশোনা করে, টুটুল সাবধানে জবাব দেয়।

ঠিক বলেছিস, যারা আর কিছু জানে না, একেবারে বইয়ের পোকা।

টুটুল চুপ করে থাকে। সম্প্রতি তার পরীক্ষার ফলাফল নিজের কাছে ভাল লাগলেও একটু অস্বস্তিরও কারণ ঘটিয়েছে। চোঙা যদি তৃতীয় স্থানের ভেতরে পড়ত তাহলে তার সাফল্যের সার্থ-কতা ছিল। কিন্তু যা ঘটেছে তাতে দু ভাইয়ের মধ্যে একটা সরু অথচ ধারাল বিভেদের রেখা মাথা তুলছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো পড়াশোনাই করে নি। খালি গান করত আর নাচত।

টুটুলকে এবার বিহ্বল দেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুলপালানো ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে শুনলেও ঠিক এভাবে শোনেনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—হয়তো অ্যানুয়েলে আর ভাল করব না।

—তুই আবার করবি না! যেরকম গবেট হয়ে যাচ্ছিস !

এরপর কথা চলে না। কিন্তু পরীক্ষায় সার্থকতা ও জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে দুই ভাইয়ের আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে।

হঠাৎ নীচ থেকে পাঁড়ের গলা আসে,—ও দাদাবাবু, দাদাবাবু পুকুর ঘাটে তাদের সাঁতার-শিক্ষক, জেলখানার হেড জমাদার ছাপরা জেলার অধিবাসী পাঁড়ে। ঘাটে পাতাকাটা কলাগাছ। উত্তেজনায় ধক ধক করতে থাকে টুটুলের বুক। চোঙা চেচাতে থাকে,—আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হব কিন্তু কলা গাছটা জলে নামানো মাত্রই কোথা থেকে বুড়ী এসে ঝাঁপিয়ে পাঁড়ের গায়ে হেঁচড়েমেচড়ে উঠে কলাগাছটার ওপরে চেপে বসে, তারপর তাদের চোখের সামনে দিয়ে বুড়ী সারা পুকুর ঘুরে বেড়ায়। পাঁড়ে সাঁতরে সাঁতরে তার সঙ্গে ভেসে চলে। একবার পুকুরটা ঘুরে আসার যে বিলম্ব তা দুজনের কাছেই ক্রমশ অসহ্য লাগে। চোঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, —আমাদের আর শেখা হবে না।

তারপর চোঙার পুকুর পরিক্রমায় টুটুল স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুড়ী সমানে ফোড়ন কাটে,—জল টান, হাত দিয়ে জল টান, একদম হচ্ছে না। কত যুগ পরে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাঁড়ে ডাকে,—টুটুলবাবু, এসো। টুটুল আড়ষ্টভাবে বসে থাকে কলাগাছের ওপর। গোল পুকুরটার ওপরে নুয়ে আসা বটের নীচে জলটা ঠাণ্ডা আর কালো, টুটুলের একটু ভয় ভয়ও করে। মুখ দিয়ে কুলকুচি করতে করতে পাঁড়ে পাশে পাশে এগোতে থাকে। টুটুল প্রাণপণে দুহাত দিয়ে জল টানে। হঠাৎ হড়কে কলাগাছ থেকে সড়াৎ করে জলে পড়েই দুর্দান্ত চীৎকার শুরু করে,—আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো। চোঙা ফুর্তিতে হাততালি দেয়। —ইস্, কি রকম থিয়েটার করতে পারে টুটুলটা! বুড়ী চেঁচিয়ে বলে। পাঁড়ে সঙ্গে সঙ্গেই টুটুলকে তুলে দিয়েছে কলাগাছে, কিন্তু তার মুখচোখে তখনও আতঙ্কের ভাব কাটে নি।

যেদিন সাঁতার শেখা নেই সেদিন, বিশেষ করে ছুটির সকালে, জেলখানায় কনস্টেবলদের কোয়ার্টারে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দেয় ছেলেরা। ছ ফুট লম্বা নেংটিপরা পাঁড়ে পাঁচশো ডন, পাঁচশো বৈঠকি দেয়। তার ফর্সা তেলে ঘামে ভেজা চকচকে শরীরখানা ওঠে আর নামে, আর

যত পরিশ্রম বাড়ে নিশ্বাস সশব্দে ওঠে পড়ে। পাঁড়েকে দেখে টুটুলের মনে হয় সে যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছে। কাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ ? সেই সব ছেলেরা যারা 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচায়, জেলে যায়, যাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে বাবা-মা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে কথাবার্তা বলে, তারা ?

পাঁড়ে আধঘণ্টা ধরে জিরোয়, বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাওয়া খায়, আর এক কনস্টেবল পেস্তা আর ভাঙ ঘোঁটে কালো পাথরের বড় গেলাসে। এক গেলাস সরবত এক চুমুকে শেষ করে' ভারি মদালস চোখে ছেলেদের কাপড় ছাড়তে বলে।

পাশের ঘর থেকে লেংটি পরে দুটো ক্ষুদে তালপাতার সেপাই বেরিয়ে আসে। এ অবস্থায় দুজনকে দেখে দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোঙার নাম সার্থক, পশ্চাদ্দেশ বলে কিছুই নেই। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে টুটুলের চোখে জল আসে। দুটো ইঁটে হাতে ভর দিয়ে বুকটা নামতেই পাঁড়ে বাঁ হাত দিয়ে চেয়ে মেঝের সঙ্গে ঘসে দেয়। কয়েকবার ডন দেওয়ার পরই হাত ছিঁড়ে পড়ে। পাঁড়ে বিষণ্নভাবে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার দেশে এই বয়সের ছেলেদের স্বাস্থ্য মনে করে ঘাড় নাড়ে।

ছেলেদের সম্প্রতি হাসিতে পেয়েছে। বিশেষ করে শরীরের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম প্রায়ই তাদের অকারণ হর্ষের কারণ ঘটায়। কয়েকদিন পর সেলাইয়ের কলে কমলালেবু রঙের পর্দা সেলাই করছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে শুনলেন, চাতালে চোঙা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—পোঁদ, পোঁদ ! বলবার সঙ্গে সঙ্গেই দুভাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্বর্ণসুন্দরী গলা ভারী করে হাঁকলেন, চোঙা ! দুই ভাই-ই এগিয়ে আসে পুলকিত উৎফুল্ল মুখে। স্বর্ণসুন্দরী ধমক দিলেন, কিন্তু খুব সুবিধে হল না।

হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সন্ধেবেলা। চাতালে সতরঞ্চি পেতে লণ্ঠনের আলোয় দুভাই পড়ে মধুবাবুর সামনে। হঠাৎ চোঙার নজর পড়ে মধুবাবুর নাকের ওপর। নাকের ফুটো দিয়ে কাঁচাপাকা নস্যিমাখা কয়েকগাছা চুল বেরিয়ে আছে। লসাগু করতে করতে খাটো গলায় যেই চোঙা বলে,—নাকে চুল, অমনি ভয়ে কাঠ হয়ে যায় টুটুল। ব্যাপারটা আগেও খেয়াল করেছে কিন্তু এমন বিপজ্জনকভাবে হাসির দমক উঠে আসে যে, চাপতে গিয়ে চোঙার দিকে চেয়ে সে একেবারে স্তম্ভিত। চোঙা মাথা নীচু করে খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসছে। এর পর সহ্য করা যায় না, হা হা হা হা করে দিক্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য টুটুল হাসতে থাকে।—ও স্যার হাসছে স্যার, ও স্যার হাসছে বলে চোঙাও সে হাসিতে যোগ দেয়। মধুবাবু এমনিতেই তিরিক্ষে, তার ওপর অর্শের প্রাতঃকালীন আক্রমণে সম্প্রতি বিপর্যস্ত। চেঁচিয়ে উঠলেন,—কী হয়েছে তোমাদের, মদ খেয়েছো ?

এরপর বাঁধ বাঁধার কোন ব্যাপার থাকে না। মদ খাওয়ার সম্ভাবনায় দুভাই হাসিতে আবার গড়িয়ে পড়ে। মধুবাবু তাঁর শীর্ণ আঙুলে কট কট করে কান মলে দিলেন চোঙাকে। তাতে সাময়িক কাজ হল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসির ফোঁপানি চলল। মধুবাবু সংস্কৃত শ্লোক লিখে দেন দুই ছেলেকে, মুখস্থ করবার জন্যে। রোজ সকালে উঠে বলবে, বুঝেছো ?

পাপহং পাপকর্মাহং
পাপাত্মা পাপসম্ভবম্।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ
সর্বপাপ হর ভব ॥

মধুবাবু চলে গেলে চোঙা বললে,—আমরা পাপী, আমরা মদ খাই, কি মজা !

কয়েকদিন পর থেকেই সাঁতারের ধুম পড়ে যায়। ছুটি হলেই দশটা না বাজতে ছেলেমেয়েরা জলে পড়ে। উঠতে উঠতে কোন কোনদিন শোনে জেলখানার পেটা ঘণ্টায় বারোটা বাজার ধ্বনি। —ছেলে-মেয়েগুলো লোহা হয়ে গেল। তুমি তো একটা কথাও ওদের বলবে না। সবই যেন আমার গরজ, প্রায়ই স্বর্ণসুন্দরী অনুযোগ করেন স্বামীকে কিন্তু ভবনাথের কোন দিকে আর তাকাবার সময় নাই। টেররিস্ট গ্যাং ধরা পড়েছে। তাদের চালান দেওয়া হয়েছে মুন্সীগঞ্জের জেলে। তার মানে তাঁদের বাড়িও এবার সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হয়ে পড়তে পারে।

ভবনাথের এ দুর্ভাবনার শরিক তাঁর ছেলে-মেয়েরা নয়, এমন কি স্বর্ণসুন্দরীও নন।

কলকাতার নতুন বাড়ির ভাড়া বাবদ একশো কুড়ি টাকা আসছে গত মাস থেকে, যদিও মরগেজ, ধার মিটাতে অনেক বছরের ধাক্কা তবু এই নতুন প্রাপ্তিযোগ স্বর্ণসুন্দরীকে আরও স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে।

চোঙা সাঁতরায় মাছের মতো। নিখুঁত হাতের পায়ের কাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলে। টুটুল আর বুড়ী ততো এগোয় নি। দুজনেই পায়ের কাজে বেমানান, প্রায় ব্যাংয়ের মতো দুপা চেদরিয়ে জল কাটে, গতিও অনেক মন্দ।

কিন্তু ব্যাং কিংবা মাছ যাই তার তুলনা হোক, এই জলে দাপাদাপি টুটুলের শৈশবের সবচেয়ে বড় ঘটনা। যেদিন হাওয়া দেয় সেদিন রোদ্দুরে জল ছল ছল করে, জল ডাকে। যাকে ভালবাসা যায় আদর করা যায় এমনি একটা সত্তা পুকুরের। আবার যেদিন সাঁতরে সাঁতরে ওপারে বটের ছায়ায় আরও ঠাণ্ডা জল কেটে এগোয় তখন ভয় করে, ভয়ে আরও হাঁফ ধরে, কোন রকমে জল ঠেলে ঘাটে উঠতে ইচ্ছে করে। আর তাদের ছোট ছোট শরীরগুলোয় রক্ত চনমন করে। তিনজনেরই মুখে বেশ কালো ছোপ পড়েছে। কিন্তু চোখগুলো আরও জ্বলজ্বলে। সারা দিন ব্যাপী তাদের তিড়িংমিড়িং প্রবণতায় স্বর্ণসুন্দরীর প্রাণ আরও অস্থির।

একদিন আর থাকতে পারলেন না। সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। ভবনাথ বৈঠকখানায় অফিসের ফাইলপত্তর দেখছিলেন। তাঁর বেড়ানোর ছড়িখানা আলনার কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।—আজ তোমাকে শাসন করতেই হবে। এর পর যদি নিউমোনিয়া হয় তখন তো আমাকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।

নীচে তখন সাঁতারের রেস চলেছে। একবার ও ঘাট ছুঁয়ে ফিরে আসা। চোঙা প্রায় দশ-পনেরো হাত সামনে সাঁতরে আসছে। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরী শাসনের প্রতিমূর্তি রূপে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেও চোঙার পারদর্শিতায় তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না।—একেবারে নিউমোনিয়ায় না পড়ে ছাড়বে না, স্বর্ণসুন্দরী বিড় বিড় করেন। তিনজনেই হুড়মুড় করে ঘাটে উঠে ছড়ি হাতে ভবনাথকে দেখে মুহূর্তের জন্যে ভড়কে দাঁড়ায়। তার পর তিড়িং তিড়িং করে তিনজনেই পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠে যায়। বুড়ী উঠেই ভেজা গায়ে ফ্রক পরে নেয়, দুভাই ভেজা প্যান্টে খাটের নীচে এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে হাঁপায়। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী স্বামীকে সে ঘরে নিয়ে আসেন। হেঁট হয়ে খাটের নীচ দেখিয়ে বলেন,—বাঁদরগুলো ঐখানে আছে, মারো, মারো !

ছড়ি হাতে ভবনাথ যখন গুঁড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসেন তখন সেই দৃশ্যের অভাবনীয়তায় দুই ছেলেই স্তম্ভিত হয়ে থাকে। খুব আস্তে একবার করে ছড়ির আঘাত করে ভবনাথ বলে ওঠেন,—স্টুপিড ! ভেজা গায়ে সে আঘাত জ্বলে।

সেবার বর্ষা শেষ হতে না হতেই ভবনাথের জলপথে যাতায়াত খুব বেড়ে যায়। গত মাসে একশো সাঁইত্রিশ টাকা টি. এ. বিল হয়েছিল। প্রতাপের পরীক্ষার ফি, শীতের জামা বাবদ চাহিদা যত বাড়ে ভবনাথের জলপথে ভ্রমণ তত বেড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মা পার হতে হতে নৌকোর ক্রমাগত দোলানিতে, বিশেষ করে রাত্তিরে, একলা লাগে। একটু একঘেয়েও যে ঠেকে না তা নয়। এবার তাই সপরিবারে জলপথে যাত্রা।

ভবনাথের নৌকো যখন লৌহজঙের পথে তখন ভোর হয়। সারা রাত্তির নৌকোর দুলুনি, গলুইয়ে জলের ছলছল আওয়াজ এখন শান্ত। ভোরের হাওয়ায় চরে বেঁধেছে নৌকো। হাওয়ায় যখন নৌকো কাত হয় তখন কাঠে কাঠে মৃদু মট মট শব্দ। টুটুলের মাথার কাছেই এক বিঘত চৌকো ফোকর। সেখান দিয়ে এক ঝলক রোদ তার মুখে পড়ে। চরে দেড় মানুষ উঁচু ঠাসা আখবন। গোপীনাথ মাল্লারা নেমে গেছে সেই বনের ধার দিয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্যে। খড়ি দিয়ে দাঁত মাজছেন স্বর্ণসুন্দরী। সামনে বিরাট চর ধু-ধু করছে। আখের সবুজ আয়তক্ষেত্র বাদ দিলে সামনে বহুদূর ব্যাপ্ত বালিতে ভোরের সোনালী রং। স্বর্ণসুন্দরী দাঁত মেজে তোলা জলে কুলকুচো করেন নদীতে। পাটাতনের ওপর ডেক চেয়ারে ভবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে। স্বর্ণসুন্দরী মুখ মুছে পাশের মোড়াটায় বসে বলেন,—কি ভাবছো ?

—তোমায় বলি নি একটা কথা। কাল প্রতাপের চিঠি পেয়েছি। প্রথম চান্সে অবশ্য আই. সি. এস. পাশ করা খুব মুস্কিল।.....

—প্রতাপ পাশ করে নি? আরও তো দুটো চান্স পাবে।

—হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

আত্মক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘটি হাতে গোপীনাথ আসছে। কিছুক্ষণ পরই গোপীনাথ স্টোভ ধরায়। আর স্পিরিটের গন্ধে টুটুলের ঘুম ভাঙে। এই স্টোভের গন্ধের সঙ্গে বাইরে যাওয়া যেন জড়িয়ে আছে তার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চোঙা উঠে পড়ে ধড়মড় করে, তারপর ভোরের আলোয় রাঙা বিস্তীর্ণ চরের দিকে চেয়ে সে চিৎকার দেয়,—জাঁহাপনা, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। টুটুলের ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে,—চল চল, আমরা নামি।

চরে নেমে দুই ভাই ছোটে এত দূর পর্যন্ত, যে প্রায় দুটো কালো বিন্দুর মতো লাগে। সেই বিস্তীর্ণ বালির মাঝখানে আবার একটু জল চিকচিক করে। তার পাশে কতগুলো কাঠি, আখের শুকনো পাতা। মাথার ওপরে কালো, সাদা, পেটের কাছটায় খয়েরি দুটো লম্বাটে পাখি ক্রমাগত তাদের মাথার ওপর পাক খায় আর ডাকতে থাকে—'টি-টি-টি-টি-টি, টি টি টি।' একবার তারা মাথার পাশ দিয়ে গালের কাছ দিয়ে পাক খেয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে এক মুহূর্ত ভাবলে চোঙা, তার-পর টপ করে বালির ওপর পাতা আড়কাটির ঢাকনাটা সরিয়ে দেয়। সরিয়ে দিয়ে দুজনেই অবাক। পাঁচটা তু'তে নীল ছোট ডিম। এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে যে তাদের গা ঘোঁসা হয়ে সশব্দ পাখি দুটোর পাক-খাওয়া তাদের নজরে পড়ে না। খেয়াল হয় গোপীনাথের ডাকে,—চল চল, নৌকা ছাড়ছে।' ডিমগুলো নেওয়ার প্রস্তুতে গোপীনাথ বললে যে, ওগুলো সাপের ডিম, আস-ধার সময়ে একটা গোখরো দেখেছে, এবং চর ভর্তি সাপ।

হাঁসাড়ায় এক জমিদারবাড়িতে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ অঞ্চল বেশ বর্ধিষ্ণু, মধ্যবিত্তের বাস। নৌকো থেকেই খালের পাশ দিয়ে নারকেল সুপুরিতে ছাওয়া টিনের চাল, মাঝে মাঝে কোঠা-বাড়ী নজরে আসে। মেয়েরা বাসন মাজছে, ছেলেরা পুকুরের জলে দাপাদাপি করছে। অনেক বছর পর যখন টুটুলেরা কলকাতার পাকাপাকি বাসিন্দে, এবং জলের দেশ থেকে একেবারে নির্বাসিত, তখন বাংলা কবিতায় জল নদীর বর্ণনা পড়ামাত্রই তাদের এই জলপথে সফরের ছবিগুলো ভেসে উঠত মনে। যেমন সত্যেন দত্তের 'কার বহুড়ী বাসন মাজে' হাঁসাড়ার খালপাড়ে বাসনের পাঁজা নিয়ে ব্যস্ত লালপেড়ে শাড়ি-পরা, বউটার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এমন কি 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' আসলে সেই ভ্রমর যেটা ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে গলা-জলে তাদের চান করবার সময় পাড়ে শ্যাওলার ওপর একই জায়গায় ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছিল হেলিকপ্টারের মতো।

হাঁসাড়ায় দুপুরের খাওয়াটা এক ভয়াবহ ব্যাপার। এত বড় ভাজা গলদা চিংড়ির মুড়ো তারা কখনও দেখে নি। ভয়ে-ভয়ে একটু ফুটো করতেই গল-গল করে লাল ঘিলুতে থালার এক পাশ ভরে যায়। টুটুলে ভয়ে-ভয়ে খেতে পারে না। তাছাড়া সবই এত বড়-বড় যে ছেলেদের কাছে বড় অপরিচিত লাগে। এক জোড়া করে কই মাছ প্রায় থালা জুড়ে। ফেলেছেড়ে খেয়ে তারা কোন রকমে ওঠে। তবে মনে মনে মুগ্ধ স্বর্ণসুন্দরী। তিনি কাটা চিবোবার যম। এত রকমারি সুন্দর মাছ আগে কখনও খান নি।

খাওয়ার চেয়েও জমিদারবাড়ীর এক মেয়ে, বোধহয় নাতনীর সঙ্গে দুই ছেলের অসম্ভব ভাব হয়ে গেল। সারা দুপুর গাছে, খালের পাড়ে মেয়েটা বুড়ী, চোঙা আর টুটুলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। লাল ফ্রক পরা মেয়েটার ওপর প্রভুত্ব জেগে যায় চোঙার। বিকেলে নৌকো ছাড়বার আগে ঘাটের ধারে একটা ছাড় জোগাড় করে চোঙা।—তুই কাকে ভালবাসিস? আমি, টুটুল, না বুড়ী? ছড়ি হাতে চোঙা জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটার মুখটা ছুঁচলো, কটাশে রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। ছোট-ছোট চোখ দুটিমিতে চকচক করে। বোধহয় চোঙারই বয়েস, বললে,—বাঃ, আমি তো বুড়ীদিকে...

—হাত পাত, হাত পাত। মেয়েটা বোকার মতো হাত পাততেই সপাং করে ছাঁড় বসিয়ে দেয় চোঙা। মেয়েটার চোখে জল আসে।—আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি, বলতে-বলতে গলায় টলমল কান্না

নিয়ে সে বাড়ীর দিকে দৌড়য়। বুড়ীও চেঁচিয়ে উঠল,—আমিও মা-কে বলে দিচ্ছি। বলে সেও মেয়েটিকে অনুসরণ করে।

বিদায়ের সময় যখন জমিদারমশাইয়ের ছেলে বউ মেয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘাটে আসেন তখন সব মিটমাট। চোঙা গলা নীচু করে জলের দিকে চেয়ে বলল—আমাকে কেউ না ভালবাসলে আমার বয়ে গেল। মেয়েটিও তেমনি খাটো গলায় বললে,—দূর, আমি তখন মিছিমিছি বলেছিলাম। ছইয়ের ওপর উঠে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ায়, খালের বাঁক পর্যন্ত লাল ফ্রকপরা মেয়েটাকে দেখা যায় হাত নাড়াতে।

পর দিন দুপুরে মাঁরকাদিম। সেঁদিন হাট। দূর থেকে চাপা গুঞ্জন ভেসে আসে। কাছে আসতেই কলা আর গুড়ের গন্ধে বাতাস ভারী লাগে। অন্তত পাঁচ-ছশো নৌকো গঞ্জের পাড়ে বাঁধা। ঢুকতেই জলের ওপরে মাচার মতো লম্বা পাটাতন। নীল উর্দি-পরা সামেদ হাঁকে—খবরদার, খবরদার, পাশের নৌকো সরে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নৌকোয় বসে-বসেই বিশাল এক গুড়ের নাগরী আর প্রকাণ্ড এক কাঁদি পাকা কলা কিনলেন। সামেদের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা গঞ্জে নামে। প্রচুর কাপড়ের দোকান, নারকেলের আড়ত, পাকা, আধ-পাকা কলার পাহাড়, কাঁচের চুড়ি, কেরাসিন, চাল-ডাল। অনেক খুঁজে-খুঁজে দরদাম করে দুটো রবারের বল, আর বুড়ীর জন্যে লাল ফুল তোলা মাথার ক্লিপ আর রিবন কিনলে সামেদ।

পরদিন ভাগ্যকুল। পদ্মার পাড়ে তাদের বজরা এসে লাগে সকালে। এখানে নদী খুব চওড়া, ওপার দেখা যায় না। ছেলে-মেয়েরা সাঁতার শিখেছে ভালই। কিন্তু জলের অসম্ভব টান। দুটো বজরা তেরছা করে লাগিয়ে মাঝখানে ছেলেমেয়েরা চানে নামে, টুটুল কোরা একখানা ধুতি পরে জলে নেমেছিল। তারপর স্রোতের টানে তা পায়ে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া পদ্মায় নেমেছি এই বোধটাই এমন অভাবনীয় লাগছিল তার কাছে যে, পা জড়িয়ে যাবার পরই সে এত বেশী হাত-পা ছোঁড়ে যে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। কিছু বুঝবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যায়। চোঙার চিৎকারে ওপর থেকে ঝাঁকে পড়ে। তারপর পাগড়ি ফেলে দিয়ে উর্দি-পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নদীর স্রোতে তখন দুই বজরার মুখে যে তিন-চার হাত ফাঁক দিয়ে টুটুল জল খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। উর্দি-পরা সামেদ জলে পড়েই এক খাবলায় টুটুলকে ধরে ভেতরের দিকে ঠেলে দয়। তারপর মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নৌকোর ভেতরে ঘেরা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দম নেয়। ইতিমধ্যে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ভবনাথও জলে নেমে পড়ে-ছিলেন। স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—সামেদ ছিল বলে, ছেলেটা বেঁচে গেল। সামেদ আস্তে-আস্তে জল ছেড়ে নৌকোয় উঠল। খালি মাথায় তার ছোট খুলির ওপর লেপ্টে-থাকা চুলে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সামেদ আস্তে-আস্তে বললে,—সব আল্লার দয়া মা, আমরা কে?

দুপুরে ভারে ভারে খাবার আসে। তিনটে না চারটে থালায় প্রায় দশজনের মতো খাবার আনে। আবার সেই পেল্লাই গলদা চিংড়ির মুড়ো, ফুটো করতেই গলগল করে রক্তের মতো ঘিলু, সম্মানিত অতিথিদের জন্যে ছাগলের মাথার মুড়ো, ইলিশ, রুই, রকমারী সন্দেশ, রাজভোগ, দই। এত খাওয়া দেখলেই ছেলে-মেয়েদের আঁক্ষদে বেড়ে যায়। সবচেয়ে তাদের ভাল লাগল আলুবখরার চাটনি। ভব-নাথ ও স্বর্ণসুন্দরীও খাওয়ার ব্যাপারে খুব দড় নয়। তবে গোপীনাথ, সামেদ আর তিন মাঝিমাল্লা খুব উৎসব করে খাওয়া-দাওয়া করলে।

সকালবেলার দুর্ঘটনার রেশ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সন্ধেবেলা জমিদার বাড়ি নেমন্তন্ন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলো দালান, ইলেক্ট্রিক আলো। প্রায় শখানেক লোকের সঙ্গে খাওয়া শেষ হতে রাত প্রায় দশটা। ছেলেরা তাদের বজরায় ফেরবার মতলব করছিল, কিন্তু শোনা গেল গানের জলসার আয়োজন হয়েছে। জলসা মানে কলকাতা থেকে দুটি মহিলা প্রথমে ঠুংরি গাইলেন, তারপর খেমটা নাচলেন। শেষের দিকে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড তবলায় চাঁটি সত্ত্বেও। ফর্সা চোখ কুতকুতে আটসাট করে হলদে জর্জেটপরা ঢ্যাঙা মহিলাটি ভবনাথদের সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, দ্বিতীয়টির পরনেও জরির বুটকি তোলা চকোলেট জর্জেট, কাজল দেওয়া তার ঢল-ঢল চোখ দুটি ছেলেদের মন্দ লাগে না। তিনি মাথায় মদের গেলাস রেখে নাচলেন, চারদিকে চটা-

পট হাততালি পড়ল। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে টুটুল চোঙাও হাততালিতে যোগ দিল। এরপর আবার দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলো। সঙ্গে ক্লারিওনেট ও তবলা। চিকের অন্তরালে মহিলা-বর্গের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ও বুড়ীকেও দেখা যাচ্ছিল। তাঁরই নির্দেশে দুই পাইক ঘুমন্ত দুই ছেলেকে বজরায় তুলে দিল। পরদিনও প্রায় একই প্রোগ্রাম। টুটুল তোলা জলে স্নান করলে। ভবনাথ সাঁতরালেন পদ্মায়, পেছনে সামেদ। ভবনাথের সাঁতার দেখে ছেলেরা অবাক হল। বাবা কাছারি যায়, বৈঠকখানায় টেবিল ল্যাম্প জেলে রায় লেখে, ভোরে চাতালে পায়চারি করে, বিকেলে কপির ক্ষেতে মালিকে নির্দেশ দেয়।—বাবা আবার সাঁতরায় রে! চোঙার গলায় প্রবল বিস্ময়!

সন্ধেবেলা নৌকো ছাড়ে। চাঁদ ওঠে। চাঁদনি রাতে ছইয়ের ওপর সামেদের কোল ঘেঁষে বসে ছেলেরা। আলো ফেলতে ফেলতে স্টিমার চলে যায়। বজরা দুলতে থাকে মাঝনদীতে। আর এমন হু হু করে মুখে কানে হাওয়া দেয় যে, ছই থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ভবনাথ হাঁক দেন,—ওপর থেকে নেমে এসো, তোমরা। স্বর্ণসুন্দরী অনেকগুলো দেবতার নাম করে যান,—বাবা বদ্যিনাথ, বিশ্বনাথ, মা কালী, মা জগদ্ধাত্রী।

সামেদ ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনে ছই থেকে। সামনে হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া বিশাল রুপোলী পদ্মার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে, সব খোদার ইচ্ছে আমরা কে?

তিন

গরমের ছুটির বিকেল। এতক্ষণ বাড়ির সামনেই পুকুরটা ঝলকাচ্ছিল রোদ্দুরে। কিন্তু জেলখানার দিকটা বেশ ঠান্ডা, ছায়ায় ঢাকা। পুকুর পাড়ে ঝাঁকড়া বটের ছায়া সেপাইদের কোয়ার্টারের মাথাগুলো ঢেকে রেখেছে পশ্চিমের রোদ থেকে। পাঁড়ে পুকুরে ঘটি মেজে খড়ম পায়ে খট খট করে আসছে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাঙা বেসুরো গলায় গান করে,—ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি মায়া! কহি মুম হ্যায় কহি ছায়া।

পাঁড়ে সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরেছে। দু মাস ছিল ছাপরার গ্রামে। এক বিঘে মতো জল শুদ্ধ আমের বাগান কিনেছে। তার গল্প করে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে ছেলেদের সঙ্গে,—যব ফুল আসে আমের পেড়ের পর তব কত প'খ আসে। জলে নামে জলে ওঠে, ফিন্ উড়ে যায়। হামি আর ভাই ঝোপড়ি বেঁধে পাহারা দিই। সারা রাত কি বাস। ফুল কি বাস ফল কি বাস। হাম সমঝে কি বৈকুণ্ঠ মে হ্যায়। বলবার সময়ে পাঁচশো ডন পাঁচশো বৈঠক দেওয়া শরীরখানার ওপর ছোট মুখখানায় এক বেমানান স্নিগ্ধতা নামে।

তারা জেলের গেটের দিকে এগোতেই পাঁড়ে তাদের সাবধান করে দেয়, তারা যেন এখনা জেলখানার ভেতরে না যায়। গত রাত্তিরে একদল 'ভারি বড়া ডাকু' এ জেলে স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকা থেকে। সে জন্যই এই সাবধানবাণী।

টুটুল আর চোঙা বাড়ির দিকে না গিয়ে স্থানীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ান, ক্লাস সিক্সের ছাত্র গোপালের সঙ্গে লাট্টু খেলে। গোপাল ছবির মতো সাঁতরায়, এক ঘাট থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে আর এক ঘাটে ওঠে। তিনটে কাপ পেয়েছে সাঁতারে। তবে সম্প্রতি সে দু'ভাইকে দেহতাত্ত্বিক কিছু জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তাতে চোঙার উৎসাহ জোরাল। কিন্তু টুটুল ব্যাপারটা হদিস করতে পারে না। পুকুরপাড়ে বসে বসে গোপাল মানুষের জন্মরহস্য অঙ্গভঙ্গী সহযোগে বর্ণনা করে। টুটুলের কাছে গোপালের আলাপ একেবারেই দুর্বোধ্য লাগে আর চোঙা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। গোপাল শুধু চমৎকার সাঁতারই কাটে না, কি করে ছেলে জন্মায় সে খবরও রাখে। চোঙা উত্তেজনা বোধ করে। আগে সে যা যা শুনেছে সবই স্বর্ণসুন্দরীকে বলেছে, কিন্তু এবার তার ভয় হয়, তার মা এসব শুনলে ঝড় তুলবে। আর টুটুলের সঙ্গে আলাপ করলে মন একটু হাল্কা হয়, 'কিন্তু ও একটা গবেট' এই চিন্তা করে সে বাড়ির দিকে এগোয়।

মাঝপথে জেল গেট। গেটের গরাদ ধরে তাদের কে ডাকল,—খোকা শোনো।

টুটুল চমকে তাকায়। ধুতির ওপর সাদাকালো ডোরাকাটা ফুলহাতা শার্ট পরা এক যুবক।

কালো চশমার ভেতর থেকে কোমল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে।

টুটুল এগিয়ে যায় গেটের দিকে।—এস. ডি. ও. সাহেব তোমাদের বাবা? যুবকটি জিজ্ঞেস করে।

টুটুল কিছু বলবার আগেই তার পেছনে চোঙা কটাস করে চিমটি কাটল। টুটুল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোঙা পেছন থেকে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ডাকে,—আয় না।

গেট থেকে সরে আসতেই চোঙা ফিসফিস করে বললে,—ওরা ডাকাত। বাবাকে মেরে ফেলতে চায়।

—কিন্তু

—কিন্তু কি? ওরা বোমা মারে, পিস্তল মারে। ওরা সব করতে পারে।

টুটুলের এতক্ষণে খেয়াল হয় পাঁড়ের সাবধানবাণী। কিন্তু লোকটাকে দেখে মোটেই তো ডাকাত বলে মনে হয় না। প্রতাপের মতো ফর্সা নয়, কিন্তু হাসিতে ভরা মুখখানা, বিশেষ করে ঠোঁটের ভাঁজ আর থুতনি অনেকটা বড়দার মতো। এদের সঙ্গে বোমা-পিস্তল নিয়ে ডাকাতির সম্পর্ক বড্ড খাপছাড়া লাগে তার কাছে।

ফুটবল খেলে সন্ধের পর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায়। সাত হাত অন্তর অন্তর সমস্ত চাতাল জুড়ে সশস্ত্র শান্ত্রী। বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সন্ধের পর সহরে এসেছে পুলিশ লঞ্চে। গত রাত্তিরে জেলখানার দেয়ালের ওপাশ থেকে আওয়াজ এসেছিল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী আজ রাতে সন্ত্রাসবাদীরা জেলখানা ও ইদ্রাকপুর কোর্ট আক্রমণ করবে। ভবনাথ বৈঠকখানায় পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কনফারেন্স করছেন। তাঁর নিজের আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় ছোকরা ডি-এস-পি এবং জেলা সদর কর্তৃপক্ষের চাপাচাপিতে সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছে।

টুটুল এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে ঘুমোতে যায়। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা সংগীন-আঁটা নিস্তব্ধ উত্তরভারতীয় শান্ত্রী না চশমার ভেতর থেকে হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ বাঙালী তরুণ—এ দুজনার কোনজন বন্ধু, কোনজন শত্রু তা তার কাছে ঘুলিয়ে যায়। লড়াই হলে এদের দুজনের মধ্যে কার জেতা উচিত সে সম্পর্কে সে মনস্থির করতে পারে না।

চোঙা বললে সে আজ রাত্তিরে ঘুমোবে না। রাত্তিরে লড়াই বাধবে। শান্ত্রীরা ওপর থেকে রাইফেল ছুঁড়বে। তুমুল একটা হট্টগোল বাধবে। বুড়ী বললে,—যাই বল ইংরেজের সঙ্গে কেউ পারবে না। চোঙা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। তার মতে রাত্তিরে কামান আসবে। কারণ কামান না হলে কখনও কেল্লা রক্ষা করা যায় না।

—তুই সবটাতে বাড়াবাড়ি করিস চোঙা। বুড়ী আপত্তি করলে।

—তুই কি জানিস রে? তুই তো মেয়ে। আমি সব শুনেছি। আজ রাত্তিরে কামান আসবে। বাবা কামান চালাবে।

টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীও স্তম্ভিত। ভবনাথের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ছেলেমেয়েরা সচেতন থাকলেও তাঁকে গোলন্দাজ রূপে কল্পনায় হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে বুড়ী।—তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে চোঙা, সে চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

শেষ রাত্রে জানলা দিয়ে টুটুল অবাক হয়ে দেখলে ভোরের তারার নীচে খাড়া নিস্পন্দ ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রহরী। শিশিরে সংগীনগুলো আরও চকচক করে।

সে বছর বর্ষা শেষ না হতে হতেই তেড়ে শীত পড়ল। দুটো সবুজ আলোয়ান কিনে দিলেন দুই ছেলের জন্যে স্বর্ণসুন্দরী। তারা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে মধুবাবুর সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চাণক্য শ্লোক আওড়ায়:

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥

অঙ্ক হোক, ইংরেজী হোক, চাণক্য শ্লোক একবার আওড়াতে হবেই। একদিকে সংস্কৃত শ্লোক আর ইংরেজী ব্যাকরণ অন্যদিকে অঙ্ক—এর মাঝখান দিয়ে মধুবাবু প্রতি সন্ধেবেলা তাঁর নৌকো বেয়ে চলেন। নৌকোর আরোহীরা এবং তাঁদের অভিভাবকও নিশ্চিন্ত।

বড়দিনের ছুটি এগিয়ে আসছে। ম্যাপে কক্সবাজার দেখানোতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়া ছাড়া টুটুলের সব পরীক্ষাই ভাল হয়েছে। চোঙা অংকতে ফুলমার্কস, তবে ইতিহাস ভূগোলে ধেড়িয়েছে। বুড়ীর যে এবার কি হল, বোঝা গেল না, কোনরকমে হেঁচড়ে মেচড়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু শৈশবে বিষাদ তালপাতার ছায়া। কয়েকদিন যেতে না যেতেই রৌদ্রঝলকিত কৈশোরের আনন্দে ঝলমল করে বুড়ী। গত কয়েক মাসে অনেকটা লম্বা হয়েছে সে। কাঁধও চওড়া হচ্ছে। গাল ভাঙছে। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে লম্বা শ্যামলা মেয়েটা দিন-রাত্তির এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বড়দিনের ছুটির আগে বাদলা দিচ্ছিল। চারদিকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল ঠাণ্ডায়। তারপর আবার মিঠে রোদ্দুরে ভরে যায়। এদিকে সচরাচর দুষ্প্রাপ্য একটা কমলা লেবু বুড়ী আর টুটুল দুই ভাইবোনে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল আর গোপীনাথ কাঠ চিড়ছিল কুড়োল দিয়ে। জেলখানার পাশে দুটো মোটা আমের ডাল ঝড়ে পড়েছিল। সে দুটো শুকিয়ে নিয়ে চেলা করা হচ্ছে।

এমন সময় উত্তেজিত চোঙার আবির্ভাব।—দেখে যা দেখে যা, কত জিনিস আসছে।

তিনজনেই দৌড়ে আসে। প্রায় জনা পনেরো লোক ভারে ভারে রকমারি খাবার আনছে।

চোঙা উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে থাকে,—ভীম নাগ, ভীম নাগ, আমি খেয়েছি কলকাতায়।

সামনের থালায় ভীম নাগের সন্দেশ। সন্দেশের বাকসগুলো একটা পিরামিডের মতো উঁচু করে সাজানো, পরের থালাটা ভর্তি আপেল,, দুটো বিশাল বড়দিনের কেক—জরিতে মোড়া চিত্র-বিচিত্র করা, এক পরাত ভর্তি মোটা মোটা কালো আঙুর আর পিন খেজুরের মোড়ক। থরে থরে দইয়ের ভাঁড় সাজানো দুটো থালা, এক থালা ভর্তি কিসমিস বাদাম, প্যাস্ট্রি, শেষে পেল্লাই পাকা মর্তমান কলা।

স্বর্ণসুন্দরী প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু খাবারের এই অতুলনীয় বৈভবে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। রাজকীয় গাম্ভীর্যে হাঁক দেন,—গোপীনাথ। গোপীনাথও বোঝে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি হাঁটুর নীচে কাপড় নামিয়ে, বারান্দার কোনায় টাঙানো সাদা ফতুয়াটা চাপিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পথ দেখিয়ে ভারীদের ভাঁড়ারঘরের দিকে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে ভাঁড়ারঘর ভরে ওঠে। ফলের মিষ্টির গন্ধে ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা আরও বাড়ে।

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সামেদের আবির্ভাব। হাতে ভবনাথের চিরকুট। তাড়াতাড়িতে ভবনাথের বাংলা হরফগুলো তাদের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রাকার হারিয়ে ফেলেছে। ভবনাথ লিখেছেন : দুই ভাই দুই বড় জমিদার। চরের জমি নিয়ে দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়ছে। আমার কোর্টে মামলা। শুনলাম ঘাটে নৌকো ভিড়েছে উপহার আসছে আমাদের বাড়ি। পত্রপাঠ সব বিদায় দেবে।

স্বর্ণসুন্দরী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন, সংগে সংগে আতংকিতভাবে লক্ষ্য করলেন পেছনে দাসী পরিবৃতা দুই মাঝ বয়সী মহিলা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন। কাছে আসতে চেহারাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। জমিদারবাড়ির বউ এক নজরে বলে দেওয়া যায়। নাকে হীরের ফুল, পরনে চাওড়া কালো-পেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি, আলতাপরা খালি পা, পেছনে দুই দাসীর হাতে দুজোড়া চটি, সিঁড়ির মাঝখান থেকেই সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে দুই বৌ।

সন্দেশ আর আপেলের থালার পাশে পাক খাওয়া ছেলেমেয়েগুলোর মুখ এক মুহূর্তে ভেসে ওঠার সংগে সংগেই প্রায় এক শারীরিক ব্যথা নড়ে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর বুকের মধ্যে। তারচেয়েও মুস্কিল সামনেই উদিত দুখানি হাসিভরা মুখ। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করেন। স্বামীকে চেনেন স্বর্ণসুন্দরী। অনেক ব্যাপারে ভবনাথ খুব গেঁতো, কিন্তু নীতিগত কোন কোন ব্যাপারে তাঁর বাবার চেয়েও ভবনাথ কড়া। ভবনাথের চিঠিও এই জাতের কড়া হুকুম। গেটের থামের পাশে সরে গিয়ে বললেন,—সামেদ, পেছনের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে সব খাবার ওদের লোকজনদের দিয়ে নৌকোয় তুলে দাও। কোন চেঁচামেচি হবে না। গোপীনাথ লুচি ভাজো।

তারপর সামনে এসে ছোট্ট করে নমস্কার করলেন।

ছেলেমেয়েদের কাছে সমস্ত ঘটনাটাই ভেল্কির মতো লাগে। কেনই বা ভাঁড়ারঘর ভর্তি করে

রকমারি খাবার উঠল আবার কেনই বা সামেদের আদেশে বিস্মিত ভারীরা প্রথমে একটু ওজর-আপত্তি করে শেষে নিমরাজি হয়ে পেছনের ছোট নোংরা সিঁড়ি দিয়ে খাবারের থালাগুলো নিয়ে যাচ্ছে তার হদিস করতে পারে না তারা। চোঙা তো মরিয়া হয়ে একটা সন্দেশের বাক্স তুলে নিল। কিন্তু বুড়ী সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার রেখে দেয়, শেষ পর্যন্ত একছড়া কালো আঙুর তুলে নেয় চোঙা। টুটুল দুটো প্যাসট্রি সরাল।

ইতিমধ্যে গোপীনাথ লুচি আলু ভাজছে। চায়ের সংগে সংগে লুচি খেতে খেতে জমিদার বাড়ির বড় আর ছোট বস্ত গল্প করতে থাকেন। কলকাতায় গিয়ে তাঁরা "চন্ডীদাস" ও "ভাগ্য চক্র" বলে দুখানা বাংলা ফিলম্ দেখেছেন।—বিশেষ করে উমাশশীর যা পার্ট, বুঝলেন মাসীমা। ছোট বউয়ের কাননবালা পছন্দ। শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" বইতে পার্বতীর পার্ট—অমন হয় না। স্বর্ণসুন্দরী 'চন্ডীদাস' ছাড়া কোনটাই দেখেন নি। তবে উৎসাহের সংগে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বুকটা যে দুরদুর করে না একেবারে তা নয়। ঘরের কোনের জানলাটা দিয়ে তিনি যে দিকটায় বসেছিলেন সেখান থেকে নীল উর্দিপরা সামেদের চেহারা আর মাঝে মাঝে কেকের কিংবা দইয়ের পরাত ভেসে ওঠে। উমাশশী যাতে কেলেংকারী আটকাতে পারে এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলা চিত্রজগতের নায়িকাদের চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

লুচি আলুভাজা চা খেয়ে বড় বৌ ছোট বউ উঠলেন। সামনের পুজোয় আসতে বললেন তাঁদের বাড়ি। বাড়ির সামনের মাঠে মস্ত মেলা বসে, চমৎকার পুতুল খেলার দল আসে, ছোট সার্কাসেরও তাঁবু পড়ে। টুটুলের গাল টিপে আদর করে ছোট বউ বললেন,—ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবেন কিন্তু। খুব মজা পাবে।

স্বর্ণসুন্দরী সামেদের সংগে ছেলেমেয়েদের পাঠালেন অতিথিদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। দুভাই একটা ভাল কাজ পেয়েছে ভেবে সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলল। খালি বুড়ী মুখ ভার করে সংগে সংগে যাচ্ছিল। তার মায়ের উদ্বিগ্নতার কারণ সঠিক বুঝতে না পারলেও কিছু অঘটন ঘটেছে এরকম ব্যাপার সে আঁচ করতে পারে। আর ঘটলও প্রায় সংগে সংগে। ঘাটে একখানা গ্রীণবোট। পেছনে আর একটা নৌকো। বুড়ী লক্ষ করলে দুজন ভারী এগিয়ে এসে বড় বৌকে কি যেন বললে। সংগে সংগে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। বড় বৌ ফুঁসে উঠলেন বুড়ীর দিকে চেয়ে,—কি! আমাদের এরকম আপমান! আমরা নিজেরা এলাম বাড়িতে! ছোট বউও চীৎকার করতে থাকেন,—অসভ্য, ইতর! ইত্যাদি কথাগুলো কানে যেতে বুড়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে। প্রায় কেঁদে ফেলে বুড়ী। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে,—আমি কি জানি!

বড় বউ বোটে উঠতে উঠতে বললেন,—তোমার মা-কে বলে দিও, আমরা অনেক হাকিম দেখেছি। কেউ আমাদের এমন অপমান করে নি।

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। এতগুলো জিহ্বাআকর্ষক খাবার বরবাদ যাওয়ায় তারও অন্তরের সায় ছিল না। প্রায় কেঁদেই ফেলে বুড়ী,—আমাকে বকবেন না।

চোঙা চেঁচিয়ে বলে,—আমরা কি জানি? আমরা কি জানি?

টিংটিং-এ দাদাবাবুর রণমূর্তি দেখে সামেদও এগিয়ে আসে।—না, তোমাদের আমরা কিছু বলছি না, বলে ছোট বউ নৌকোয় উঠলেন, বাটা থেকে বার করা পান তখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে।

চার

নীচু কামিনী গাছটায় দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছিল বুড়ী বাড়ির নীচেই। হঠাৎ এক সাহেব আসছে দেখে দোল খাওয়া বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবলে পালিয়ে যাবে জেলখানার দিকে কিন্তু এত কাছে সাহেবটা এসে গেছে যে পালানো বিসদৃশ। বাদামি রংয়ের সুট আর চকোলেট ফেলটের টুপি পরা সাহেবটি বুড়ীর কাছে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে —চল, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল।

স্বর্ণসুন্দরী আগেই খবর পেয়েছিলেন কিন্তু এরকম না জানিয়ে নব-র সহসা আবির্ভাবে তিনি একেবারে আনন্দে খই পান না কি করবেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হাঁকডাকে বাড়ি গরম। নব যে তার যৌবনের আটদশটা বছর দায়হীন আরামের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে এসেছে সেদিকে তাঁর স্বামীর মতো দৃষ্টি দিলেন না স্বর্ণসুন্দরী। নব-র সাহেবের মতো চেহারা, তার উচ্চকণ্ঠ হাসি, কোটের ভাঁজে বিলিতি সেন্টের গন্ধ, অসংখ্য বিলেতের গল্প—আমরা কতদিন বাটারে প্রন্ ফ্রাই করে খেতাম দিদি। যোগেন চাটুজ্জের ছেলে রামু, সে বেটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিত। বেটা তোর বাপ ছিল তো ইস্কুল মাস্টার! ইত্যাদি নানা ধরনের গল্পগুজবে কথাবার্তায় স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধ। এই ভাইকেই তিনি আরায় বটল পামের ছায়ায় ঢাকা মোরামের রাস্তায় পিঠে ফেলে ফেলে ঘুম পাড়িয়েছেন ভেবে গর্বিত বোধ করেন।

যে দুদিন নব ছিল সে দুদিন ছেলেরা চাতালে চান করত কারণ প্রায় দু ঘণ্টা স্নানের পর্ব চলত। স্নান শেষ হবার পর অবশ্য স্নানঘরে ঢুকতে ছেলেদের খুব ভাল লাগত। বিলিতি ওডিকোলনের গন্ধে ভুরভুর করত চারদিক। ভবনাথ বিকেলবেলায় শ্যালককে ধুতি-পরা শেখাতে গলদঘর্ম।—দাদাবাবু, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ এ ধোতি, আই ওয়াণ্ডার! ঘন ঘন নব বলল। শেষে আপোষ স্থির হল। দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো ধুতি পরলে নব।

ছেলেদের একটা নতুন কাজ গজাল। দুপুরবেলা সাহেব মামা-র গা টেপা, ঘণ্টায় এক আনা। এ ব্যাপারে চোঙার উৎসাহই বেশী। দুদিনে চার আনা কামালে। টুটুলের বিশেষ গছন্দ নয় একেবারে অপরিচিত ঠ্যাং মেলে দেওয়া মানুষটার গায়ে পায়ে হাত বুলানো। অবশ্য স্বর্ণসুন্দরীর দিবানিদ্রার সময় আগে মাঝে মাঝে তাঁর গায়ে পাউডার বেশ উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়েছে টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ছেলেরা কিরকম চলে ফেরে, তাদের ভদ্রতা আয়ত্ত করার রিহার্সালও চলে।

—এ একটা আপদ জুটল কোথা থেকে রে? টুটুল বুড়োকে ফিস ফিস করে বলে।

স্বর্ণসুন্দরীর এনার্জির ব্যাটারী প্রায় ডাউন মেরে গিয়েছিল। কোন ব্যাপারে উদ্দীপনা উত্তেজনায় নিজেকে ছুঁড়ে না দিলে তাঁর নিজের কাছে জীবনটা শুকিয়ে ওঠে। আগে জামাই ছিল, খানিকটা ছিল প্রতাপ, সকলের ওপরে ছিলেন তাঁর বাবা এই গমগমে সরগরম করা জীবনের প্রতীক। ভবনাথ তাঁর এ চাহিদা মেটাতে পারেন না। তিনি কতগুলো ব্যাপারে, বিশেষ করে নীতির ক্ষেত্রে অভ্রান্ত।

নব যখন তাই পিতৃস্মরণে রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে কেঁদে ফেললে তখন স্বর্ণসুন্দরীও অভিভূত না হয়ে পারেন না। চোখ মুখ লাল করে নব বললে,—তোমরা তো ভাব আমি হার্টলেস্। দাদাবাবুও নিশ্চয় আমাকে তাই ভাবেন। কিন্তু তোমরা তো জান না হোয়াট এমাউন্ট অফ্ মিজারি আই সাফার্ড। আবার প্রবল বিক্রমে নাক ঝাড়তে থাকে নব।

টুটুল দাদাকে ফিস ফিস করে বললে,—সাহেবরা এরকমভাবে কাঁদে না রে?

—আমাকে তোর কিছু বলতে হবে না নব। আমার কাছে তুই যেরকম ছিলি তেমনিই আছিস। স্বর্ণসুন্দরীও কাঁদতে থাকেন।

—মধুবাবু এসেছিলেন? চোঙার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।

—মধুবাবুর মা মারা গেছেন, বুড়ী বললে।

ও, তোমরা তাহলে নিজেরা পড়তে বোস।

উত্তেজনা যেমন সহজে আসে, কান্নাও তেমনি সহজে আসে স্বর্ণসুন্দরীর। ভালবাসা মানেই উত্তাপ, চোঁচামেচি কান্না; হৈহৈশূন্যে ভালবাসার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অতত বিষাদে ভরা গরুর মতো বড় বড় চোখ মেলে থাকা ভবনাথের যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ তা থেকে এ ভালবাসার জাত আলাদা। ভবনাথ কণ্ঠ পান কিন্তু কণ্ঠের প্রকাশ নেই, আনন্দিত হলে উছলে ওঠেন না কখনও। এ জন্যেই বোধ হয় কোনো কোনো মহলে রাশভারি আখ্যা পেয়েছেন তিনি।

বাইরে চাতালে চেয়ার পাতা, মাথার ওপর ঘন নীল মখমলে অজস্র ঝলকানো হীরকখণ্ড। সে দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ সামনের টুর প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেন মনে মনে। স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ ভাইয়ের হাত ধরে বললেন,—সবই তো হোল নব। আবার শুনছি বিলেত যাবি, আবার

কেন? অতো বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি। সবই তো তোর। এবারে একটা...

নব কথাটা লুফে নিলে,—কিসের জন্যে এলাম বড়দি তোমার কাছে? সেই কথাটাই তো বলতে! বিয়ে ঠিকঠাক করেই এসেছি।

উদ্বেগে গলা আটকে যায় স্বর্ণসুন্দরীর,—মানে, আমাদের...

—হ্যাঁ হ্যাঁ বড়দি। আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? তাছাড়া অনেক ঘাটাঘাটি তো করলাম। ওরা অন্যরকম, আমরা অন্যরকম। মানে আমি চাই আপ-টু-ডেট মেয়ে—ঐ তোমাদের চচ্চড়ি পড়পড়ি রাঁধলেই চলবে না। কিন্তু তার সোল-টা হবে ইণ্ডিয়ান।

—ঠিক বলেছিস নব, ঠিক বলেছিস। ঠিক বোস বাড়ির ছেলের মতো কথা।

—গোপীনাথ, বড়ির টিনটা চাতালে পড়ে আছে, ভেতরে নিয়ে যাও, ভবনাথ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বললেন।

—হাইকোর্টের জজের একমাত্র মেয়ে। বেশ আপ-টু-ডেট, ঘরোয়াও আছে।

—দেনাপাওনার কথা কিছু?

—তুমি বড়দি সেই রকমই আছো। ওসব যৌতুক-ফৌতুক নেওয়া আজকাল উঠে গেছে। আর আমিই বা কি তাতে রাজী হব? তবে...

—তবে কি?

—আমি ওসব জানি না বড়দি। তবে মা বলছিলেন, বাবা নেই, বিয়ের খরচা বাবদ হাজার ছ-সাতেক টাকা...

—কি এমন অন্যায় বলেছেন?

—আমি ও সবের মধ্যে নেই বড়দি।

—তারিখ ঠিক হয়েছে?

—সাতই অঘ্রান। দাদাবাবু আপনাকে কিন্তু ছুটি নিতে হবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবেন, সেই জন্যেই তো এলাম।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভবনাথ এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কালপুরুষের দিকে। কোমরে বেল্টপরা যোদ্ধা আশ্চর্য রকমক করছে আজ রাতে। সম্প্রতি ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেছেন বৃহস্পতি তাঁর তুঙ্গে। এ বছরটা বরাবর ভাল সময়। অঘ্রানের আগে কিছু হবে না? বললেন,—নিশ্চয় যাব নব, এতদিন পর বিয়ে করবে, যাব না?

স্বামীর কথায় স্বর্ণসুন্দরী কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন। খেলোয়াড়ি চেহারায় মেদবৃদ্ধির আধিক্য এবং ঘনায়মান টাক সত্ত্বেও নব হাবেভাবে যথেষ্ট তরুণ। বললেন,—আমাদের সময় কি আর আছে এখন? তাছাড়া, পুরুষমানুষের আবার বয়স কি?

—প্রতাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হয়?

ভবনাথের প্রশ্নে নব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। গাঢ় চকোলেটের ওপর মোটা সোনালী ডোরাকাটা ট্রেসিং গাউনে দড়ির ঝুন্টি শূন্যে নাচাতে থাকে।

—কি, দেখা হয় না?

—নাঃ! দড়ির ঝুন্টি নাচানো আরও বেড়ে যায় নবর।

ভবনাথ বললেন,—সে কি! একই জায়গায় থাকো! তার গলায় চাপা উদ্বেগ।

—আচ্ছা দাদাবাবু, প্রতাপ কি রাজনীতি-টাজনীতি করত?

—কেন? কি হয়েছে? এমন কাতর বিস্ময়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন যে নব প্রায় অপ্রস্তুত।

—না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু হয়নি। হি ইজ এ সেনসিবল বয়। কিন্তু হি ইজ ইন্ ব্যাড কম্পানি, আই মাস্ট সে।

খুব ঘটা করে নব বললে, গম্ভীরভাবে। এতক্ষণ তাদের আলাপে ভবনাথের ঔদাসিন্যের ভাল জবাব দিতে পেরেছে ভেবে চাপা আনন্দে মুখটা আরও লালচে ফর্সা দেখায়।

ভবনাথ দুতিনবার কেশে গলা সাফ করেন। কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে যান। স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—মেমসাহেবদের ফাঁদে পড়ে নি তো?

—বড়দি যে কি বলো। ওখানকার মেয়েরা তো...কি যে বলে...তোমাদের অসূর্যম্পশ্যা নয়। মেয়েরা সব জায়গায়, কলেজে বাড়িতে, রাস্তাঘাটে। ওদের সমাজটা অনেক জীবন্ত বড়দি।

একটু থেমে বলে,—ঐ যে রজনীপাম ডাট বলে একটা কমিউনিস্ট উঠেছে আজকাল, খুব ক্রেজ হয়েছে। ওর মিটিংএ প্রতাপকে দেখা গিয়েছিল! তাছাড়া ওর কথাবার্তাগুলো একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ফ্যামিলি ফিলিংগুলো ঠিক...

ভবনাথ গুম মেরে বসে থাকেন। বারো চোদ্দ বছর বিলেতে যৌবন উড়িয়ে যে ছোকরা পারিবারিক কর্তব্য করে এসেছে তার মুখে পরিবারপ্রীতির কথা শোভা পায় না। অনেক সময়ই হয়ে থাকে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে অমিল। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু প্রতাপ বিলেতে গিয়ে একেবারে বিপথে চলে যাবে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পা দিয়ে মাড়িয়ে একথাটা ভেবে ভবনাথ বিচলিত হন। অন্ধকারে আবার জ্বলজ্বলে কালপুরুষের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর বাবার কথাটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, 'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সাভিচিউড অ্যাণ্ড কেনট্ বি এনিবডিজ এমবিশান।' প্রতাপ কি তাই ভাবছে? তাহলে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে ব্যারিস্টারি পড়ুক, চার্টার এাকাউন্টেণ্ট হোক। কিন্তু যে কথা নব বলেছে সে তো আত্ম-হত্যার সামিল। সে পথে প্রতাপ পা বাড়াবে কেন?

পরের দিনই তেড়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন ভবনাথ।

তারপর সকাল-বিকেল বিলেতের গল্প করে নব বিদায় নিল।

বিদায় নেবার মুখে সে একটা কাণ্ড ঘটালে যে কথা ছেলেমেয়েরা বহুদিন ভুলতে পারেনি। সকালে উঠে তারা তাদের বাবাকে চিনতে পারে না। তাঁর মুখে জাঁদরেল বাহারে গোঁফের চিহ্ন নেই। নব খুব ভোরে তার ছোট কাঁচি দিয়ে ক্যাচ করে গোঁফ উড়িয়ে দিয়েছে।

—বাবাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে রে! বুড়ী বললে।

—হ্যাঁ, কেমন বোকা বোকা। চোঙা ফোড়ন কাটে।

গরমের ছুটির সংগে সংগে সাঁতারের ধুম পড়ে। এ বছর হাত আর পায়ের কাজে বুড়ী আর টুটুল কিছুটা রপ্ত হয়েছে। চোঙার সংগে পাল্লা না দিলেও জলটানা আরও সাবলীল। টুটুল আবার ডুব সাঁতারও দিচ্ছে। আর চোঙা ছবির মতো সাঁতার কাটে। পাঁড়েকে আর জলে নামতে হয় না। একবার ঘটি মলতে মলতে অথবা দাঁতন করতে করতে ঘুরে যায়।

তবে প্রথম প্রেমের মতো জলের প্রথম আকর্ষণও কমে গেছে। এখন আর ভয়ডর নেই, ভাবনা নেই, কল্পনাও নেই। এখন অনেকটা রুটিন ব্যাপার। চোঙা পাঁচ-ছবার পারাপার করে, টুটুল বুড়ী তিনবার, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে। বুড়ী ফ্রকের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে ঘাটে বসে থাকে, কখনও কখনও জলে নিজের ছায়া দেখে। আর টুটুল ঘাট ধরে পায়ের কাজ করে, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জল ছিটোলে বুড়ী চেঁচায়।

ছেলেমেয়েদের কিছুদিন হল মন খারাপ। পাঁড়ে দেশে যাচ্ছে ছ মাসের জন্যে। তিনচার বছর ছুটি জমিয়েছে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেবে, চোঙার মতো বয়স। আর হয়ত দেখা নাও হতে পারে। চোঙা ঘাটে উঠে বললে,—কি হয়েছে পাঁড়ে যাচ্ছে? পাঁড়ে আমাদের আত্মীয়?

—আত্মীয়রাই সব সময় আপনার হয় না, টুটুল্ গা মুছতে মুছতে বলে।

—ঠিক বলেছিস টুটুল, বুড়ী সায় দেয়।

ক্রমে ক্রমে পাঁড়ের যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তার আগের দিন বিকেলে ঠিক হল, পাঁড়ের সংগে নৌকোয় ঘুরে আসবে। ছইতোলা ছোট নৌকো পাঁড়ে ঠিক করেছে, বোধহয় বিনে পয়সায়। পাঁড়ের সংগে যাবে বলে স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করলেন না।

সেদিন বোধহয় পুর্ণিমা। যখন নৌকো কাটাখালিতে পড়েছে তখন দূরে মেঠো রাস্তায় ধানক্ষেতের ওপরে জেগে থাকা কালভার্টের পেছনে থালার মতো গোল হলদু চাঁদ উঠছে। ফুর ফুর করে হাওয়া দেয়। বুড়ী গান ধরলে, নিজে নিজেই, 'আমার সোনার বালুচর, তোর কিনারে বেঁধেছিলেম আমার পাতার ঘর।'

ভাটিয়ালি সুরে বুড়ী গাইলে, নৌকো বেয়ে মাঝ দরিয়ায় গিয়াছিলাম ভেসে আমি সেই যে গেলাম আর না তারে দেখতে পেলাম এসে।

তখন চারদিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ায়, ঢেউয়ের ছলাং ছলাং শব্দে আর জলের ওপর কচি চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দুই ভাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পাঁড়ের বিশাল কাঁধের দিকে চেয়ে। দুজনের মনেই বিদ্যুতের মতো খেলে যায় তেলে ঘামে চকচকে পাঁড়ের ডন-দেওয়া বিশাল বুকের ওঠা পড়া, খড়মের শব্দে মুখরিত তুলসীদাসের কলি :

'ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি মায়া,
কহি ধুপ হ্যায় কহি ছায়া ॥

ফিরতি পথে অবশ্য এই চন্দ্রালোকিত ইন্দ্রজাল কেটে যায়। চোঙা সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা মোটর বোটের ছবি দেখেছে। স্টিমার আগে যায় না মোটর বোট আগে যায় এ নিয়ে দুইভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন বেশ সন্ধে।

পরদিন ভোরে এক কাণ্ড। টুটুলের চোঙা তখনও ঘুমোচ্ছে। বাথরুম থেকে বুড়ীর আতঙ্ক-তীক্ষ্ন গলা ভেসে আসে, —মা, মা.....দেখে যাও কি হয়েছে?

স্বর্ণসুন্দরী তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতেই বুড়ীর আবার সেইরকম গলা ভেসে আসে, —মা, আমার কি হবে? আমার টি-বি হয়েছে।

পাঁচ

সে বছর অঘান মাসের মাঝামাঝি মস্ত লনে ম্যারাপ বেঁধে এলগিন রোডে রাধা মিত্তিরের সংগে বিয়ে হল ভবনাথের শ্যালক নবেন্দু বোসের। সন্ধেটা ছেলেমেয়েদের মনে অনেক দিন পর্যন্ত গেঁথে ছিল। বিশেষ করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বরকে একদিনকার সুলতান বানাবার যে পদ্ধতি তা সবচেয়ে ভাল লাগল তাদের। লনের মাঝখানে দেবদারু পাতায় মোড়া কুঞ্জ, তার গায়ে থোকা থোকা লাল বালব জ্বলছে আর নিভছে। সামনেটা খোলা। সেখানে প্রায় সিংহাসনসদৃশ মেহ-গিনী রঙের বাহারে পুরু গদি আঁটা চেয়ারে ঘনায়মান টাকে হাত বুলোতে বুলোতে নবেন্দু বোস তরি দুই ভাগ্নের দিকে চেয়ে তাঁর বা চোখ মারলেন। আগে থেকেই ভাগ্নেদের সংগে কথা ছিল—যদি খুশি লাগে তাহলে বাঁ চোখ এবং নার্ভাস বোধ হলে ডান চোখ মারবেন।

—মামার খুব স্ফূর্তি লেগেছে রে, চোঙা চাপা উত্তেজনায় বললে।

তাছাড়া উৎসাহবোধ করবার আরও কারণ ছিল। মুন্সীগঞ্জের জলকাদা লণ্ঠন থেকে এই আলোয় ঝলমল চাঁদোয়ায় ঢাকা লন, পামের টবে টবে লাল নীল হলদু বালর, বৈদ্যুতিক আলো-খচিত বেলোয়ারি ঝাড়, আর লম্বা সার দেওয়া সাদা আলোর ডোম, হাতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা সমবয়সী ছেলেদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, গাড়ি থেকে নামার মুখে গালে গোলা রং বোলানো জড়োয়া হাঁরে পরা বকমকে বেনারসীর পুঁটলি, পোলাউ আর চিংড়িমাছের মালাই কারির গন্ধ—এই সমস্ত ব্যাপারটার মানে যে বিয়ে একথা ভেবে দুভাই-ই আনন্দে টগবগ করে। এতদিন পর্যন্ত বিয়ের কোন প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তাদের সামনে ছিল না। এখন এই আলো, চাঁদোয়া, শাড়ি গয়নার বর্ণাঢ্য, হাঁকডাক আর রকমারি খাবারের গন্ধে তা এক রূপ পায়।

তারপর সামেদের মতো সাদা পাগড়িপরা বেয়ারাগুলো হাতে ট্রে নিয়ে যখন কোল্ড ড্রিঙ্ক দেবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর কাঠি দিয়ে চুষে চুষে কনকনে ঠাণ্ডা সরবত খায় তখন তারা প্রায় স্বর্গে। চোঙা পরে জানালে সে তিনটে কাঠি হাতসাফাই করেছে। এইরকম আর এক স্বর্গ উপস্থিত থাওয়ার শেষে আইসক্রিম সন্দেশে। এরকম জিনিষ তারা জীবনে খায় নি। টুটুল-কে চাপা গলায় চোঙা ধমকায়।—ওরকম ইস্ ইস্ করিস নে। লোকে ভাববে গোঁয়ো। কোনদিন কিছু খায় নি।

অনেক রাতে তারা ফিরল। বোধহয় শেষ ব্যাচ তখন বসেছে। গরদের পাঞ্জাবিপরা টকটকে ফর্সা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তখনও চেঁচাচ্ছেন, পোলোয়া, পোলোয়া!

পানের পিকে টুটুলের পাঞ্জাবি রঞ্জিত।—টুটুল-টা একেবারে গে'য়ো। ট্যাকসিতে উঠতে উঠতে চোঙা বললে।

পরের দুদিনও স্বপ্নের মতো কাটল। তবে সাজগোজ যথেষ্ট হলেও ঠিক হাইকোর্টের জজ-বাড়ির মতো হয়নি অক্ষয় বোসের বাড়ি। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এখানেও বউয়ের জন্যে সিংহাসন। জ্বলছে নিভছে বালব, সানাই, ফিশফ্রাই মাংস দই। তবে কোল্ড ড্রিঙ্ক ছিল না, আর ওরকম খোলা বাগানও নেই। সব ছাতে ব্যবস্থা।

এখানেও সেই রংমাখা বেনারসীর পুঁটলি, বাড়ির সামনে গাড়ির সার। চোঙা তো উত্তেজিত হয়ে পরিবেশনের পার্টিতে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিল। তারপর ঠোঁটে চেটোল লিপস্টিকমাখা জ্বল-জ্বলে চোখ এক মহিলা ফাঁপানো চুলে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার ফিস ফ্রাই-এ অভিরুচি জানাতেই উত্তেজনায় ঠাকুরদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বিরাট ফ্রাইভর্তি থালা নিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে ধুতিতে পা জড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে যায় চোঙা। লুঙ্গিপরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মামার সহপাঠী ছিলেন ভাঁড়ারের ইনচার্জ। তিনি চট করে থালাটা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র আঙুলে টকাটক করে প্রায় সব কটা ফ্রাই তুলে নিলেন। অপরিচিত আড়ষ্ট ছেলেটির সামনে তর্জনী তুলে বললেন,—এক একটা ফ্রাই এক এক ফোঁটা রক্ত, জানোহে ছোকরা! যাও, তোমার আর পরিবেশন করতে হবে না।

চোঙা আশেপাশে চেয়ে দেখলে টুটুল কিংবা বুড়ী আছে কিনা। কিন্তু টুটুল পানের থালা নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আর বুড়ী ভেতরের ছোট উঠোনে, আলোকিত সিংহাসনে উপবিষ্টা মামীর সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলছে।

চোঙা এসে টুটুলের হাত থেকে পানের থালা টেনে নেয়। ফিস ফিস করে বলে,—মামা-বাড়িটা একেবারে বাজে। কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই।

সবচেয়ে টগবগ করেন স্বর্ণসুন্দরী। বোসবাড়ির ঐতিহ্য যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তাঁর ভাইয়ের এ বিয়ে মারফত। তাছাড়া রাধা মিত্তিরের বাপের বাড়ির গৌরবে যে এখন তাঁদের বাড়ির গৌরব আরও বাড়ল এ ভাবনায় তিনি অনেকখানি গুরুত্ব দেন। নব যে শেষ পর্যন্ত এক হেঁজি পেঁজি মেম নিয়ে আসে নি, সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে করে নিজের সম্ভ্রম বাড়িয়েছে এ জন্যে তিনি গর্ববোধ করেন। বস্তুত তাঁর স্বামীর দেশের বাড়ির পড়ন্ত গৌরবের পাশে তাঁদের পরিবারের মর্যাদা আরও উন্নত বোধ হয়। গৌরী ও প্রতাপকেও যদি দুতিন বছরের মধ্যে এরকম এক সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনে মূল কর্তব্যগুলো সম্পন্ন হয়েছে ভাবতে পারবেন।

গৌরী কদিন হল হস্টেল থেকে মামাবাড়িতেই আছে। তার চেহারা চমৎকার খুলেছে আজ-কাল। তাঁর এই ফর্সা লাফানো-ঝাঁপানো মেয়েটি বয়সের দাক্ষিণ্যে কিঞ্চিৎ মন্থর হয়েছে লক্ষ করলেন স্বর্ণসুন্দরী। বেগনি হাতকাটা জর্জেট ব্লাউজে এমন মানিয়েছিল বৌভাতের রাত্তিরে তাকে যে স্বর্ণসুন্দরী ফিরে ফিরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন।

কেবল একটু পথহারা দেখাচ্ছিল ভবনাথকে। বিয়ের কেনাকাটি, মাছ মাংসের জোগানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা এই দুটি প্রধান ব্যাপারের দায়িত্বই ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি থেকেও ঠিক নেই। বিয়েবাড়ির ফাঁকে ফোকে বয়স্কলোকজনদের যে জমাট পারিবারিক আড্ডা তাতে তিনি ধাতস্থ নন। তাঁর মন কেমন করে ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের নীচেই সবে লাগানো কপির ক্ষেতের জন্যে। চারাগুলো ঠিকমত লাগল কিনা এক একবার ভাবেন। প্রতাপের দরুন মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয়। তাঁর শ্বশুর মশাই নব-র জন্যে যে সাম্রাজ্য রেখে গেছেন তার তুলনায় প্রতাপ খুব একটা কিছু পাবে না, তাঁর বাড়িও খুব বড় নয়, তার তিন ভাগের এক ভাগে মাথা গুঁজবার জায়গা হবে মাত্র। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ভবনাথ তাড়া দিতে থাকেন স্বর্ণসুন্দরীকে।

—তোমার কপির চারা মরবে না, আমি বলছি। গোপীনাথ আছে। ওর সব দিকে খেয়াল আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই। স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

কলকাতা ছাড়ার আগের দিন বিকেলে বাড়ির ঠিক সামনেই বিভৎস এক ব্যাপার ঘটে। ধুপ-কাঠি কিনতে গিয়েছিল রাস্তার ওপারে টুটুলের সমবয়সী একটা ছেলে। তার বাপের ডেকরেটারের দোকান এ ফুটে। পেছন থেকে লরিতে চাপা পড়ল ছেলেটা। লোকজনদের হল্লা, পলায়মান লরীর

পেছনে জনতার নিস্ফল আক্রোশ, পুলিশের ভ্যান, এক মুহূর্তে নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা স্বপ্নের শহরকে রূপ দেয় শত্রুপুরীতে। ভবনাথের নিষেধ সত্ত্বেও টুটুল চোঙা বুড়ী ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে।

স্বর্ণসুন্দরী চীৎকার করে ডাকেন,—চলে এসো, চলে এসো তোমরা ওখান থেকে।

পরদিন যখন তারা ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল তখন এই গাছপালা পুকুর জেলখানা সুপুরিগাছে ঢাকা বাড়িটাই তাদের নিজেদের বাড়ি মনে হচ্ছিল। কলকাতায় একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সম্প্রতি ভাড়া দেওয়া তাদের নতুন ঝকমকে বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন ভব-নাথ। সেখানে গ্যারাজ থেকে ভাড়াটের নতুন নীল মরিস গাড়ি বেরোচ্ছে, ওপরের বারান্দা থেকে কুকুরের ডাক আসছে, সে বাড়ি ঠিক তাদের নয়। তার সঙ্গে তারা কোনো আত্মীয়তাও বোধ করেনি।

আসবার সময় গৌরী দুখানা বই তার ভাইদের উপহার দিলে, বুড়ীকে চুলের রিবন আর তিনজনের জন্যে তিনটে চকলেট। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যকের ধন" আর "আবার যকের ধন" পড়তে পড়তে তাদের শৈশবে বিপ্লব এল। বিশেষ করে টুটুলের রূপকথা আর কল্পনার রাজত্ব এল গুপ্ত-ধন, বিভীষিকা। তারপর তিনখানা চিঠি গেল কলকাতায়। গৌরীর পার্সেলে এল রবার্ট ব্লেকের বই। "সাংকো পাঞ্জার প্রতিহিংসা", "মরণের ভয়ংকর" আরও কয়েকটা মরণ-আতঙ্ক বিভীষিকা।

কিছুদিন হল টুটুলকে দেখা যায় সন্ধেবেলাতেও বইয়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে চাতালের এক কোনে।

—টুটুল এবার নির্ঘাত ফেল করবে, বুড়ী অনুযোগ করলে মা-র কাছে। স্বর্ণসুন্দরীর ভর্ৎসনায় ত্রুটি নেই। কিন্তু কাজ হয় না। দুই ভাই পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সারা দুপুর গুপ্ত-ধনের সন্ধানে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, কামান বসাবার ফোকরে পর্দার পোল গুঁজে বোম্বেটেদের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে, এক একবার সত্যি সত্যি বোধ হয় খালের পার ধরে যদি মাইলখানেক হাঁটা যায় তাহলে মাঠের ধারে বিশাল নেড়া ঝাউগাছটার গোড়ায় হীরের খনি আবিষ্কার হতেও পারে। কিন্তু পথে বিপদের জন্যে রিভলভার প্রয়োজন। বাবার বডিগার্ড রামস্বরূপের রিভলভার চুরি করবার সাধও জাগে চোঙার। কিন্তু তা করতে গেলে, গল্পে যে রকম থাকে অর্থাৎ ক্লোরোফোর্ম মাখানো রুমাল দরকার। ক্লোরোফোর্ম পাবে কোথায়? মাত্র এক শিশি ক্লোরোফোর্মের অভাবে এত বড় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ভেবে চোঙার ক্ষোভ জাগে।

কিন্তু বুড়ীর ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে টুটুল এবারও প্রথম হল বাৎসরিক পরীক্ষায়। চোঙা হল তাদের ক্লাসে দ্বিতীয়। টুটুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর এ অভ্যাস এমন জোরাল যে সামান্য ব্যতিক্রম হলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই টুটুল কেঁদে ভাসায়, নিজেকে ভাবে একেবারে অপদার্থ। টুটুল বড় হয়েও ভেবেছে ব্যাপারটা কেন এরকম হত বারেবারে। আর একটা উত্তরই সে খুঁজে পেয়েছে। আসলে ইতিহাস ভূগোল বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সমস্ত বাড়ির কাজের ফাঁকে আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে যেত। আর মুখস্থ প্রশ্নের যেখানে মুখস্থ উত্তরই আশা করা হয় সেখানে সে ভাল করবে না কেন?

গত বছর ব্রাইটন থেকে প্রতাপ যে ছবিটা পাঠিয়েছিল সেটা ভবনাথ মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন। পেছনে ব্রাইটনের সমুদ্র আর বালির ওপরে স্নানের জাঙিয়া পরে প্রতাপ একহাত কোমরে—প্রতাপ যেন যৌবনের, আশাবাদের মূর্ত প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বিদায় নেবার মুহূর্তে ট্রেনের কামরার হাতলে আলগোছে হাত লাগানো গোলাপের মালা গলায় প্রতাপের চেহারাটা মনে আসে। এইরকম ছেলেরাই তো আই. সি. এস. হবে, ভবনাথ ভাবেন। তাঁর বড় ছেলে তাঁর মতো মেজাজ এটা তিনি টের পান। তুখোড় অথচ অকারণ বাচাল নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে পারে অথচ স্বতন্ত্র এরকম ছেলের কদর নিশ্চয় বুঝতে পারবে সাহেবরা। গতবার 'ভাইবা'তে খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রতাপ লিখেছে এবার সে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। আর নব যা বলেছে, তা তিনি মানেন না।

পারিবারিক কল্যাণের আশায় স্বর্ণসুন্দরী কিছুকাল যাবৎ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করছেন। মেঘভাঙা পূর্ণিমায় চাতালের এক কোণে কাটাফলের থালা, নারকেলি কুল, নারকেলের নাড়ু সাজিয়ে সেই চন্দ্র আর কুবেরের উপাখ্যান সমান উৎসাহেই বলেন। কিন্তু মালিনীর মালঞ্চ ধবলময় হল কি হল না তাতে কিংবা জঙ্গলের মধ্যে চন্দ্রকে বেঙ্গমা বেঙ্গমী কি উপায় বাতলেছিল নদী পার হতে সে সম্পর্কে ছেলেদের কৌতূহল কিঞ্চিৎ ফিকে। এমনকি টুটুলও ব্রতকথা শোনার চেয়ে নারকেলের নাড়ু কটা সাঁটাবে সেদিকেই বেশী মন দেয়। চন্দ্র আর কুবেরের উপাখ্যানের চেয়ে ছুটির দিনে দুপুরে গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান অনেক কৌতূহলোদ্দীপক।

সেবার সন্ধ্যায় পুজো শেষ হবার আগেই চাঁদ ঢেকে যায় মেঘে। ফুঁই ফুঁই করে বৃষ্টি নামে। বুড়ী, চোঙা, টুটুল সোরগোল করে ফলফলারির ডালা ঘরের মধ্যে টেনে তোলে। সারা রাত বৃষ্টি চলে। ভোররাত্তির থেকে বৃষ্টির জোর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দাপট হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ এত বাড়ে যে ভয় হয়, বাংলোর চাল উড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব বাংলা জুড়েই সে রাত্তির ঘূর্ণিবার্তা আর ঝড় চলেছিল। অনেক চাল ওড়ে, গাছ ওপড়ায়, গরু মোষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই অসময়ে বৃষ্টি ঝঞ্ঝায় ছেলেমেয়েরা বিছানার চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমোয়। স্বর্ণসুন্দরীর সারাদিন উপোসের পর ভালমন্দ খেয়ে গভীর নিদ্রা যান, ঝড় বর্ষায় বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ভবনাথের ভাল ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন তাঁদের পাবনার বাড়ি জলে ভেসে যাচ্ছে। ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের চারদিকেও জল। লণ্ঠনের পলতে উঠিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন নিশ্চয় অনেক চাল উড়েছে, ক্ষতি-টতির একটা হিসেব কালই নিতে হবে। এক চিলতে খোলা বারান্দার পরেই বাথরুম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, ভবনাথের মনে হল বাড়ির ওপরেই বাজ পড়ল। সকালে উঠেই দেখলেন ফটকের সামনে সবচেয়ে সতেজ সরস সুপুরী গাছটার ওপরেই বাজ পড়েছে। কয়েকদিন পরই পোড়া পাতাগুলো ঝরে গিয়ে গাছটার ন্যাড়া মাথা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব

মাস ছয়েক পরে গরমের সন্ধে। বাগানের মাঝখানে লাল টিনের চালওয়ালা দোতলা লাল বাংলোর বারান্দায় ইলেকট্রিক আলো। সেকালের জলপাইগুড়ি শহরটা ফিটকাট নির্জন, ছাড়া-ছাড়া। গেটের গায়েই সেন্ট্রিবক্সের মাথায় ফুলন্ত চাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। টেবিলের ওপাশে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা যুবকটিকে বুড়ী প্রশ্ন করে,—স্যার, এটার মানে কি?

—মানে, মানে একটা কবিতা...একটা একটা...গান, রবীন্দ্রনাথের।

যুবকটি তোতলায়। বুড়ী ভুরু কুঁচকায়। গত কয়েক মাসে অনেকটা বেড়ে উঠেছে সে। গোলাপী ফুলতোলা খাটো স্কার্টের ওপর সাদা অর্গান্ডির ব্লাউসে ক্লাস নাইনের মেয়েটিকে লাগে অপরূপ যুবকটির কাছে। ওপরের দিকে টেনে তোলা চুলের ওপর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নেয় বুড়ী। অস্পষ্ট হাসির রেখা তার ঠোঁটের দু' পাশে ফুটেই মিলিয়ে যায়। আবার ভুরু কুঁচকিয়ে বলে,—তা অঙ্কের খাতায় কেন? বুড়ী আলোর নীচে খাতাটা মেলে দেয়। ছোকরাটির হাতের লেখা নিঃসন্দেহে ভাল। খুব যত্নে চাইনিজ ইঙ্কে বাড়ির অঙ্কের খাতার শেষে লেখা।

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি
মম জল ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে...

তারপর সশব্দে হেসে ফেলে বুড়ী। হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে,—এটা কি মাস স্যার?

—মে মাস, ছোকরাটির ফর্সা কান লালচে দেখায়।

—শ্রাবণ মাস আসতে স্যার আরও দু' মাস।

পরদিন বিকেলে মমতা আসে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে মমতা বুড়ীর চেয়ে আরও দু' বছরের বড়। বেশ ঝলমলে দামালে ফর্সা চেহারা মমতার। সব সময়ই হাসছে। আর হাসলে

গালে চমৎকার টোল পড়ে। বুড়ীর সে সহপাঠী কিন্তু জগত সংসার সম্পর্কে অনেক বেশী খবর রাখে। বুড়ী তখন দোল খাচ্ছে বাগানের কোণে ঢ্যাঙা আমগাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায়। মমতা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে পায়ের মৃদু ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ক্রমাগত বুড়ী ওপরে উঠতে থাকে। শূন্যে থেকে করলা নদীর ওপরে ব্রিজটার মাথা চকিতে চোখে পড়েই মিলায়।

—বু...ড়ী গানের সুর করে মমতা ডাকে।

বুড়ী কাত হয়ে ওপর থেকে তাকায়। ময়লা মেয়ে বলে স্বর্ণসুন্দরী এ মেয়েকে একটু নেকনজরে দেখতেন। তবে বছরখানেক হল এই শ্যামলা মেয়ের মুখশ্রী যে যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠছে সেবিষয়ে তাঁরও চোখ খুলেছে। দোলনা থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমেই তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী।

—এনেছিস, আমার জন্যে এনেছিস বইটা? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই নীল শাড়ির আঁচলে লুকানো বইটা টেনে নেয়। মলাটের ওপর চোখ রাখতেই তার উত্তেজিত মুখ-চোখে স্নিগ্ধতা নামে। বইটার নাম "প্রথম প্রেম", লেখক অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত।

দিন দুই আগে বইটার গল্প করেছে মমতা। আলগোছে কোলের ওপর বইখানা রেখে বুড়ী মমতার কাঁধে হাত রেখে দুলতে থাকে। বরফের মতো কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি ফুরুশ-গাছটার দিকে চেয়ে আস্তে পা মাটিতে ঠেকিয়ে থামে।—আচ্ছা, পানুদা অমন করে কেন বলত?

—পানুদা? তাই নাকি? ওকে তো একদম ভিজে বেড়াল ভাবতাম! মমতার বিশেষ কৌতূহলেই বুড়ী একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

—না না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না।

—ঠিক আছে। তুমি চেপে যাচ্ছো। আমিও কিছু বলব না তোমাকে।

বুড়ী ঘাড় নাড়ায়,—সত্যি বলছি সেরকম কিছু নয়।

—কি রকম কিছু? মমতার চোখ জ্বলে কৌতূহলে।

—এই যেমন দিদির বেলায় হয়েছিল, বুড়ী বললে অন্যমনস্কভাবে।

—গৌরীদির বেলায়? দেখেছো আমাকে তুমি কিছুই বল না আর আমি সব কথা আদ্যো-প্রান্ত তোমাকে বলি। বেশ, ঠিক আছে। মমতা দোলনার তক্তা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

—বোস বোস। হাত ধরে টেনে বসায় বুড়ী মমতাকে। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বললে, —সেরকম কিছু না, একটা মাঝবয়সী লোক, হীরালালবাবু পড়াতে পড়াতে দিদির হাত চেপে ধরেছিল একবার। দিদি মাকে বলে দিলে। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেরকম কিছু না।

বুড়ীর শেষ কথায় মমতার মুখে চোখে কৌতুক ঝিলিক মারে। '—পানুদা খুব ভাল লোক না-রে? ঐরকমই মনে হয় প্রথম প্রথম।'

বুড়ী জবাব দেয় না। মমতা তার চেয়ে জগতসংসার সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু পানুদার ব্যাপারেও জ্ঞানদান বুড়ীর পছন্দ হয় না। পানুদাকে সে অনেক ভাল করে জানে। তিনমাস আগে জলপাইগুড়িতে ভবনাথের বদলি হবার দিন সাতেক পর থেকেই স্কুলের ভাল ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট-পাশ সুদর্শন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কেরাণী পানু মিত্র বুড়ীর গৃহশিক্ষক। তিন ভাই বোনে জাঁকড়ে পড়লে পড়াশোনার অসুবিধে হতে পারে বলেই এ ব্যবস্থা। আর একটি তরুণ সেনপাড়ার ক্ষ্যাপা-দা দুই ভাইকে পড়ায় একসঙ্গে নীচের বারান্দায়। ক্ষ্যাপা-দা স্থানীয় স্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক এবং ব্রতচারীর মাস্টার।

দুই বন্ধু আবার পাশাপাশি বসে দোল খায়। বুড়ী কোলের বইখানা আলতোভাবে নাড়া-চাড়া করে। দুটো শালিখ পাশের ঝোপ থেকে ঝগড়া করতে করতে ঘাসে পড়েই উড়ে পালায়। গেট খোলার শব্দ আসে। ভবনাথ তাঁর বহুদিনের ব্যবহৃত সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে বাগান ঢোকেন। তাঁর সাম্প্রতিক পদোন্নতিতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সাদা প্যান্টের ওপর কাঁধকাটা ঘিয়ে তসরের কোট। বুড়ীর মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই ভবনাথ কোর্ট থেকে ফিরতেন রাণাঘাটে, মুন্সীগঞ্জে।

—কথা বলছিস না যে! পানু-দার ব্যাপারে আমি মোটেই জেলাস নই, মমতা বললে।

বুড়ী অবাক হয়ে তাকায়। মমতা বুড়ীর কানের কাছে মুখ রেখে বললে,—ছেলেরা মেয়েদের কাছে কি চায় জানিস?

—কি আবার! আমি যা তোর কাছ থেকে চাই।

—দূর, তুই কিছু জানিস না, একেবারে ছেলেমানুষ।

—আমি জানতে চাই না, বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বললে।

মমতা গুন গুন করে সুর ভাঁজে। তারপর খুব মিহি চাপা চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় গায়:

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভোলালরে ভোলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভোলানো গান।

গান থামিয়েই বললে,—তুই দেখিস নি?

—কী?

—সে কি? "মুক্তি!" আমরা কাল দেখেছি। গ্র্যান্ড। দেখে আয় দেখে আয়! ওঃ কি মারভেলাস! প্রমথেশ বড়ুয়ার কি অ্যাকটিং মাইরি!

বুড়ী সেই উচ্ছ্বসিত মুখখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে। তার এই দামাল বন্ধুটির প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে।

—আমরা শনিবার যাব, বুড়ী আস্তে আস্তে বলে।

—এবার নাম, আমি একটু দুলি।

মমতার পায়ের চাপে দোলনা কেঁপে কেঁপে অনেক ওপরে উঠে। তার থোপা থোপা চুল হাওয়ার ওঠে নামে। লাল মুশলো বেরোন ঝকঝকে দাঁতের হাসি ভরা মুখে এক-একবার বুড়ীর দিকে তাকায়। আর এক এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মতো মমতার সান্নিধ্য তাকে স্পর্শ করে। সে যেরকমভাবে মমতাকে কাছে পেতে চায় পানুদাকেও চায় তেমনিভাবে কাছে পেতে। ঠিক এমনিভাবে বিকেলের আলোয় দোল খেতে খেতে বা সিনেমার গল্প করে। ছেলেরা মেয়েদের কাছে আবার কি চায়?

কিন্তু দুদিন পর "মুক্তি" ছবিটা বুড়ীর মনে যেরকম আলোড়ন আনে সেকথা অনেক দিন সে ভুলতে পারবে না। পুরুষ বন্ধুর যে চিত্রকল্প জন্মেছিল পানু-দার সান্নিধ্যে "মুক্তি" ছবির নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া তাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিল। ঠিক সে গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছেলেরা চাইবে, জোর করবে, মোটা গলায় কথা বলবে, মেয়েদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে না, তাকাবে আদায়ের ভঙ্গীতে, দাবীর ভঙ্গীতে। আর মেয়েরা সেই আদায়ের ভঙ্গীই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে, বরং তা না থাকলেই সে হবে অতৃপ্ত। এইরকম কতগুলো আবছা ধারণা অস্পষ্টভাবে বুড়ীর মাথায় খেলতে থাকে। এক কথায় পানুদার যে ছবিটা তার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল রুপোলীপর্দার নায়ক সে স্থান অধিকার করে নিলে। শয়নে স্বপনে এখন প্রমথেশ বড়ুয়া বুড়ীর সঙ্গী।

—আপনি "মুক্তি" দেখেছেন স্যার?

পরদিন বুড়ীর প্রশ্নে পানু চমকায়। ভুরু কুঁচকিয়ে বলে,—না দেখি নি, দেখব না।

—দেখবেন না, কেন? বুড়ীর চোখেমুখে কৌতুক খেলা করে।

—ওসব তুমি বুঝবে না। সিনেমা দেখা ভাল না।

বুড়ী তার গৃহশিক্ষকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—আমার খুব ভাল লাগে। আপনারও ভাল লাগবে।

পানু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। মেয়েটিকে তার বরাবরই ভাল লাগে। তার চেহারা, ছটফটে মেজাজ তাকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দু' ছত্র জ্যামিতির খাতায় যে লেখে নি তা নয়। কিন্তু তাই বলে সিনেমা নিয়ে তার ছাত্রী তার সঙ্গে খোসগল্প করবে

এতে তার আত্মসম্মানে লাগে। তারপর সে নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার ছাত্রীকে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু তার ছাত্রীও যে তাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে, সে যখন মাথা নীচু করে অঙ্ক দেখছে তখন তার খাতার ওপর না পড়ে এক জোড়া চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে এই নতুন পরিস্থিতিতে সে বিচলিত বোধ করে। মাস গেলে পনেরোটা টাকা আসত অস্বচ্ছল সংসারে সে পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় হয়।

—আপনার অফিস কখন ছুটি হয়?

—কেন? পাঁচটায়। কেন?

—পাঁচটা হলে হবে না। পাঁচটা হলে দেরী হয়ে যাবে। চারটে হয় না?

সেই কৌতূহলী উৎসুক মুখখানার দিকে চেয়ে পানুর অসোয়াস্তি হয়, আবার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে।

—কেন, কোথাও যাবে?

—চলুন না, সেই একবার মোটে নদীর ধারে গিয়েছি। কাল যাবেন?

—মাসীমাকে বলে নিও। আমি চারটেতে আসব একটু সকাল সকাল ছুটি করে।

—মা-কে? কেন? বুড়ীর মুখে বিরক্তি। একটু হাসেও। গলায় ঠাট্টা স্পষ্ট।—কেন, ভয় করছে বুঝি?

আবার কান লাল হয় পানু মাস্টারের। এরকম ব্যাপার গল্পেটল্পে পড়েছে, বাঙলা কোর্ট কেসের রিপোর্টের লাইনটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে, 'তাহাকে ফুসলাইবার অভিযোগে'। আস্তে আস্তে বললে,—না ভয় কেন, মাসীমা ভাববেন তাই বলছি।

—মা-কে বলব মমতার বাড়ি যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

পড়ার শেষে উঠবার মুখে বুড়ী বললে,—আপনি রাস্তার মোড়ে থাকবেন। ওখান থেকে আমি ধরে নেব।

পরদিন দুপুর চারটেতে তার একমাত্র সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পানু নির্জন রাস্তার মোড়ে মেহগিনী গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পরই বুড়ীকে আসতে দেখা যায়। খাটো ধূসর স্কার্ট আর সাদা ব্লাউসের সঙ্গে সাদা হিলতোলা জুতোয় অনেকটা লম্বা দেখায় তাকে। মাথায় নীল রিবন প্রথমেই চোখে পড়ে। নির্জন পিচঢালা রাস্তা ধরে গাছের তলা দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে থাকে।

—আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে কি বিশাল নদী! বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

পানু সামনেই বিকেলের রোদে পাণ্ডুর বিস্তৃত বালির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—তিস্তাও বিশাল।

—ও তো খালি বালি। আর এইটুকুন জল। পদ্মা দিয়ে যখন স্টিমারে যেতাম তখন যে কিরকম মনে হত। আপনার দেশ কোথায় পানু-দা?

—আমার? মেটেলি।

—মেটেলি? কি অদ্ভুত নাম।

—সেখানে নদী নেই, খালি পাহাড় আর আপেপাশে চায়ের বাগান।

—চায়ের বাগান?

—তোমরা যদি ডুয়ার্সে যাও কিংবা দার্জিলিং-এ, অনেক চায়ের বাগান দেখবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বললে, 'আমার মেটেলিই ভাল লাগে। বাবা ছিলেন চা বাগানের ডাক্তার।'

নার্ভাস ভাবখানা পানুর কেটে যায়। চা বাগানের গল্প করে। একবার চিতা এসেছিল একেবারে তাদের কোয়ার্টারের কাছে। চারপাশ থেকে বেড়া দিয়ে সড়কি দিয়ে মারা হল বাঘ। পানুর নার্ভাস ভাবখানা একেবারে কেটে যায় ছেলেবেলার গল্প বলতে বলতে, অনেক স্বাভাবিক দেখায় তার ছুঁচলো ফর্সা মুখখানা। কিন্তু বুড়ী ভেতরে ভেতরে অসোয়াস্তি বোধ করে। তার এ ধরনের আলাপ যে ভাল লাগে না, তা নয়, কিন্তু এ ধরনের আলাপ ছাড়াও সে আরেক ধরনের

কথাবার্তা শুনতে চায়। অন্তত কয়েক মাস হল এইরকম একটা স্বপ্নের কথাই সে ভেবে এসেছে আর এই পড়ন্ত রোদে বালির চড়ায় বসে বসে সেই স্বপ্নটার মাঝখানে সে তলিয়ে যেতে থাকে। একঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।—দেখুন দেখুন। বলে বুড়ী তার হাতখানা ওপরের দিকে তুলে পানুর কোলে আলগোছে রাখে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কতগুলো গরুর গাড়ি আসে পাশের গ্রাম থেকে।

সন্ধে নামছে কিন্তু পানুর খেয়াল নেই। তার সঙ্গিনীর হাত ধরে বসে থাকে। তার আর ভয় নেই, অসোয়াস্তি নেই, এক নবীন বন্ধুত্বের আত্মবিশ্বাসে তাকে সমাহিত দেখায়। একটু দূরে এক বেঁটে যুগল খেজুর গাছের গোড়া থেকে বোধহয় একটা ছাগল কাশে।

—পানুদা, তুমি একটা বোকা! বুড়ী হঠাৎ বললে।

—বোকা! কেন?

বলেই বুঝতে পারে পানু। আর সেই অস্পষ্ট অসোয়াস্তি তার চিন্তাশক্তি আবৃত করে। বুড়ী তার দিকে মাথা হেলিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে চাপা কৌতুক। সেদিকে চেয়ে পানু গাঢ় গলায় বললে, 'গায়ত্রী।' তারপর তার ছোট মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে গভীর চুম্বন করে।

ঠিক এই সময় অনতিদূরে খেজুর গাছের গোড়া থেকে ছাগলটার কাশির মাত্রা বেড়ে যায়। তারপর খিঁক খিঁক করে হাসির আওয়াজ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ বুড়ী-পানুর খুব কাছেই মাটির ঢেলা পড়ে। তারা চমকে দাঁড়িয়ে উঠতেই স্পষ্ট চোঙার গলা পাওয়া যায়,—কি মশা! বাবা রে! আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারে টুটুল চোঙা ছিটকে বেরিয়ে যায়। টুটুলের হাসি জলতরঙ্গের মতো বাজতে থাকে।

দুই

সম্প্রতি চোঙার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট আসার পর থেকে খুব জমিয়ে ক্যাম্বিস বলে খেলা চলছে। তখনও তিস্তার বাঁধ হয়নি এবং যেখানে সেখানে মাঠের মধ্যে পাকা বাড়ির করুণ বিসদৃশ সমারোহ দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। দেশভাগের চাপও উত্তরবঙ্গে আছড়ে পড়ে নি। শহরটা তখন নির্জন, ছিমছাম। তাই ছেলেদের নড়বার চড়বার জায়গা প্রচুর। বিকেল গড়িয়ে এলে ভোম্বল, ভুপেন দস্তিদার, দেবী, জয়ন্ত, ঢেঁকী বা বনবিহারী সাহা চোঙা টুটুলের জমজমাট ক্রিকেট টিমকে প্রায়ই ক্রীড়ামত্ত দেখা যায় আম-বাগানের ধারে মাঠে। ঢেকী তাদের মধ্যে বয়সে বড়। দুর্দান্ত সাইকেল চালায়, মারাত্মক বল করে। টুটুলের সহপাঠী ভুপেন দস্তিদারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশী। খুব হাঁকিড়িয়ে ব্যাট করতে যায় এবং প্রায়ই আউট হয়। বল সবচেয়ে ভাল লোফে চোঙা। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সে বল লোফে যেখানে সেখানে যে সে প্রায়শ আতঙ্কের কারণ। সবচেয়ে ভাল ব্যাট ভোম্বল। তাকে আউট করতে বোলারের হাত টন-টন করে। আর ভাল ব্যাট করে টুটুল। টুটুলের এই আকস্মিক পারদর্শিতা চোঙার ঈর্ষার কারণ ঘটায়। টুটুলকে সে খেলাধুলোর ব্যাপারে বরাবরই এলেবেলে ভেবে এসেছে। কিন্তু তার ছোট-ছোট হাত-পা নিয়ে সে অবলীলাক্রমে ব্যাট ঘুরিয়ে বেশ তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে।

ভুপেন-কে যেন তার পদবী-ছাড়া ভাবা যায় না। বয়সে টুটুলের চেয়ে একটু বড় হবে কিন্তু হাব-ভাবে সে বিশেষ ভাবগম্ভীর। টুটুলকে সে তিনখানা নাইজিরিয়ার স্ট্যাম্প দিয়েছে, গিনির দুটো দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু টুটুলের পছন্দ নয় ভুপেন-কে। তার এই ভাব-গম্ভীর ভক্তের মেজাজটা তার অপছন্দ। তার থেকে সে চোঙার সহপাঠী ভোম্বলকে ভালবাসে। ভোম্বলের চোখ দুটো চমৎকার, ভুরু নাচিয়ে কথা বলে। তার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে। তার ওপর দু চাকার সাইকেল। টুটুল আর চোঙার সাইকেলও আয়ত্ত হয়েছে। তবে টুটুলের হাফ প্যাডেল।

ভোম্বলের সঙ্গে চোঙারই সবচেয়ে পটে। কাঁঠালগুড়ি টি এস্টেটের পাশাপাশি চায়খানা

চায়ের বাগানের মালিক অমিয় ঘোষ বেশ সম্পন্ন লোক, বোধহয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে সুধীর সম্প্রতি বি-এ পাশ করছে। দ্বিতীয় ছেলে মনা একটু পাগলাটে। তৃতীয় সন্তান ভোম্বল তার সখের আর অন্ত নেই। ভোম্বলের সঙ্গে চোঙার কতগুলো বিশেষ ধরনের কথা জমে ওঠে যেগুলো ঠিক ধরতে পারে না টুটুল, আর আন্দাজে কিছুটা ধরতে পারলেও তা নিয়ে এত ফুঁসফুস গুজগুজ করবার কি কারণ আছে বোঝে না। আর এ সময় টুটুল কাছে এলেই তাদের আলাপ হঠাৎ বন্ধ। ভোম্বল অমনি চোখ নাচিয়ে বলে, সাইকেলে চড়বি না টুটুল? টুটুল অপ্রসন্নভাবে সরে যায়। একদিন সে আড়িও পেতেছিল। ভোম্বল ফিসফিস করে বলছিল। অর্ধেক কথা শোনা যায়, অর্ধেক শোনা যায় না। এক রাজ-কুমারীর মনে সুখ নেই। সবাই সুখ দিতে আসে কেউ পারে না। সবাইয়েরই গর্দান যায়। তারপর নায়ক এলেন। সে এমন সুখ দিলে...এবং ভোম্বল অদ্ভুত কতগুলো অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে আর চোঙা হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে চোঙার জল বেরিয়ে পড়েছে হাসতে হাসতে। সেইভাবে জিজ্ঞেস করে,—তারপর?—তারপর আর কি? তারপর তারা মনের সুখে থাকতে লাগল আর এই রকম করতে লাগলে। ভোম্বল হাসতে-হাসতে চোখের জল বের করে উত্তর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দরজার পেছনে টুটুলের দিকে নজর পড়ে তার। ইস, আবার এলেবেলেটা এসেছে। টুটুল দৌড়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনার পর প্রায় সাত দিন সে ভোম্বলের সঙ্গে কথা বলে নি।

এদিক থেকে ভোম্বলের ছোড়দা মনার সঙ্গে তার বনে ভাল। অবশ্য বলতে গেলে মনা-ই তার প্রতি আকৃষ্ট। অমিয়বাবুর বড় ছেলে বেশ দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই একটা টি এস্টেটের ম্যানেজার। ভবনাথ-কে সপরিবারে তাদের সদ্য-কেনা চকোলেট রংয়ের ভি-এইট ফোর্ডে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে, সবাই মিলে ডুয়ার্সে যাবার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছে স্বর্ণসুন্দরীর কাছ থেকে। ছোট ছেলে ভোম্বলও বেশ চালাক-চতুর, তার সৌখিন মেজাজ তার যথেষ্ট সচ্ছল বাপের পছন্দ। মনা এর ব্যতিক্রম। সে কলকাতার স্বামী প্রণবানন্দ অথবা অন্য কোন মহারাজের শিষ্য। ফর্সা, বেঁটে, রোগা, তোতলা, দুই স্বাস্থ্যবান ভাই থেকে একেবারে আলাদা। মনা এসে বাগানের এক কোণে বাতাবি লেবু গাছের নীচ থেকে তার সাইকেলের বেল দেবে। বাড়ীর ভেতরে সে যাবে না। কারণ বুড়ী কিম্বা অন্যান্য কোন নারীর সঙ্গ তার অপছন্দ। টুটুল দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে বলে—মনা-দা, চকোলেট এনেছো?

মনা বুক পকেট থেকে চকোলেট বার করে। টুটুল চট করে মোড়ক সরিয়েই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে,—কি মজা, গ্রেটা গার্বো! মোড়কের ভেতর থেকে নীল জামা আর মুক্তোর হার-পরা গার্বোর ছবি। মনা সেদিকে চেয়ে অপ্রসন্নভাবে বললে,—'ওটা ফেলে দে। ওটার জন্যে তো আমি চকোলেট আনি নি। তুই খাবি বলে এনেছি।'

—বাঃ আমি যে জমাই। আমি জমাই, দাদা জমায়।

—আচ্ছা চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।

মনার নতুন সাইকেলের রডে চড়ে আরাম আছে। ভবনাথের সাইকেলটা অনেক পুরনো। আর চোঙা তাকে রডে নিয়ে চালালে গাড়াগর্তে পড়লেই পাছা ব্যথা করে। নদীর দিকে নির্জন রাস্তা ধরে চলতে-চলতে মনা বললে,—বাঙালীর কি অভাব জানিস? আত্মশক্তি। বুঝেছিস?

টুটুলের জিভ তখন চকোলেটের সরসতায় মন্থর।—হ্যাঁ মনাদা! তাড়াতাড়ি মাথা বাঁকিয়ে উত্তর দেয়।

—স্বামিজী কি বলে জানিস? আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বেশী লোকের দরকার নেই। মাত্র বারোজন। এই বারোজনের ওপরেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

টুটুল লক্ষ্য করছিল নতুন সাইকেলে বেগ বাড়লেই কেমন একটা সাঁ-সাঁ শব্দ বেরোয়। বাবার সাইকেলে সে রকম হয় না। বোধহয় নারকেল তেল দিলে শব্দ বেরোতে পারে।

নদীর ধারে কয়েক মাস আগে পানু আর বুড়ী যেখানে বসেছিল তার কাছেই তারা বসে।

দুজনে পাশাপাশি বসার পর মনা বললে, একটু তোতলিয়ে,—তো-তোর দিদির কিন্তু নাম খারাপ হচ্ছে।

—নাম খারাপ? অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টুটুল। একটু ভয়ও করে। তিস্তার ধারে সেই সন্ধেটার ছবি মনের মধ্যে খেলে যায়।

—হ্যাঁ, পানু-টা একটা রাসকেল। ও ভি-ভিজে বেরাল। আগেও ওরকম করেছে। তোর দিদির সর্বনাশ করবে বলে দিচ্ছি।

টুটুল ঘাবড়ে যায়। জিভে চকোলেটের মিষ্টি স্বাদ, একটু দূরেই রোদ্দুর-ঝলকানো জলের হাওয়া সব কিছু বিস্বাদ লাগে।—আমি ওসব জানি না মনা-দা। আমি কিচ্ছু জানি না।

—মাসীমাকে বলতে হবে। ভোম্বল আমাকে সব বলেছে।

টুটুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে।—আমি পারব না বলছি, মনাদা, প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে।

—পারতে হবে। তোমার দ্বারাই হবে। আ-আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হবে। স্বামিজী অন্তর্দৃষ্টিতে সব দেখতে পান। যে বা-বারোজনের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তার মধ্যে তো-তোমার নামও আছে। স্বামিজী কখনও মিথ্যে বলবেন না। তোমার ওপরে অ-অনেক কিছু নির্ভর করছে।

প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতেই মনা তোতলায়। একবার যাত্রা শুরু করতে পারলেই গোটা রাস্তাটা নির্ঝঞ্ঝাটে পার হতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

—বল, বলবে?

টুটুল যান্ত্রিকভাবে বললে—বলব। আজ বিকেলে নতুন সাইকেলে বেড়ানোর আনন্দ, চকোলেটের স্বাদ তার কাছে মাটি হয়ে যায়। আমবাগানে ক্রিকেটেই গেলে পারত সে, এরকম ফ্যাসাদে পড়তে হত না, টুটুল চিন্তা করে।

—এবারে আয়, আমরা আসন করি। মনা পা মুড়ে পিঠ খাড়া করে পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। টুটুলকেও তার পাশে বসতে আহ্বান করে। মিনিট পনেরো কেটে যায়। টুটুলের বাঁ হাঁটুর নীচটা চুলকায়। সেদিকে হাত বাড়াতেই মনা সজোরে তোতলায় ন-ন-নড়িস নে। আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট কেটে যায়। হঠাৎ তিস্তার পারে পুলিশ লাইন থেকে বিউগিল বাজে। একটানা বেজে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার বোধহয় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে ঘাসের মধ্যে থেকে।

—ঠিক ক-কপালের মাঝখানটায় কিছু মনে হচ্ছে? একটু গরম লাগছে? মানে এক রকম জ্যোতির মতো জিনিস ঠিকরে বেরোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? চোখ বন্ধ করেই মনা প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার আড়চোখে মনা-দার দিকে তাকিয়ে বেশ করে চুলকিয়ে নেয় হাঁটু, নাকের ডগাটাও হাতের তালু দিয়ে ঘষে নেয়।

—অমন নড়িস নে। অধৈর্য হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?

আরও বোধহয় পাঁচ-সাত মিনিট কাটে। আধমরা আমগাছটা থেকে 'কু-উ-ক', 'কু-উ-ক' করে পাখী ডাকে। আবার ফড় ফড় করে উড়ে পালায়। আরও দূরে কোকেবার ডাকে, তারপর শব্দ পাওয়া যায় না। এবার পড়ন্ত রোদের তেজটা ক্রমশই অসহ্য লাগে টুটুলের কাছে।

—এবার পাচ্ছিস? একটু গরম লাগছে ঠিক কপালের মাঝখানটায়?

—একটু অস্ফুট উত্তর আসে টুটুলের।

—আমি বলছি, তোর হবে। স্বামিজীর কথা কখনও মিথ্যে হয় না। আরও হবে। একেবারে জ্যোতি বেরোবে।...এবারে কি রকম?

—গরম লাগছে মনা-দা।

—হবে, তোর হবে। আনন্দে চোখ খোলে মনা। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক। আস্তে আস্তে হবে। হড়বড়ালে চলবে না।

আবার যখন তারা ফেরে তখনও সাইকেলের মিষ্টি সাঁ সাঁ শব্দ টুটুলের কানে আসে। কিন্তু সেদিকে তার নজর ছিল না। এক অস্পষ্ট আশঙ্কা তার বুকে চাপ বাঁধে।

তাদের বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার মোড়ে সাইকেল থেকে টুটুল-কে নামিয়ে মনা আবার তোতলায়, আ-র আ-র একটা কথা। তো-তোর দিদিকে বলবি মমতার সঙ্গে না মিশতে।

মমতা ভাল মেয়ে না। তু-তুই ছোট ছেলে বুঝবি না। স্বামিজী বলেছেন স্ত্রীলোক কু হলে তার মতে কু আর কিছু নাই।

মনা সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে আম-বাগানের গা দিয়ে রাস্তাটা ধরে মিলিয়ে যায়। টুটুল হতভম্বের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে। একবার ভাবলে সামনে এগোবে নাকি, কিন্তু ক্রিকেট-পর্ব নিশ্চয়ই এতক্ষণ সমাপ্ত। টুটুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোয়। আর কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। চেনা গলার কথা ভেসে আসে। তাদের ঠিক কম্পাউন্ডের বাইরে মাঠের দিকটা থেকে ফিস-ফিস করে কথা আসছে মাঝে মাঝে হাসিরও আওয়াজ। এ জায়গাটায় পৌঁছতে কতগুলো কেয়ার ঝোপ, সচরাচর তারা এদিকে যায় না। কিন্তু এক অদৃশ্য টানে টুটুল সেদিকে এগোয়। সন্ধের অন্ধকার নামছে। কেয়ার ঝোপের ভেতর থেকেই স্পষ্ট দুটো মূর্তিকে দেখা যায় একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে। টুটুল আর একটু এগোতে গিয়েই পিছু হাটে। পানুদা বুড়ীকে জাপ্টে ধরে চুমু খাচ্ছে।

চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড় মারে। মনা-দার কথা শোনার পর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা এতক্ষণে কাটতে থাকে, এতক্ষণে তার ফাঁকা মন একটা লক্ষ্যে ধাবিত হয়। তিস্তার ধারে যে দৃশ্য কয়েক মাস আগে দেখেছিল তার মধ্যে একটা মজা ছিল, তার পর চোঙা-কয়েকবার দিদিকে শাসালে সে বড় দুটো চকোলেট দিয়ে তার দু ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধি করেছে। কিন্তু মনা-দার কথার পর তার আজ সন্ধের কেয়াবনের দৃশ্য অন্যরকম লাগে, পানু-দাকে এক শত্রু শিবিরের লোক মনে হয়। দৌড়তে দৌড়তে সে গেট পার হয়। তারপর সমান তালে চোঙার প্রশ্ন ভ্রূক্ষেপ না করেই দোতলায় উঠে আসে। স্বর্ণসুন্দরীকে সামনে দেখেই তার বুক দমে যায়—মা মা! হাঁফাতে হাঁফাতে বলেই চুপ করে আরও হাঁফাতে থাকে।

—কি হল? ওরকম হাঁফাচ্ছিস কেন? ক্ষ্যাপা-দা আসে নি?

—নাঃ পানুদা দিদিকে চুমু খাচ্ছে!

হড়মুড় করে কথাটা বলে সে বিমূঢ় ভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল আসে। কান্নায় বোঁজা বিকৃত ভাঙা গলায় বলে,—আমি কিছু জানি না মা, মনা-দা বলতে বলেছে।

স্বর্ণসুন্দরী যখন ভূরু কুঁচকে সামনে এসে দাঁড়ান তখন হঠাৎ মা-কে জাপটে ধরে টুটুল ফোঁপাতে থাকে। বারে বারে জেরা করেও বিশেষ কিছু জানতে পারেন না স্বর্ণসুন্দরী। অথচ টুটুল সচরাচর বাজে কথা বলে না। কাজেই কথাটা মোটেই ফেলার নয়। তা ছাড়া মেয়ের উড়ু-উড়ু ভাব তিনি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছেন। ফিটফাট থাকা তাঁরও পছন্দ। সেদিক থেকে বুড়ীর কাপড়-চোপড়ের দিকে সাম্প্রতিক অভিনিবেশ তাঁকে বিচলিত করে নি। কিন্তু মমতার বাড়ি যাচ্ছে বলে সময়-অসময়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার একটা অর্থ তিনি খুঁজে পান। পড়ার ঘরে টিক্-টিক্ করা পছন্দ নয় তাঁর। কিন্তু একদিন পাশ দিয়ে যেতে তিনি একটু থমকে ছিলেন। টেবিল ল্যাম্পের ওপর দিয়ে এমন ভাসাভাসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে পানুর দিকে চেয়ে ছিল তার মেয়ে যে মুহূর্তের জন্যে তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাসে ঘা পড়ে। তারপর ব্যাপারটার অসম্ভাবনা এতই প্রচণ্ড যে সেদিকে আর চোখ ফেরানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু যে কারণে তিনি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তা হোল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কেরানীর আস্পর্ধা। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে কথাটা বলেই ফেলেন বিহ্বল টুটুলকে। তারপর ওপর থেকে হাঁক দিলেন,—বুড়ী।

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো বুড়ী নিষ্পৃহ গলায় নীচ থেকে জবাব দেয়,—যাই মা।

সেবার শীতের সকালে মস্ত একখানা নতুন চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ি নিঃশব্দে এসে থামে ডেপুটি কমিশনারের বাগানে। গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর নীল চকোলেট জহর কোট আঁটা সুধীর ঘোষ নামে। কুচকুচে কালো এবং আশ্চর্য সুপুরুষ সুধীর। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা হাল্কা খেলোয়াড়ি গড়ন, বুদ্ধিতে প্রখর কপাল ও চোখ, আর হাসলে

ঠোঁটের দু-পাশ চমৎকার আকর্ষণীয়। বলতে গেলে, সুধীর সব সময় হাসছে কিংবা হাসবার উপক্রম করছে। আর সে হাসলে স্বর্ণসুন্দরীদের নীচতলায় তার আওয়াজ ভেসে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—বাঃ সুধীর, তুমি যে রাজার মতো হাসছো!

—হাসব না মাসীমা? আপনি যেরকম ঘাবড়িয়ে দিয়েছেন! হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বর্ণসুন্দরী বুঝতে পারেন না সুধীরের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের সুযোগে সে অসভ্যতা করছে কি না। একবার ভুরু কুঁচকালেনও, কিন্তু সুধীর এমন প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে যে তিনিও হেসে ফেলেন। সুধীর হাসতে হাসতে বললে,—বুড়ী? ওটা তো একরত্তি মেয়ে! আর পানুটা তো মহা ইডিয়েট! নিজের কেরীয়ার নিজে নষ্ট করল। তবে আপনি মাসীমা এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন!

—না না সুধীর। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্ব দিতে চাচ্ছো না। আমার সবচেয়ে রাগ হয়েছিল কেন জানো?

—হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি, আপনি বলছেন স্ট্যান্ডার্ডের কথা, না? সুধীর এবার গম্ভীর হয়ে বললে।

—হ্যাঁ অনেকটা...

—আচ্ছা মাসীমা, পানু-র যদি স্ট্যান্ডার্ড থাকত তাহলে...

—যদির কথা নদীতে।

—তা অবশ্য! সুধীর চেয়ারে বসে পা নাচায়।

—আমার বরাবরই মিনমিনে লোক ভাল লাগে না।

—আমাকে কেমন লাগে? সুধীরের ঠোঁটে আবার হাসির উপক্রম। আর সে হাসিতে সামান্য বিদ্রূপ নেই। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে চেয়ে হেসেই ফেলেন, তুমি নিজেই জানো। বলেই মনে মনে ভাবলেন রংটা যদি সাফ হত তাহলে গৌরীর সঙ্গে কি চমৎকারই না মানাত। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেই বলেন, রং-এর কথা বাদ দিলে সুধীরের শত্রুও তাকে সুপুরুষ বলবে। তাছাড়া এ বয়সে দুটো নামকরা টি-এস্টেটের ম্যানেজার। সুন্দর স্বভাব। বাড়িঘরের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। এরকম ঘরে গৌরী গেলে তিনি খুশিই হবেন। তাছাড়া বুড়ীর হঠকারিতায় তিনি এমন ঘা খেয়েছেন যে, গৌরীর ব্যাপারে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। গৌরী বি-এ দিল। এবার ধরেছে এম-এ পড়বে। কিন্তু তাঁর মেয়ে তো আর চাকরী করবে না, সুতরাং বিদুষী সে যথেষ্টই হয়েছে, আর হবার প্রয়োজন নেই। স্বর্ণসুন্দরীর ইচ্ছে গৌরী কলকাতার পাট চুকিয়ে এখানেই উঠে আসুক বড়দিনে। সুধীর এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর থেকেই এ ইচ্ছা আরও বলবতী হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক কারণে গৌরীর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হোস্টেলে বাস তুলে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। তা হল তাঁর বড় মেয়ের চিঠিতে তাঁর সদ্য ইউরোপ ফেরত জামাইয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

—চা-বাগানে তোমার ফাঁকা লাগে না সুধীর?

—আমার এখন খুব ভাল লাগে মাসীমা। কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের হট্টগোলের পর বাবা যখন বাগানে ঠেলে দিলেন তখন বেজায় খারাপ লেগেছিল। ভীষণ আড্ডাবাজ জানেন তো! কথা না বলতে পারলে আঁকপাঁক করতাম। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছাতি মাথায় করে জল ঠেলে এপাড়া ওপাড়া করতাম শুধু আড্ডা দেবার জন্যে। আর এখন ঠিক উল্টো, মাইলের পর মাইল, চায়ের ঝোপ, আর একটা দুটো পাখীর আওয়াজ।

এরকম নির্বান্ধব পুরী বাপু আমার ভাল লাগে না। স্বর্ণসুন্দরী যেন তাঁর মেয়ে গৌরীর হয়ে কথা বলছেন।

—আমারও তাই মনে হত। এখন আর হয় না।

—কেন বাবা? এক বছরেই এমন বুড়ো হয়ে গেলে?

—ঠিক তা নয় মাসীমা। দেখলাম আমাদের জগৎটা কেমন ফক্কা হয়ে গেল এই ক'বছরেই। যেসব জিনিস নিয়ে ভাবতাম সেগুলো আসলে কোন ভাবনাই ছিল না। খালি কথা আর কথা, কথার

পিঠে কথা। কথার বন্যায় আমরা ভেসে যেতাম।

—তা মানুষ কথা বলবে না? কথা না বললে প্রাণ বাঁচে?

সুধীরের পা নাচানো বন্ধ। তার ঠোঁটের পাশে হাসির উপক্রম এখনও আছে কিন্তু চাহনি অনেক কোমল স্নিগ্ধ। বললে, এখন বেশ ভাল আছি। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই ফ্যাক্টরীতে। সেখান থেকে একবার আসি বাড়িতে খেতে। বিকেলে সাইকেল করে যাই মাইল দুয়েক দূরে আমাদের লোকজনদের জন্যে ব্যারাক উঠছে তার তদারক করতে। যখন বাংলোতে ফিরি সন্ধে নামছে। এই বেশ ভাল মাসীমা। জীবনটা বেশ ছকে ফেলা গেছে। আগে জীবনের কোন ছক ছিল না। এই গাড়িতে করে কাশ্মীর গেলাম, সারা রাত্তির ধরে হল্লা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। আর ভাল লাগে না।

—এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে চলবে কেন?

—বুড়ো না মাসীমা, এটা ঠিক বুড়ো হওয়ার লক্ষণ না। কোন একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। তাতে ইন্টারেস্ট নেওয়া যাকে বলে, এইটাই জীবন। এছাড়া যা আছে সেগুলো কথা, কি বলুন?

—কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় বেঁচে যে আছি এটাই যদি না বুঝতে পারি তাহলে আর বেঁচে কি লাভ?

সুধীর অন্যমনস্কভাবে গাড়ির চাবি আঙুলে পাক দিতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, কলেজ জীবনে বাবাকে খুব করুণা করতাম। আমরা এত মজা করছি, হুল্লোড় করছি, আর বাবা সারা জীবন পড়ে আছেন চায়ের বাগানে। আগে আসামে ছিলেন; ছেলেবেলায় আমিও আঁকপাঁক করতাম বাগানে কিছুদিন থাকলে। সময়ে সব পাল্টে যায়, না মাসীমা?

—হ্যাঁ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।

—আমি ওরকম ভাবি না। আমার মনে হয় সময় আমাদের শেখায়। আমরা সময়ের কাছ থেকে শিখি।

স্বর্ণসুন্দরী উসখুস করে বললেন,—তুমি আবার কবিতা টবিতা লেখো না তো?

সুধীর অবাক হয়ে বললে,—কবিতা? না না, সাত জন্মে কবিতা লিখি নি। যদি বলেন গাড়ির মেকানিক হতে পারি, টেনিস ট্রেনার হতে পারি। তবে কবিতা টবিতার মধ্যে নেই।

—যেরকম কথা বলছো আজকে আমার তো ভয় হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও কিনা।

সুধীর আবার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে।—সাধু আমি নই মাসীমা, সাধু মনা। কলকাতায় গেলেই কোনো মঠে যায়। সাধু সঙ্গ করে। তবে মাথাটা খুব পরিষ্কার মনার। দেখবেন, ও আমার চেয়েও ভাল বাগান চালাবে।

—যদ্দিন বয়স আছে আমোদ আহ্লাদ করে নাও। আমি হৈ হৈ পছন্দ করি, আমার মেয়েও।

—আপনার বড় মেয়ে?

—না, হেনা বরাবরই খুব শান্ত, বিচক্ষণ। আমার মেয়ে গৌরী একেবারে হুড়ো। ওকে বকতাম ছেলেবেলায় কিন্তু মনে মনে হিংসেও করতাম। আমিও ঐরকম ছিলাম ছেলেবেলায়। তুমি তো গৌরীকে দেখোনি। ও আসছে বড়দিনে। আমি লিখে দিয়েছি ওসব এসে টেমে হবে না।

—তাহলে চলুন, বড়দিনে একটা আউটিং করা যাবে।

—আমার জামাইও আসছে, বড় মেয়ে আসছে।

—বেশ তো! সুধীর আঙুলে চাবি জড়াতে জড়াতে উঠে পড়ে।

ভবনাথের জামাই, বড়মেয়ে, গৌরী বড়দিনের সুরুতেই তাদের লটবহর নিয়ে হাজির। গৌরী গত দু' বছরে আরও সুন্দর হয়েছে, কিন্তু একটু বিষণ্ণ, তার কলেজে হস্টেলের বন্ধুবান্ধর নিয়ে হৈ হল্লার জীবনে ছেদ পড়ায় গম্ভীরও! তার অনেকদিনের লাল ট্রাঙ্ক গাড়ি থেকে নামাতেই চোঙা চেঁচায়, দিদি, আমাদের সঙ্গে থাকবে রে, আর যাবে না।'

বড়মেয়ে হেনা অনেকটা লম্বা, আর কালো। চেহারায় গৌরীর ঠিক বিপরীত। ছটফটানি নেই, হাসিও ম্লান। আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে বড়বড় চোখে তাকায়। মুখের রেখা কোমল, খুব স্পর্শ-কাতর। নবুর বিয়েতে কদিনের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছিল। স্বর্ণসুন্দরী বড় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে

ধরে সশব্দে চুম্বন করেন।

জামাই মদন ঘোষের এখন বয়স চল্লিশ। কালো বেঁটে। রোগা, কিন্তু প্রচণ্ড এনার্জির আকর। সাত বছর জার্মানীতে বিয়ের আগে চার বছর, পরে তিন বছর। বি-ই কলেজ থেকে পাশ করে কিছুদিন চুন সুরকির দোকান দিয়েছেন ট্যাক্সি চালিয়েছেন, কানাঘোষা শোনা যায় জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তবে এখন সে অধ্যায় কেটে গেছে। এখন মদন ফিলিপ্স কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার।

মদন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁক দেয়, সাবধানে নামাবে, কাঁচের জিনিস আছে। স্বর্ণসুন্দরীর অনেক দিনের সাধ মদন পূর্ণ করেছে। দামী বিলিতি ডিনারের সেট এসেছে সঙ্গে।

খামচে খামচে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে শ্বশুরকে বললে,—বললাম, গাড়িতে আসব। কোন অসুবিধে নেই। আপনার মেয়ে রাজী হল না। আমার সম্পর্কে একেবারে কন্‌ফিডেন্স নেই।

ভবনাথ মৃদু হাসেন। জামাইয়ের গাড়ি হয়েছে অথচ তাঁর এখনও হয়নি। তাঁর বড় ছেলের সাম্প্রতিক অকৃতকার্যতার কথাও স্মরণে আসে। প্রতাপকে এতগুলো টাকা দিয়ে মাসে মাসে পুষতে না হলে ইতিমধ্যে তাঁর গাড়ি হয়ে যেত। কয়েকটা ইংরেজ প্লান্টারের কাছ থেকে অফারও এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী আবার আনন্দে থৈ থৈ করেন। নাতনি বুলু যে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে গৌরীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাকে কোলে টেনে নিয়ে হাঁক ছাড়েন—গোপীনাথ, গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।

সন্ধের পর দোতলায় বারান্দায় পারিবারিক মজলিশ বসে। এ মজলিশের চেয়ারম্যান স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথ দূরে ক্যাম্পচেয়ারে বসে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি একটু বেশী নীরব। প্রতাপের আই. সি. এস. পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং প্রায় বছর খানেক বছর দেড়েক টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পড়ার অনির্দিষ্ট তীর্থযাত্রা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। জোরাল আলোয় দেয়ালের গায়ে ফুলন্ত বোগেনভিলিয়া ঝলমল করে। সেদিকে চেয়ে তিনি টের পান যে তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য এবার হেলেছে পশ্চিমদিকে। যদি প্রতাপটা দাঁড়াত তাহলে আরও কিছুদিন বোধহয় খাড়া হয়ে থাকতেন।

জুরিখ থেকে টমাস মান এসেছিল আমাদের ক্লাবে মদন কথার তুবড়ি ফোটায়। একবার গৌরী আর একবার স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে আমাদের দেশের হেঁজি পেঁজি সাহিত্যিক না। নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, গয়টের ওপরে বললে। সে এক অন্য রকম দেশ মা, সব মানুষ কাজ করছে, সব মানুষ চিন্তা করছে, আমাদের দেশের মতো ঘুমিয়ে নেই।

গোপীনাথ আরও এক কাপ সুগন্ধ দার্জিলিং চা নিয়ে আসে। ডাঙ্কে ডাঙ্কে! উৎসাহের সঙ্গে পুরনো অভ্যাসে চেঁচিয়ে ওঠে মদন। তারপর শাশুড়ী ঠাকরুনের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করে।—জার্মানে ধন্যবাদ দিলাম। গৌরীর দিকে চেয়ে বললে, তোমাদের কি ছাতা ইংরেজী সাহিত্য পড়ায়? তাতে কোন কথার জোর আছে?' মদন নির্ভুল উচ্চারণে হাইনে আবৃত্তি করে। তাকে অন্যরকম দেখায়। ভবনাথও চম্‌কিয়ে সেদিকে চোখ মেলেন। তাঁর চাকরি ও পারিবারিক জীবনে এই ধূমকেতুটির আবির্ভাব মন্দ লাগে না। খানিক ক্ষণ পরে অবশ্য তাঁকে উঠতে হয়। রায় লিখতে বসেন বৈঠকখানায়।

স্বর্ণসুন্দরী কিছুই বোঝেন না। কিন্তু এই জুরিখ, বার্লিন, হামবুর্গের গল্প, সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ এক অপরিচিত গন্ধ রস বয়ে নিয়ে আসে। গৌরী ভক্তের মতো চেয়ে থাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে জামাইবাবুর দিকে। খালি হেনা প্রবল বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী দুতিনবার খোঁচা দিলেও তার কোন পরিবর্তন হয় না।—আমার মাথা ধরেছে শেষে বললে।

—আপনার মেয়ের কথা আর বলবেন না। ও যে কি চায়, বুঝি না। খালি সংসার করো, খাও দাও, ব্যস। আর কোন চিন্তা নেই, কোন আইডিয়া নেই। মদনের শেষ কথায় প্রতিবাদের একটা কাঁপুনি হঠাৎ হেনাকে নাড়া দিয়েই থেমে যায়।

স্বর্ণসুন্দরী মেয়েকে বলেন,—কিরে কিছু বলছিস না যে!

—বলছি মাথা ধরেছে!

বিরাট রুই মাছের মুড়োর ঘণ্ট তদারক করতে স্বর্ণসুন্দরী উঠে যান রান্নাঘরের দিকে।

জামাইয়ের জন্যে আউটহাউসে মুর্গী রান্নারও ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়মেয়ে উঠে পড়ে। গৌরী আস্তে আস্তে বললে,—আপনি দিদিকে অমনভাবে—

—সত্যি কথা বলার সৎসাহস আমার আছে গৌরী। তা ছাড়া কেন বলব না। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর মানসিক কোন যোগাযোগ নেই। কিচ্ছু না!

গৌরীর সুন্দর মুখখানায় আতঙ্কের ছায়া পড়ে। সে বুঝতে পারে এবার কথার মোড় কোনদিকে নেবে। এবং সেদিকেই নেয়। মদন বললে, এই যেমন ধরো তুমি। তোমাকে যে আমি ভালবাসি তার জন্যে তোমাকে তো সাতপাক দিতে হয়নি। আমাকেও টোপর পরতে হয়নি।

—আস্তে, মদন-দা আস্তে!

—আস্তে কেন? এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া ভাল। আমি ওসব মেয়েলি ন্যাকামী পছন্দ করি না। তুমি আমাকে সোজাসুজি বল, তুমি ভালবাসো কি না, বল। তুমি যা বলবে আমি মেনে নেব।

কিছু বলবার জন্যে গৌরীর পাতলা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কিন্তু তার মুখ থেকে কিছু ফুটবার আগেই মদন বললে,—তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো। তোমার ভয় হচ্ছে তোমার দিদির সংসার ভেঙ্গে যাবে, বুলুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এইসব ভাবছো। এইগুলো তো বাইরের কথা। এগুলোর সামনে আমরা দাঁড়াব কিন্তু অন্যভাবে। তুমি তো আমাকে ভালবাসো, এ ব্যাপারে তুমি নিজে আরও শক্ত হও। শুধু খুকী হয়ে থেকো না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক মানেই খুকী অথবা বুড়ী। তুমি এই দুটো টাইপ থেকে আলাদা হও।

গৌরী এই কথার ঝড়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে বুঝতে পারে না এটা ভালবাসা কি অন্য কিছু। কিন্তু যখনই নির্জনে মদন তাকে নিয়ে বসে এবং এইরকম কথা বলে তখনই তার বুক কাঁপে, ভয়ে উদ্বেগে অথচ এক অভূতপূর্ব আকর্ষণে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মদন তা জানে। মদন জানে যে গৌরীকে ডাক দিলেই সে তার কাছে চলে আসবে। এই অসহনীয় আকর্ষণের অদৃশ্য দড়িটা বারে বারেই ছিঁড়তে চেয়েছে গৌরী গত কয়েকমাস ধরে, কিন্তু বারে বারেই জড়িয়ে পড়েছে। গৌরী মাথা নীচু করে থাকে। তার বুক তোলপাড় করে। হাতের মুঠো শক্ত করে বলে—আমি বাবা-মা-র বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।

—কাওয়ার্ড, ইউ আর এ কাওয়ার্ড! মদন চাপা গর্জন করে। সেই খুকী, সেই এম-এ পড়া খুকী। আচ্ছা, আমাদের দেশটা কি চিরকাল এইরকম থাকবে?

গলার স্বর চড়িয়েই বলতে থাকে।—আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সব সময় বড় বড় কথা বলবে। অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের মনের কাছে কি জবাবদিহি করবে গৌরী? না, তার কোন প্রয়োজন মনে কর না? একে কি বলে জানো? ম্যাসোচিজম্। নিজের পিঠ ফুঁড়ে একরকম আনন্দ আছে না, সেই রকম। আচ্ছা, দেখো, আমি কি রকম পারিবারিক যূপকাষ্ঠে বলি! স্ক্যাণ্ডালাস্!

গৌরী পাথরের মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরীর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। চিকেন কাটলেট-টা ঠিক তোমার মনের মতো হবে না, বলে দিচ্ছি। আসতে আসতেই বললেন।

—বেশী পুর দিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।—সেরেছে! মদন জবাব দেয়।

তিন

পরদিন সকালে ছেলেদের শোবার ঘর থেকে একটা আওয়াজ খুব ঘন ঘন উঠতে থাকে। আজকে কী? চার্মার্চ! বারে বারে লাইনটা উঁচু নীচু খাদে উঠতে থাকে।—কান একেবারে ঝালাপালা করে দিলি। বুড়ী চেঁচিয়ে ধমক দেয়।

বাইরে দুটো গাড়ি এসে লেগেছে। সামনে সুধীরের চকোলেট রংয়ের বিরাট ফোর্ড গাড়ি। পেছনে আর একখানা বাদামি শেভ্রলে।

—সুধীরদা, আপনি একশো মাইল তুলতে পারবেন ? চোঙা জিজ্ঞেস করে।

সুধীর ভবনাথের সঙ্গে লনে বেড়াচ্ছিল শীতের রোদ্দুরে। টুটুল কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে,—আমি কিন্তু আপনার পাশে বসব।

চোঙা বললে,—আমিও।

—তোমার কি মনে হয় চায়ের শেয়ারের দাম উঠবে ? বাজারের যা অবস্থা তাতে তো কেনার কথা ভাবতেই ভয় করে, ভবনাথ বললেন।

—আমি বলছি মেসোমশাই আর দু'তিন বছরের মধ্যেই চড় চড় করে দাম উঠবে। আমরা কিনছি, আপনাকেও বলছি। কয়েকটা বাগানের নাম করে দিচ্ছি, সেই সেই কোম্পানির কিনবেন।

—প্রতাপটার জন্যেই সব চলে যাচ্ছে।

—বেশী করে কিনুন।

—আমার গরম জল হয়েছে ? গোপীনাথ ? ওপরতলা থেকে মদনের হাঁক আসে। কিছুক্ষণ পরেই একটা একটা করে মাল গাড়িতে তোলা হয়। খাবারের ঝুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, ছোট বেডিং।

—মাসীমা কি বিদেশ যাচ্ছেন নাকি ?

স্বর্ণসুন্দরী বারান্দায় আসতেই সুধীর বললে।

—বড় বেডিংটা তো নিলাম না।

—বেডিং নেবার কোন দরকার নেই। বলেই তো দিলাম মাসীমা। বাগানে সব পাবেন।

বুড়ী এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। পানুদা পর্বের পরে বুড়ী কিন্তু বিশেষ পাল্টায়নি। ঘাড় কাত করে দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী সে আয়ত্ত করেছে, তার অন্যান্য দু বোন থেকে তা আলাদা। কলার তোলা কমলালেবু রংয়ের সোয়েটার আর খাটো নীল স্কার্টের সঙ্গে সাদা হাই হিল তোলা জুতোয় সে একটুকরো কমলা-নীল-সাদা পাথরের দীপ্তিতে ঝলকায়। সুধীরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে এমন ভাবে তাকায় যেন তা শত্রুপক্ষ পর্যবেক্ষণ। পানুদা যে হাওয়ায় কর্পূর হল তার কারণ সুধীরদা। সুধীরদা কোন ট্যাঁফো করবার অবকাশ দেয়নি, ভাল ভাবে বিদায় নিতে পারেনি পানুদা, (গলার কাছে একটা ব্যথা নড়েচড়ে ওঠে বুড়ীর)। পানু-দাকে লোকটা গিলে ফেলেছে। তারপর সে আরও টের পায় লোকটার ঘন ঘন আগমন, তার মায়ের উৎসাহ এ সমস্ত ব্যাপারের পেছনে দিদি আছে। এই গোপন কথাটা হাবেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বুড়ীর কাছে ঢাকা পড়েনি। বুড়ী আরও একবার চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ীখানার পাশে লম্বা পাজামা-পাঞ্জাবী-পরা লোকটার দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটে। বলাই একবার বলেছিল না তাঁর মাকে যে মা আঁচে বাঘ ধরে, বুড়ীও তা পারে। মৃদু হাসির রেখা তার মুখের কোণে জেগে মিলিয়ে গেল। সোজা পায়ে নেমে এসে সুধীরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—আমি আপনার গাড়িতে যাব।

সুধীর অবাক হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, ঠিক এলেবেলে নয়। এক মুহূর্তে মনে আসে পানুর আত্মপক্ষ সমর্থনে মরীয়া যুক্তি।—আমি প্রথমে কিছু করিনি, সুধীরদা। ঐ আমাকে...

—বেশ তো, অনেক জায়গা আছে।

এবার গৌরী হেনার পেছনে পেছনে আসে। লাল জংলা সিল্কে ঝলমল করে। মাথায় সাদা বুটিদার নীল সিল্কের স্কার্ফ, চোখে গগলস্। তার ফর্সা খেলোয়াড়ি হাতে ব্যাগটা ঝোলাতে ঝোলাতে যখন শীতের রোদ্দুর-ঢালা সিঁড়ি দিয়ে নামে তখন সুধীর সেদিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট সুধীর একটু যে না ঘাবড়ায় তা নয়। চা বাগানের বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দূরে নীল পাহাড়ের গা থেকে গড়িয়ে-নামা চায়ের ঝোপের সারির ওপর সাদাটে শুকনো একহারা গাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বিকেলের পর বিকেল কাটানো কি তার পক্ষে সম্ভব হবে ?

পেছনে হেনা একেবারে বৈপরীত্যের ছবি। ভীষণ আত্মসচেতন, কাঁচুমাচু। সে যে আজ একটু সেজেছে, মানে নীল জর্জেট পরেছে, একটু হাল্কা করে লিপস্টিকও লেবড়েছে ঠোঁটে তা যেন আবিশ্ব মানুষের দ্রষ্টব্য। তার স্বাভাবিক শান্ত বিষাদ-ভরা চেহারাখানা লাজুক হাসিতে

ঢেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে জুতোতে ঠোক্কর খায়।

—কি যে করো ! সবটাতে তাড়াহুড়ো। মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছো না কি !

গলা উঁচু সাদা পুরোহাতা জার্মান পুলওভার পরা বেঁটে লোকটা দরজা থেকে বেরিয়েই চড়ুই পাখীর মতো তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়।—থার্মোস-টা এনেছো গৌরী, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমার রাগ-টা তুলে দিয়েছেন তো মা ? বুড়ী, বুড়ী, মাই ডার্লিং।

কৌতূহলী সুধীর এই সাদা জামাটে চড়ুই পাখীটার দিকে চেয়ে মজা পায়। বলে—আপনি স্যার আমার গাড়িতে আসুন।

—চলুন, চলুন ! আমরা একবার ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলাম ফ্রাউ ক্রুয়েগারের সঙ্গে। বাব্বাঃ সে কি পার্টি ! সারারাত ধরে হোটেলে নাচগান। ওরা কাজও করতে পারে, ফুর্তিও করতে পারে।

সব মাল দুটো গাড়িতে তোলা হলে গোপীনাথ হাজির হয়। ধোক্কড় পুরনো মেটে আলেস্টার (বোধহয় হেনার ছিল) তার বেঁটে শরীরটা এমনভাবে ঢেকেছে যে তার খাটো ধুতি মালুম হয় না। পায়ে বাবুর পুরনো বুটজুতো, হাতে টিফিন কেরিয়ার। স্বর্ণসুন্দরী হাঁকলেন,—মদন, তুমি আমার পাশে এসে বসো, তোমার জার্মানীর গল্প শুনতে শুনতে যাব।

মদন উৎসাহিত হয়ে শাশুড়ীর পাশে বসে। স্বর্ণসুন্দরী চোখের ইসারায় গৌরীকে সামনের গাড়িতে উঠতে বললেন। স্ত্রী শাশুড়ি এবং সামনের সীটে শ্বশুর মশাই থাকাতে মদন কেমন থমথমে মেরে যায়।

সামনে তিস্তা, ধু ধু বালি। বিচালি বিছানো পথে নীচু গীয়ারে কোঁ কোঁ করে গাড়ি দুটো দু'মাইল পার হবার পর ঝকঝকে নীলচে পাহাড়ী জলে পাটাতনফেলা দুখানা বজরা। গাড়ি দুটো যখন তাতে তোলা হয় তখন অনেক দূরে ছেড়ে আসা ওপারে একটা নির্জন খেজুর গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে বুড়ীর সমস্ত মনটা টলমল করে ওঠে। তারা তখন নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে। চোঙা বুড়ীকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে বললে,—তুই কি ভাবছিস বুড়ী বলে দেব ? তারপর বুড়ীর জবাবের অপেক্ষা না রেখেই আঙুল দেখিয়ে বলে,—ঐ খেজুর গাছটা, না রে ?

—ভাগ ! বুড়ী আবার তার সীটে গিয়ে বসে।

তিস্তার ওপারে পড়েই গাড়ি হু হু করে ছোটে। চমৎকার ডুয়ার্সের রাস্তা শীতের রোদ্দুরে ঝকঝকে ফাঁকা। এক-আধটা লরী যায় কয়লা নিয়ে চা বাগানের দিকে, উল্টো দিক থেকে কখনও কখনও ছুটন্ত প্রাইভেট গাড়িতে লাল মুখ। দু-তিন ঘণ্টার পর জঙ্গল শুরু হয়। ঘন সবুজ মোটা-গুড়ি দীর্ঘ শালের সমারোহের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। উৎসাহে চোঙা চীৎকার করে,—আরও জোরে, সুধীর-দা, আরও জোরে।' উৎসাহে গৌরীও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্পীডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে। বাইরে মাঠঘাট বনজঙ্গল কালভার্ট টেলিগ্রাফের তার শুধু সাদা লাগে। সেভেন্টি, সেভেন্টি, সেভেন্টি-ফাইভ এইট-টি। এইট-টি হয়েছিল সুধীরদা ? মুহূর্তের আশী মাইল স্পর্শ করেই নামতেই থাকে কাঁটা। সামনে কালভার্ট, সত্তর, ষাট, শেষে পঞ্চাশে ছোটে। উৎসাহে-উদ্দীপনায় বুড়ী গৌরী টুটুল সবাই সোরগোল তোলে। আশী মাইল গতিতে তারা ছুটেছিল এই কৃতিত্বের শরিক তারা সবাই এ রকম মনোভাব তাদের চীৎকারে হাসিতে কথাবার্তায় প্রকট। বুড়ী তো প্রায় সুধীর-দার প্রেমে পড়ো পড়ো। স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে এক সমাহিত যৌবনের প্রতিমূর্তির মতো সুধীরদা, তার পাশে পানু-দাকে অনেক ফিকে লাগে। পানু-দাকে কখনও ভাবাই যায় না এই রকম ভূমিকায়, পানু-দা যেমন সব সময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে এই শাল পাইনের সমারোহে। এই শীতের উজ্জ্বল সকালে পানু-দাকে আবার ফিরে পেলে কেমন হত ? এ রকম চিন্তা কাঁটার মতো বুড়ীকে বেঁধে, কিন্তু বুড়ী টের পায় সে ব্যথা অনেক ভোঁতা হয়ে এসেছে কয়েক মাসে। আর বোধহয় কয়েক মাস গেলে সেটা কেবল বাল্যকালের ঘটনা হয়ে থাকবে এ রকম আন্দাজ করতে পারে।

গৌরীও মাঝে মাঝে চোখ ফেরায় সুধীরের দিকে। সে যে খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে তা নয়। বলতে কি, মদনের প্রতি তার আকর্ষণ এখনও অটুট কিন্তু সে আকর্ষণের ফলাফল ভাবতে তার মাথা ঘোরে। গত দু তিন বছরে ব্যাপারটা খুব পেকে উঠেছে। বিশেষ করে জার্মানী থেকে

প্রত্যাবর্তনের পরই মদন তার এই শালীর মধ্যে ইউরোপীয় নারীর মানসিকতা ক্রমশ আবিষ্কার করতে থাকে। কিন্তু গোরী বুঝতে পারে এটা শুধু মদনের তাত্ত্বিক আকর্ষণ নয় (যা সে প্রায়ই বোঝাতে চায়)। সবচেয়ে তার অবাক লাগে তার দিদির কথা ভেবে। দিদি তার মা-কে বলেছে সব কথা, এটা স্বর্ণসুন্দরী তাকে আঁচ দিয়েছে। কিন্তু দিদি কেন তাকে ভয় করে? কেন ব্যাপারটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলে নি এতদিন? এজন্যে দিদির প্রতি করুণা জাগে। কেমন এক ভারী অব্যক্ত বেদনার রূপ হয়ে দিদি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু তাকে কিছু বলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, শেষে মা-কে সেকাইত করে একটা সীন করেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে গোরী পালিয়ে যেতে চায় আর তা যদি সম্ভব হয়, সুধীরের হাত ধরে তাহলে তাই করবে।

দুপুর গড়িয়ে এলে তারা লাটাগুড়ি জঙ্গলে এল। বড় রাস্তা ছেড়ে সুধীর যখন গাড়ি নিয়ে ছোট রাস্তা ধরে জঙ্গলের ভেতরে এসে পড়ে তখন চারপাশের নৈঃশব্দ্য অন্ধকার এবং ঠান্ডা গাড়ির ভেতর কথাবার্তা চীৎকার থামিয়ে দেয়। পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ি এগোতে থাকে, তারপর খোলা এক জায়গায় এসে থেমে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নেমেই হাঁক দেন,—গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।

সুধীর ও স্বর্ণসুন্দরীর মানা সত্ত্বেও ছেলেরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। ভবনাথ মোড়ার ওপর বসেছেন। তাঁর প্রায় গায়েই অর্কিড-মোড়া বিশাল শালের গুঁড়ি। এ অঞ্চলের গাছগুলোর গুঁড়ি দুটো লোকের হাতের বেড় থেকেও বড়। সেই ঋজু পঞ্চাশ ষাট বছরের অটুট শক্তির ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বস্তুত তিনি তাঁর শক্তির শিখরে। গত দু' বছরে স্বাচ্ছল্য অনেকখানি বেড়েছে। এখন আর টি-এ বিলের জন্যে তাকিয়ে থাকতে হয় না। চাকরী জীবনেও লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। পাবনা বাড়ির অহরহ খাঁই খাঁই এখন শান্ত। ভাইপো ভাগ্নেরা গড়িয়ে গড়িয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আর এ ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণও ঢিলে। কাজেই মানসিক ঝামেলা থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে দেখতে পান যেন অস্তাচলে পূর্ণশশী। তিনি ঢলে পড়েছেন তাঁর সমস্ত বৈভব সত্ত্বেও যেমনভাবে তাঁর প্রতাপশালী বাবা অস্তে গেলেন। ভবনাথ এই বিষণ্ণ চিন্তা থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করেন। একটা কাঠবেড়ালী অর্কিড মোড়া গুঁড়িটার গা বেয়ে নেমে ঠিক তাঁর মোড়ার সামনে দুপা তুলে তাঁকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে জঙ্গলের পথ ধরে মিলিয়ে যায়।

গোরীর দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন,—বাজনা নিয়ে এসেছিস?

গোপাল মাস্টারের কাছে শেখা বিদ্যেটা গোরী এখনও ছেড়ে দেয়নি। গাড়ি থেকে বেহালার বাক্স বেরোয়। তারপর গোপালমাস্টার যেভাবে শিখিয়েছিল তেমনি চিবুকে যন্ত্র লাগিয়ে গোরী রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।'

মন্দ লাগে না, পিৎসিকাটো দিয়ে বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবনাথের পিপাসিত কানে আরাম দেয়। তিনি তাঁর চারপাশে এই রকম সামান্য আরাম চেয়ে এসেছেন সারা জীবন, তার বেশী কিছু চান নি। তাঁর বাপের আদর্শবাদ, পৌরুষের পরীক্ষা তাঁর পছন্দ নয়। এমনকি পারিবারিক খ্যাঁচ-গুলোও তিনি ভুলে থাকতে চান। তাঁর জামাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে স্ত্রী কয়েকদিন তাঁকে খুঁচিয়েছেন, সোজাসুজি মদনকে ধমকে দিতে বলেছেন কিন্তু তিনি বিশেষ গা করছেন না। বয়স্ক লোক নিজেরা বুঝতে পারবে। মদন যদি নাও পারে, গোরী পারবে। গোরীর হাতে ছড়ের ওঠা-নামা দেখতে দেখতে মনে হয়, সে নিশ্চয় এ ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর গোরীও বাজাতে বাজাতে এক আধবার তার বাপের দিকে চোখ তোলে। এবং চোখ তুলে বুঝতে পারে। এতদিন মনের মধ্যে যে ইচ্ছেটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল, সেটা যেন বেহালা বাজাতে বাজাতে তার আঙুলের মধ্যে দিয়ে এসে এক জায়গায় জমা হয়। আর ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া যাবে না—না! হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষিদের মাত্রা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, কড়াইশুটির ঘুগনি আর ডিমভাজা কম পড়ে গেল। স্বর্ণসুন্দরী বেশী করে মুড়ি দিয়ে মেখে ম্যানেজ দিলেন। বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, চোঙা তার আধখানা ডিম খেয়ে ফেলেছে। তারপর সুধীরদা কি ভাববে না ভেবেই খপ করে এক মুঠো ঘুঘনি চোঙার ডিশ থেকে তুলে নিলে। স্বর্ণসুন্দরী একহাতা ঘুঘনি দিয়ে চোঙাকে শান্ত করলেন।

চোঙা বললে, সে ভালুক দেখেছে। কালো, রোঁয়া-রোঁয়া।

—ওটা কুকুর চোঙা, এঁটো খাবার জন্যে এসেছে, সুধীর বললে।

—আপনি সেটা দেখেননি। নির্ঘাত ভালুকের বাচ্চা!

চা খাবার পর যখন সাজসরঞ্জাম তুলবার পালা তখন ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিকে ছিটিয়ে পড়ে। সবচেয়ে এগিয়ে যায় টুটুল। একটা বাঁক নিতেই সে সকলের থেকে আলাদা অদ্ভুত জগতে এসে পড়ে। একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। দিনের বেলাতেও রোদ এসে পড়েনি। একদিকে কতগুলো পাইন, গা ভর্তি ঝুলন্ত মসের দাড়ি নিয়ে চুপচাপ। ঠান্ডা ভেজা এক খয়রি সবুজে অন্ধকারে একলা একলা দাঁড়িয়ে তার গা শির শির করে। এখানে যেন কোনদিন কোন মানুষের পা পড়েনি, এইরকম আবিষ্কারের শিহরণে টুটুল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে। খুব কাছেই গলার আওয়াজ। দিদির গলা, মেজদির আর কার? আর সেই জামাইবাবু, যার জন্যে বাড়িতে রান্নাবান্না শোরগোল। গলার আওয়াজ এদিকে আসতে আসতে থেমে যায়।

—ছাড়ো, আর না! সবাই দেখবে। আড়ষ্ট ব্যথা ও আনন্দে অবসন্ন গোরীর গলায় টুটুল আবার চমকে ওঠে। এক অদৃশ্য আকর্ষণে একপা একপা করে এগিয়ে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জামাইবাবু মেজদিকে কিরকমভাবে যেন খামচাচ্ছে, আর মদনের আলিঙ্গনে আঁকপাঁক করছে গোরী, যেন সে ছুটে পালিয়ে যাবে, অথচ পারছে না। টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাস আগে আর একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ী আর পানুদার আলিঙ্গনে আবদ্ধ মূর্তি দুটো পরিষ্কার ভেসে ওঠে তার মনে। একবার ভাবলে এখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঐ একই রাস্তা দিয়ে ফিরতে হবে, সামনে আরও ভিজে অন্ধকার, আরও ঝিঁঝির শব্দ।

—এবারে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হবে গোরী। আর কচি খুকিমো কোর না। ফর হেভেন্স সেক্। আমরা এখনও দুজনে নতুন সংসার গড়তে পারি।

গোরী হঠাৎ হাতের মুঠি শক্ত করে লাফিয়ে ওঠে।

মদনের গলা বিকৃত শোনায়,—বুঝতে পেরেছি, এখন ঐ মাকড়াটার দিকে তোমার নজর পড়েছে। হি উইল বি এ ডাল কম্পানি, আই টেল ইউ। তোমার মা-ও তোমাকে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। সাবধান, আমি বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।

গোরী শেষ কথা শুনবার আগেই এগিয়ে যেতে থাকে, আর পেছনে পেছনে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে মদন।

এতক্ষণ এই নির্জনতার যে অপরিচিত আনন্দের স্বাদে মুগ্ধ লাগছিল টুটুলের, তা কোথায় পালিয়ে যায়। বড় হওয়া মানেই কি এইরকম হওয়া? এইরকম চিন্তা মাথায় নিয়ে আরও সকলের সঙ্গে টুটুল গাড়িতে ওঠে।

লাল আর সাদা বোগেনভিলিয়ায় মোড়া ঝকঝকে সাদা দোতলা কাঠের বাড়িটার সামনে বাগানে সারি সারি তক্তায় বসানো টবে রকমারি ফার্ন, কেয়ারিতে গোলাপ হাওয়ায় দোল খায়। কাঠের সিঁড়ির মুখে বিরাট পিতলের গামলায় বসানো দেয়ালেতোলা গাছটা থেকে সাদা একটা গোলাপ টপ করে তুলে নিয়ে গোরী চুলে গোঁজে। বাথরুমে কলে গরম জল। মুখ হাত ধুয়ে আলোয় ঝলমল বারান্দাতে ছেলেরা সোরগোল তোলে। কাঠের সিঁড়িতে ছোটাছুটিতে এত আওয়াজ ওঠে যে ভবনাথ পর্যন্ত হাঁক দেন। প্রচুর খিদে এবং প্রচুর ভাল খাওয়ার সমাবেশ। নিরামিষ, আমিষ, মিষ্টি, কোন কিছুর বাদ নেই। এমন ভাল খেয়ে দেয়ে লেপের মধ্যে সিঁধিয়ে সকালে ঝকঝকে রোদ্দুরে বারান্দা থেকে সামনে দিগন্তবিস্তৃত চা-ঝোপের ঘন সবুজ গালিচার দিকে চেয়ে চেয়ে গোরীর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না।

নীচ থেকে বুড়ী চীৎকার করে ডাকে,—দিদি আমরা ফ্যাক্টরি দেখতে যাচ্ছি সুধীরদার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি নেমে এসো।

গোরী দেখলে সবাই প্রস্তুত কেবল স্বর্ণময়ী, দিদি ও মদন ছাড়া। টুটুলের সঙ্গে দিদির মেয়েটা তাদের মাথা-সমান কসমস ঝাড়ের এদিক-ওদিক লুকোচুরি খেলছে। সুধীর একটা গলাঢাকা হাল্কা হলুদ উঁচুগলা পুলওভার, কালো পেন্টুলুন এবং হাতে ছোট ছড়ি নিয়ে সামনে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সঙ্গে ভবনাথ। খাকি হাফপ্যান্ট, গরম কোট, পুরো মোজা, বয়সটা

আরও কমে গেছে তাঁর। স্বাভাবিক চামড়ার লালিত্যে আর গত রাত্রির পরিপূর্ণ বিশ্রামে সেই রাণাঘাটের এস-ডি-ওর মতো লাগে। তাঁর হাতেও ছড়ি। ছড়ি তুলে গৌরীকে আহ্বান করলেন।

—আমি আর এখন যাব না। বেশ লাগছে। গৌরী বললে।

তারপর বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে রোদ্দুরে টুলের ওপর পা তুলে সে ব্যাগ থেকে টমাস হার্ডির উপন্যাস বার করে পড়তে শুরু করে। মাঝে মাঝে চায়ের গালিচা যেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে সেদিকে, আর মাঝে মাঝে চায়ের ঝোপের ওপর সারি সারি সাদাটে হাড়-গিলে গাছগুলোর তীক্ষ্ণ শোভা দেখতে দেখতে সে ডুবে যায় গত শতাব্দীর মেষচরানো ওয়েলসের অখ্যাত গ্রাম্য জগতে যেখানে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ঘরের প্রেম এক অদ্ভুত অবাস্তব সমন্বয়ে তাকে আকর্ষণ করে। কতক্ষণ সে এই স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেয়াল নেই, নীচতলা থেকে স্বর্ণসুন্দরীর শাসনে গমগমে গলায় হঠাৎ ধড়মড়িয়ে ওঠে। স্বর্ণসুন্দরী আবার হাঁকেন,—গৌরী, একবার নীচে শুনে যাও তো।

সাধারণত স্বর্ণসুন্দরীর আত্মপ্রত্যয় এত বেশী, যে ছেলেমেয়েদের নীচুগলায় ডাক দিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর ডাকে একথা স্পষ্ট যে এ ডাক যতই নীচু খাদে হোক তা উপেক্ষার নয়। খুব চেঁচা-মেচির মধ্যে যে অসহায়তা স্বর্ণসুন্দরীর হাবভাবে তা মোটেই নেই। কিন্তু মায়ের এই অস্বাভাবিক চড়া গলায় গৌরীর বুক কেঁপে উঠল। তাহলে মদন...ব্যাপারটা !—এরকম চিন্তার ধস্ হুড়মুড় করে নেমে তার এতক্ষণের স্বপ্ন অকস্মাৎ অবলুপ্ত করে। পা টেনে টেনে সে নেমে আসে নীচে।

নীচে চায়ের টেবিলে স্বর্ণসুন্দরী অপেক্ষা করছিলেন এই মুহূর্তটির জন্যে। মোটামুটি তিনি যেভাবে ছকেছিলেন আগে থেকে ঠিক পর পর গত কয়েক মিনিটে তাই ঘটে গিয়েছে। টেবিলের নীচে ভাঙা চায়ের পেয়ালা, ডিস। বেয়ারা সরাতে এলে তিনি তাকে ঘরে আসতে নিষেধ করলেন। আর সামনে হেনা ম্লান বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো। কখনও ঘাড় হেঁট করে, কখনও চোখ দুটো স্বামীর চোখের দিকে স্থিরভাবে রেখে, পরমুহূর্তেই নামিয়ে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে শেষ-পর্যন্ত এক অতিবিসদৃশ অসোয়াস্তির চেহারা হয়ে লেবড়ে থাকে চেয়ারে।

মদনকে দেখায় অগ্ন্যুৎপাত—শান্ত কিন্তু ধূমায়িত গিরি। সামনে একটা চায়ের কাপ উল্টে আছে। কিন্তু মদনের দৃষ্টি সেদিকে নেই। ঝিম মেরে বসে আছে তার ড্রেসিংগাউনের মাঝখানে তার ছোট পাখীর মতো মাথাখানা যতদূর সম্ভব সেঁধিয়ে।

স্বর্ণসুন্দরীই কথাটা তুলেছিলেন। ভবনাথ সুধীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাগানে যেতেই বললেন, মদন, তুমি যেও না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তারপর বিবর্ণ বড়মেয়েকে একবার প্রবল অবজ্ঞায় আপাদমস্তক দেখে বললেন, তুমি এসব কি করছো মদন ? তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে ?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে বলছেন ? মিহি সাবধানী গলায় মদন জবাব দেয়।

—তোমাকে না কাকে বলব ? গৌরীকে ছেলে-মানুষ পেয়ে তুমি যা-তা করছো। তোমার লজ্জা করে না ? ছিঃ !

প্রবল অবজ্ঞায় এবং অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তায় টলমল করেন স্বর্ণসুন্দরী। তাঁর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কপালের ওপর চুলের গুছি এসে পড়ে। পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে এমনভাবে মদনের দিকে চেয়ে থাকেন যে উত্তর দিতে গিয়েও উত্তর গলায় আটকে যায় মদনের। হঠাৎ বিকট চীৎকার করে মদন, আমি গৌরীকে ভালবাসি। গৌরী আমাকে ভালবাসে। ওকে ডাকুন। ও সবাইয়ের সামনে বলবে।

—চুপ করো, চুপ করো। ওসব ভালবাসার ঢং আর এ বয়সে সাজে না।

—আমার বয়স......

—তাছাড়া গৌরী আমাকে সব বলেছে। তুমি আমার বড়মেয়ের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছো, আমার সঙ্গে করেছো, এখন গৌরীর সঙ্গে করতে চলেছো।

—বেশ করেছি, বেশ করেছি ! জন্তুর মতো আওয়াজ করে সামনের বড় ডিশটা ঠেলে দেয় মদন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেয়ালা ডিশ ঝন্ ঝন্ করে মেজেতে ভাঙে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় মদন।

—চমৎকার। আমার উপযুক্ত জামাই বটে। সাত হাজার টাকা যৌতুক দেওয়া জামাই। তুমি

এখন কি করবে মদন ? হেনার সঙ্গে থাকতে পারলে না, গৌরী তোমার মুখে—প্রবল অবজ্ঞায় প্রবল অসভ্য কথা বলে ফেলেন স্বর্ণসুন্দরী। মদনও স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারপর নিজেকে সামলিয়ে বলে, গৌরীকে ডাকুন। ও নিজের মুখেই বলবে।

—তোমাকে বলতে হবে না। অ্যাদ্দিন ভাবতাম, তোমার মধ্যে পদার্থ আছে। তুমি যে তলে তলে মেয়েটাকে ফুসলাচ্ছো তা যদি জানতাম আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোমাকে ভিড়তে দিতাম না।

মদন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। —আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

—দাঁড়াও। গৌরীকে ডাকি।

কাঠের সিঁড়ির হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে গৌরী নামে। সে তখন আশ্চর্য রূপান্তরিত। মদনকে নিয়ে যে বিরাট টানাপোড়েন চলেছে তার জীবনে তা থেকে সে যেন সরে এসেছে। জীবনের এক পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌরী। বর্তমান এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। তাই খাওয়ার টেবিলের সামনে গিয়ে সে অবলীলাক্রমে বলতে পারল, মা, ডাকছো ?

আর তার দিকে চেয়ে স্বর্ণসুন্দরীও চোখ কুঁচকান। একবার একটু ইতস্তত করে বলেন, তুমি, তুমি মদনকে ভালবাসো ?

গৌরীর পাতলা লাল ঠোঁটে হাসি খেলে।—বাঃ ভালবাসব না কেন ?

কিরকম প্রহেলিকার মতো তার এ আত্মজিজ্ঞাসা শোনায় তার মায়ের কাছে। মদনও তার সরু গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে ওঠেন, ছেলে খেলা কোর না গৌরী। আমি তোমাকে যা বলছি তার ঠিক জবাব দাও। মদনকে তুমি সত্যিই ভালবাসো ?

গৌরী এমনভাবে মায়ের দিকে তাকায় যে স্বর্ণসুন্দরী চোখ ফিরিয়ে নেন। এ যেন ঠিক সে নয় যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা গেছে, যাকে বুকে দেওয়া যায় সবরকম, যার কষ্টে প্রাণপাত করা যায় আর যার আনন্দ মনে হয় নিজেরই কীর্তি। গৌরীর চাহনিতে সেই একাত্মতা অনুপস্থিত। আর প্রত্যেক সন্তানের কাছেই প্রত্যেক জনক জননীর হেরে যাওয়ার সেই পুরনো নাটক নিজের প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনে আবার ঘটতে দেখে স্বর্ণসুন্দরী প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। গৌরী মায়ের দিকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকায়। তাকে এই চায়ের টেবিলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার মা যে অপার ক্ষমাশীল বিচারপতির অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে সে কথা মনে করে তার ব্যঙ্গ আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মদনের দিকে চোখ ফেরায় গৌরী। খুব জোড় পুতুলকে লাগে মদনকে আসামীর ভূমিকায়। গৌরী হঠাৎ হাই তোলে। দিদির দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, মদন-দা খুব পণ্ডিত লোক, অনেক ব্যাপার জানে। কিন্তু কেমন যেন ! গৌরী হেসে ফেলে।

—ছিঃ ! মদন দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললে।

—শুনেলে তো, শুনেলে ? স্বর্ণসুন্দরীর গলায় চাপা উল্লাস। তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসে।

আর গৌরী আস্তে আস্তে মায়ের পাশে চেয়ার টেনে বসে। হেনাও আতঙ্কে তার বোনের দিকে তাকায়। তাহলে স্বচক্ষে সে যা দেখেছে তা কি তার মতিভ্রম ?

—আর চা আছে ? অলাগোছে কথাটা বলেই এক কাপ চা ছেঁকে নেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে মদনের দিকে চেয়ে থাকে। আর সে রক্তে রক্তে বুঝতে পারে সময়ের কি প্রবল প্রতাপ। সময় এক-দিন তার শরীর এবং মদনের শরীর একত্রে বেঁধেছিল, তারপর সময়ের চাপেই সে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এখন সে মুক্ত। সেই নতুন মুক্তির আনন্দে গৌরী ভেতরে ভেতরে কলমল করতে থাকে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মদন, আমি জানি গৌরী তোমার ঐ ট্যাকা-টার দিকে নজর পড়েছে।

—মদন ! আমার বাড়িতে এ ধরনের কথা আমি সহ্য করব না।

—বেশ ! ঠিক আছে। বুলু, বুলু ! মদন লাফিয়ে উঠে মেয়ের নাম ধরে চেঁচাতে থাকে।

—বুলু তো বেড়াতে গেছে টুটুলদের সঙ্গে, নির্লিপ্ত গলায় গৌরী বললে।

—বেশ, আমি একলাই যাচ্ছি।

—আমিও যাব। হেনাও দাঁড়িয়ে ওঠে।

মেয়ে জামাই বেরিয়ে গেলে স্বর্ণসুন্দরী চুপ করে বসে থাকেন গৌরীর সামনে। নিজের কাছে

নিজের বয়েসটা আরও বেশী লাগে। গৌরী চুপচাপ চা খায়।

—চা ঠান্ডা না? একটা কিছু কথা বলবার জন্যেই কথাটা বলেন স্বর্ণসুন্দরী।

এবার গৌরীর হাসির রেখায় যেন মমতারও ছাপ আছে। কাপটা নিঃশেষ করে বলে, ঠান্ডা চা খেলে মা রং ফর্সা হয়।

পাতা ছাঁটার কাজ চলেছে। সবুজ সতেজ চা ঝোপের মখমল এক এক জায়গায় বেঁটে হাড়-গিলে খোঁয়াটে চেটাল খোঁটার সারি। এরকম মুড়িয়ে নেড়া করে দেওয়া কাজ বুড়ীর অপছন্দ। বলে, এতোগুলো চায়ের পাতা কেন মিছিমিছি নষ্ট করছো সুধীরদা।

চা ঝোপ ছাঁটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুধীরের মন্তব্য তার মনঃপূত হয় না। হাটতে হাঁটতে তারা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পায়ে চলার রাস্তা জুড়েই নেপালী ছেলেমেয়েগুলো গোল হয়ে বসে জিরোচ্ছে, চায়ের সংগে খাচ্ছে ভুট্টার খই। চোঙা পাশে দাঁড়াতে একটি তরুণ দুহাত জড়ো করে এক মুঠো খই দেয়। এরপর খানিক চড়াই উৎরাই। ডুয়ার্সের বাগান হলেও এ বাগানের একটা দিকে শ্যামল পাহাড়, জ্বালানির জন্যে গাছপালার ওপর আক্রমণ এখনও শুরু হয়নি। সেই ওঠানামা রাস্তায় অভ্যস্ত হাল্কা পায়ে সুধীর এগিয়ে চলে আর মাঝে মাঝে ভব-নাথের দিকে চেয়ে বলে, কাকাবাবু, অসুবিধে হচ্ছে না তো। ঐ যে আমাদের ফ্যাক্টরী দেখা যাচ্ছে। সবুজের মাঝখানে নতুন করোগেটের টিনের গাঢ় নীল রুপোলী রোদ্দুরে ঝলকায়। চোঙা আর টুটুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুধীরদাকে দেখতে থাকে। সাবালকত্বের এই গতিময় শক্তিমান চেহারা তাদের অভিভূত করে। কবে সুধীরদার মতো বড় হব এ চিন্তা চোঙা আর টুটুলের মনে এক অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করে। বেশ কয়েক বছর ধরে টুটুলের মনে যে স্বপ্নের জগৎ ছায়া ফেলেছিল, এমনকি লাটাগুড়ি জংগলেও যা আবার ঘন হয়ে এসেছিল তা পালিয়ে যায়। ফ্যাক্-টরীতে চায়ের পাতা শুকানোর কলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সে কলকব্জাই দেখে না। এই বাগানের চায়ের পাতা ছাঁটাই, কলকব্জা চালানোর পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গলাতোলা হলুদ পুলওভার পরা লম্বা লোকটা যে এই সব চালাচ্ছে সে এক কর্মজগতের নতুন নায়ক। চোঙাকে বলতে পারে না কিন্তু বুড়ীর গা ঘেঁষে ফিসফিস করে বলে, আমরা কবে এমন বড় হব দিদি?'

ভবনাথেরও ভাল লাগছিল। বড়মেয়ের বিয়েতে বরপক্ষের সাতহাজার টাকার বায়নার মতো এক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন বায়না আসবে না। বড় মেয়ের বিয়েতে চোদ্দ হাজার খরচ হয়েছিল। গৌরীর বিয়ে নিশ্চয় আরও কমে সারা যাবে। তবে হাজার দশেকের কমে বোধহয় নামানো যাবে না। তাঁর সবচেয়ে প্রিয়কন্যাকে নিশ্চয় সবরকম দিতে থুতে চাইবেন স্বর্ণসুন্দরী।

—সামনের বছর ঐ টিলাটার ওপর আরও কয়েকটা কুলি কোয়ার্টার বানাচ্ছি, সুধীর তার সাদাপশমে ঢাকা ডান হাতখানা দিগন্তের একদিকে বাড়িয়ে দেয়।

—ঐ যে দেখছেন, ঐ বাগানটা—সানিভিউ—ওটা গত বছর কিনেছি।

এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে সমস্ত জগৎটাই সুধীর-দার রাজত্ব—একথা একই সংগে চোঙা আর টুটুলের মনে খেলে যায়। আর দিদির সংগে বিয়েটা ঘটে গেলে তাদের এসব জায়গায় হামেশা যাতায়াতের সূত্রপাত হবে এ সম্ভাবনায় দুজনেই পুলকিত। ঢ্যাঙা ফর্সা রোগাটে, তার বাপমায়ের সম্পূর্ণ অমিল চেহারা। বুলু হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আমিও তোমাদের সংগে আসব টুটুলদা।

পরিতৃপ্ত ক্লান্তিতে সারা গা ভারী করে তারা ফিরতেই স্বর্ণসুন্দরী ভবনাথ ও পরে সুধীরকে খাটো গলায় কি সব বললেন। তারপর বুলুর ডাক পড়ে ওপর থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই বুলু আমি যাব না, কিছুতেই যাব না বলে কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী দোতলায় গিয়ে দেখেন বিদেশী শহরের লেবেল আঁটা নীল সুটকেস্খানা মদন গুছোচ্ছে। সেদিকে এক নজর চেয়ে বললেন, আমরা খেয়ে দেয়ে সবাই বেরোচ্ছি। এখান থেকে চামাচির কমলাবাগান, তারপর বাড়ি। কাল কলকাতা গেলেই চলবে।

—আমি হেঁটে ফিরব, মদনের গলায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব স্পষ্ট।

—জংগলে অনেক বাঘ আছে। স্বর্ণসুন্দরী মদনের দিকে না চেয়ে বললেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাক খেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে আসতে হয়। সামনে খাদ, উল্টো দিকে জংগলে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োর গায়ে মেঘ। গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ ডান দিকে চোখ পড়ে কমলার বাগানের দিকে। বেঁটে গাছগুলো ঝুম ঝুম করছে ফলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিশোর-কণ্ঠের চেঁচামেচি ওঠে, ছুটোছুটি লেগে যায়। চোঙা আর টুটুল ক্রিকেট বলের মতো কমলা-গুলো ব্যবহার করে, গোপীনাথ এক লুংগি ভর্তি করে কমলা জোগাড় করে। তাছাড়া রকমারি থলেতে লেবু গাড়িতে ওঠে। ফেরার পথে ডুয়ার্সের ফাঁকা, ম্লান, চাঁদঢাকা রাস্তায় আবার তীব্র গতিতে গাড়ি দৌড়য়। অনেকক্ষণ 'আজকে কী? চামার্চি' স্লোগানের মতো চেঁচিয়ে টুটুল আর চোঙার গলা ভাঙ্গা। ভবনাথের অনুরোধে গৌরী গান ধরে,

> গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
> আমার মন ভুলায় রে।

যখন প্রায় মাঝ রাত্তিরে গেট পেরিয়ে গাড়ি বাড়ির সামনে এসে লাগল তখন শ্রান্তিতে ঘুমে সবাই টলমল। খুব বোঝা যাচ্ছিল না তাদের মধ্যে সেদিন সকালেই কোন বিভেদ বিরোধের নাটক অভিনীত হয়েছে। টুটুল যখন খাটে গিয়ে শোয় তখনও তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট হাসি খেলে। প্রায় ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে, আজকে কী? চামার্চি।

কালের কৌটিল্য ভবনাথকে স্পর্শ করেনি। মোটামুটি এক দৃঢ় নির্দিষ্ট সরল খাতে যৌবন জরা বার্ধক্য শৈশব কৈশোরের ধারা প্রবাহিত। এই আবহমানতায় কেউ যদি ডুবে থাকে তাহলে ভবনাথের মতে কপাল চাপড়াবার কারণ নেই কিংবা পরিবর্তনের জন্যে আঁকপাঁক করার কারণ ঘটে না। এই সরল নির্দিষ্টখাতে তার বংশধর প্রতাপের জীবন কেন বয়ে চলে না এ প্রশ্ন তাঁকে বিস্মিত ও আহত করে। উত্থান পতন সবই কালের লীলা একথাটা কোন গুরুজীর শিষ্য না হয়েও কি বোঝা যায় না?

আর কালের এই আবহমানতায় জীবনের এক নির্দিষ্ট ছক্ তাঁর মতে অপরিহার্য। এই ছকে যেমন উদ্দীপনার স্থান নেই তেমনি প্রয়োজন নেই উদ্ভ্রান্তির, কেবল মৃদু হাসি, অনুত্তেজ কণ্ঠ এবং এক কবোষ্ণ কৌতূহল নিয়ে এই উত্তপ্ত কোলাহলপূর্ণ জীবনের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের আর কি করণীয়? আর যেমন কোন কোন কবির কবিতা খোলে নির্দিষ্ট এক ছকের বন্ধনে তেমনি ভবনাথ তাঁর জীবনে এই নির্দিষ্টতায় মুক্তির স্বাদ পান। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সময়ের চেহারা কি হবে তিনি জানেন না, তবে এটুকু আঁচ করেন তা হয়ত ভিন্ন শুধু নয় বিপরীত হতে পারে। হয়ত প্রতাপ কালের কৌটিল্যের প্রথম শহীদ। তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কাছেও হয়ত তাঁর এই অতীত অনুত্তেজিত জীবননাট্য হবে বিদ্রূপের বস্তু। কিন্তু তিনি এই-টুকু বুঝেছেন মানুষকে বাঁচতে গেলে কালের আবহমানতায় আস্থা রাখতে হবে। অনবচ্ছেদ ভেঙে দেওয়ার জন্যে আঁকপাঁক করলে চলবে না।

তাই পরিবর্তনের বজ্রাভ দ্যুতি ভারতবর্ষের আকাশে আকাশে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারলেও সেদিকে বেশীক্ষণ চোখ ফেরাননি ভবনাথ। যারা আসছে কিংবা আসবার চেষ্টা করছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মারফত হোক গোলটেবিল বৈঠকের মারফতেই হোক তাদের তিনি জানেন না, চেনেন না, আগামীকে দিয়ে কোন ছক বাঁধা যায় না। কিন্তু অতীত বর্তমান নিয়ে বাঁধা যায় যেমন যায় ইংরেজের তৈরী আইনে, তার রাজ্যশাসনপ্রণালীতে।

কলকাতার বাড়ি সম্প্রতি আরও সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন। এখন বেশ সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাড়ির ছাপ এসেছে সেই চেহারায়। এক একবার ভাবেন এই সব কিছু ঢেলে দিয়ে বাড়ি বানানোর কি খুব বিশেষ অর্থ আছে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভবনাথ মনে করেন কালের ইংগিতেই তিনি পরি-চালিত যেমন পরিচালিত হয়ে তাঁর বাবা নিজেকে ঢেলেছিলেন পাবনা বাড়ির পেছনে। এক একবার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকন্যাদের সংগে তাঁর বয়সের ফারাকের কথা মনে আসে। ছেলেদুটো বড় হয়ে থাকলে অবসর গ্রহণের আগেই সাহেবসুবোদের ধরে কয়ে একটা কিছু করে দিতে পারতেন। এখন প্রতাপের খবর মানেই বিপর্যয়ের খবর। তবে এ সব চিন্তাতে তিনি মুষড়ে পড়েন না।

অবসর গ্রহণের পরও চাকরী করবেন। নেটিভ স্টেটে অনেকেই তো কাজ পাচ্ছে।

সেদিন সকালে ক্রসওয়ার্ড পাজল করছিলেন ভবনাথ। ছুটির দিনের সকাল। সাইকেলটা যথাস্থানে না থাকায় বুঝলেন পুত্রদ্বয় বেরিয়েছেন। বুড়ী পাশের ঘরে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের পরাক্রম যে তর্কাতীত তাই গুন গুন করে পড়ছে আর মাঝে মাঝে নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচছে। একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভবনাথ, বাঁদরগুলো কখন বেরিয়েছে? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই উইলিয়াম সেকসপীয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণে মনোযোগ দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে যখন স্বর্ণসুন্দরী বেশ ভাবতে শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সাইকেলের রডে টুটুলকে বসিয়ে চোঙা ফিরল। রোদ্দুরে তাদের মুখ লাল। ঘরে ঢুকেই চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, মা সর্বনাশ। সুধীরদার পক্স হয়েছে।

স্বর্ণসুন্দরী বড়ি দিচ্ছিলেন। ডালবাটামাখা হাতেই উঠে এসে বললেন, সে কি?

—আমরা ঢুকতেই সুধীরদার মা বেরিয়ে এলেন। তারপর আমাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন।

—কিরকম পক্স? ভবনাথও ভেতরের বারান্দায় উঠে এসে জিজ্ঞাসা করেন।

—ঠিক বলতে পারছি না। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, চেঁচাচ্ছে!

প্রথম কথাটা ঠিক, কিন্তু চেঁচাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু শোনেনি চোঙা। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কথাটা বলে ফেললে।

—বুঝেছি, বুঝেছি! এখনও বোধহয় সবগুলো বেরোয় নি, কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা ছেলেরা জামা কাপড়গুলো বারান্দাতে খুলে রাখো। স্বর্ণসুন্দরী উঠে গিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন সুধীরের মায়ের কাছে। বিকেলে চিঠির উত্তর এল। সাংঘাতিক স্মল পক্সে সুধীরের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। রোমকূপ কেটে রক্ত পড়েছে। বাঁচার আশা নাই।

দিন পনেরো পর চকোলেট রং-এর বিশাল শেভ্রলে গাড়িটা আবার টুটুলদের বাগানে এসে ঢুকল। এবার হুইলে বসে অপরিচিত চালক, বাজখাঁই গোঁফ, কপালে টিপ। ভবনাথকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে দাঁড়িয়ে থাকল। সুধীরদার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন।

গাড়িতে উঠে টুটুলের সব কিছু ভোজবাড়ির মতো লাগে। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা ঠিক আগের মতোই আছে, আগাটা একটু চটা-ওঠা। আবার কি ডুয়ার্সের রাস্তায় গাড়ি ছুটছে?

থমথমে বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামে। টুটুলের চোখ পড়ে একতলা বাড়িটার মাথায়। বিশাল সজনে গাছটা ফুলে ফুলে ঝলমল করছে।

কদিন যেতে না যেতেই শীতটা টপ করে কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ওঠে। বাড়িটার ওপর নীচে পাক খেতে খেতে হাওয়া ঘোরে। বোগেনভিলিয়ার রঙিন পাপড়ি দোতলার বারান্দায় উড়ে আসে।

টুটুল হাঁটুর চকলা উঠিয়েছে সাইকেল থেকে পড়ে। গৌরী গরম জল তুলো দিয়ে ঘা পরিষ্কার করছিল। বুড়ী একটি পত্রিকার পাতায় বিদেশিনীদের বেশভূষার পাতাখানা দেখছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। গেট খোলার আওয়াজ আসে। তারপর নুড়ির ওপরে সাইকেল চাকার শব্দ।

হাতে একখানা খাম নিয়ে ভবনাথ ঢুকলেন। গোপীনাথের জ্বর। স্বর্ণসুন্দরী লুচি ভাজছিলেন। ফুটন্ত ঘিয়ে ক্রমবর্ধমান লুচির দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন, আবার বাঁধাছাঁদা করো।

—এবার কোথায়?

—কলকাতায়।

কয়েকদিন পর ভোরের কুয়াশায় খোলা দুখানা ট্যাক্সিতে ভবনাথের পরিবার যখন শহরে ঢুকছিল, তখন টুটুল চোঙা জলপাইগুড়ির কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। সাদা হাফপ্যান্ট-পরা এক ফিরিঙ্গি ছোকরা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে। গৌরী খালি টুটুলের হাতে চাপ দিয়ে বললে, ভগবানকে ডাক্, আবার যেন আমরা কলকাতার বাইরে যেতে পারি।

দিন সাতেক যেতে না যেতেই রোদ চড়ে আর কলকাতার সেই চিরপরিচিত বসন্তকাল আসে

যখন ঘুঁটেলেপা দাদের আর ইঁদুরমারা বিষের বিজ্ঞাপন-আঁটা দেবদারু গাছগুলো হঠাৎ হলদে-সবুজ সুট পরে ঝলমল করে হাওয়ায়। স্মৃতি ওড়ে ডাস্টবিনে শালপাতার ঠোঙায়, ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়াবার জন্যে কিশোর-কিশোরীদের মন ছলছল করে আর চল্লিশোত্তর মানুষ নিজেদের বাল্যকালের দিকে চায়। এ রকম বসন্তে ভবানীপুরের এক স্কুল থেকে কালীঘাট পার্কের সামনে নামে চোঙা আর টুটুল। ট্রাম-বাসে ওঠা-নামা সম্পর্কে পাখী পড়ার মতো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কিন্তু তবু টুটুল এখনও সবটা ধাতস্থ হয় নি। নেমেই তারা দৌড়য় বরফ কুচি আইসক্রিম্ খাওয়ার জন্যে। একটা গামছায় কয়েক টুকরো বরফ রেখে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গুঁড়ো করে কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে লাল সিরাপ ছিটিয়ে যে এক পয়সার আইসক্রিম তা দু'ভাইয়ের খুব প্রিয়। এ জন্যে তারা সবটা ট্রামে না গিয়ে মাঝপথে নেমে বাকী পথটা হাঁটে। ইতিমধ্যে একদিন পথে 'সাঙ্গু-ভ্যালি'-তে দু আনার ডবল ডিমের মামলেট দুজনে ভাগ করে খেয়ে প্রচুর আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। রসাল বরফের কুচিগুলো জিভে নাড়াচাড়া করতে করতে তারা দুজনেই অবাক হয়ে খাওয়া বন্ধ করে মুহূর্তের জন্যে। গেটের কাছে চিনেবাদামওয়ালার সামনে বেশ বড়রকম ভিড়। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা বিকট চীৎকার আসছে। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম। দুজনেই ভিড়ের দিকে এগোয়। হাতে হাতে লম্বা ইংরেজী খবরের কাগজের একটা পাতা। পাতা জুড়ে দুদিকে দুটো বিশাল মুখ—চেম্বারলিন আর হিটলারের।

—এইবার বাছাধন জব্দ হবে। হিটলার যে সে লোক নয়! ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে।

—আমাদের কি হবে? আমাদের? আর একজনের গলা এল।

খাকি হাফশার্ট পরা কুচকুচে একটা কালো মোটাসোটা লোক। বোধহয় বাড়িমুখী ট্রাম কন্ডাক্টর। চোখে পিচুটি, হাসিতে মুখ উজ্জ্বল। এবং সে জন্যে কাঁচাপাকা গোঁফের নীচে গয়াকাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে দুটো দাঁত ঝলকে ওঠে। হাম লোক পল্টন বনে গা, ভারী গলায় বলে লোকটা।

চোঙা আর টুটুল ভিড় ঠেলে ভেতরের দিকে ঢুকবার চেষ্টা করে। চোখে চশমাপরা এক যুবক ঘাড়ভর্তি কোঁকড়া চুল ঘুরিয়ে টুটুলের দিকে তাকায়। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে বললে, —কোথায় যুদ্ধ হবে, আর কোথায় আমরা হট্টগোল করছি। ইংল্যান্ড জার্মানি যুদ্ধ করে করুক, আমাদের কি!

—আর কদিন বাদেই বুঝবেন আমাদের কি! মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক পাশ থেকে ফস্ করে বললেন। আরও গলা চড়িয়ে বললেন, —ইন্‌ফ্লেশান! ইন্‌ফ্লেশান!

—তার মানে?

—তার মানে? এই যে মাস মাস বিশটা টাকা মেসে ফেলে দিচ্ছো আর পোনামাছের ঝোল-ভাতটি হাজির হচ্ছে, এটি যাবে। হ্যাঃ।

কোঁকড়া চুলওয়ালা পরিচিত যুবকটির দিকে চেয়ে বললেন, জিনিসপত্তর সব মাগ্‌গি হয়ে উঠবে, বুঝলে? বাপের হোটেলে থেকে সাহিত্য চর্চাটর্চা আর চলবে না।

ঘামে ভিজে মুখ লাল করে দুই ভাই ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে অমৃতবাজারের পাতাখানা হাতে নিয়ে। টুটুল খানিকক্ষণ সেই বিশাল দুখানা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই প্রচুর তর্জন গর্জন করেছে। আর ছাপার হরফে সেই তর্জন গর্জন এত সুন্দর লাগে দুই ভাইয়ের কাছে যে তারা চারপাশের উত্তেজনার হদিস পায় না। পার্কে বাস্কেট বল খেলার তোড়জোড় চলেছে। হাতকাটা গেঞ্জিপরা ফর্সা একটি সুঠাম তরুণ শূন্যে সমস্ত শরীরখানা স্প্রিং-এর মতো ছুঁড়ে দেয় বল গোল আংটার মধ্যে ফেলার জন্যে। মেয়েরা দড়ি লাফায় আর সাদাকালো পমেরিয়ান কুকুর নিয়ে এক বৃদ্ধ বৈকালিক ভ্রমণ শুরু করেন। এর ওপর হঠাৎ কি অনাগত ভবিষ্যৎ ছায়া ফেলেছে তা বুঝতে না পেরে বিহ্বলভাবে হিটলারের গোঁফের দিকে চেয়ে থাকে টুটুল।

বাড়িতে ঢুকেই কিন্তু পরিশ্রান্ত দু'ভাই ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসে। মা, যুদ্ধ লেগেছে! যুদ্ধ! চোঙা চেঁচায়।

—সে আবার কি?

স্বর্ণসুন্দরীর হাতে ছেলেমেয়েদের গরম জামা। বাক্সে তুলতে যাচ্ছেন।

—এই দ্যাখো, কাগজটা বাড়িয়ে দেয় চোঙা।

তারপর দুই নায়কের ওপর যখন তিনি চোখ বোলান তখন চোঙা আবার চেঁচায়, সব জিনিসপত্তর মাগ্‌গি হয়ে যাবে।

—বাবা কি যুদ্ধে যাবে? টুটুল জিজ্ঞেস করে।

—দূর। ওসব কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্ব

দেহ নয় মন নয়, বিবাহ মানে নিরাপত্তা—একথা ভবনাথের অবসর গ্রহণের তারিখ যত এগিয়ে আসে ততই চারপাশের হাওয়া থেকে উড়ে আসে গৌরীর মনে। এখন গৌরী আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে না, স্বপ্ন দেখে না, সে কেবল ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী হয়।

তৈরী হওয়া মানে সিল্কের শাড়ী পরে স্নোপাউডার মেখে মাঝের ঘরে গিয়ে বসা। সেদিন বিকেলেও গৌরী তেমনি তৈরী হচ্ছিল। প্রথমে বুকটা একটু ধুকপুক করত, মুখ তার অজান্তে কঠিন অনুভূতিহীন দেখাত স্বর্ণসুন্দরীর চোখে নীরব ভর্ৎসনা সত্ত্বেও। কারণ স্বর্ণসুন্দরীর দৃঢ় ধারণা আই-পি-এস্ ছোকরা সুনীল সোম হাতছাড়া হয়ে গেল গৌরীর ঠ্যাঁটামিতে। গৌরীকে তার পছন্দও হয়েছিল, বেশ খানিকদূর এগিয়েছিল কথা-বার্তা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে একবার দেখাসাক্ষাৎ করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর পাত্রপক্ষ চুপ মেরে যায়, লোক পাঠালেও সাড়া আসে নি।

আজকের পাত্র অবশ্য আরও শাঁসাল। বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বছর দশেক হল আমেরিকাবাসী। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞানে জনৈক কেউকেটা। ছ সপ্তাহের ছুটিতে বিয়ে করতে এসেছেন দেশে।

—আমি কিরকম চাই জানেন? মডার্ন, আপ্-টু-ডেট কিন্তু ইন্ দ্য কোর অফ্ হার হার্ট শি মাস্ট বি ইন্ডিয়ান্। মানে, যাকে বলে ভারতীয়। শুকতো রাঁধবে আবার টেনিসও খেলবে। তাঁর লম্বা ফর্সা হাড়চওড়া শরীরের খাঁচাখানা স্বর্ণসুন্দরীর দিকে ফিরিয়ে ডক্টর বোস বললেন।

—আমার মেয়েও ঠিক ঐরকম, স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন। ডক্টর বোসের বয়স বোধহয় ছত্রিশ সাঁইত্রিশ, কিন্তু দেখায় তিরিশের নীচে। চুল-গুলো বড্ড উঠে গেছে কিন্তু মুখচোখের ভাব বেশ সজীব।

গৌরী ঘরে ঢুকতেই বোস তড়াক করে কোচ থেকে লাফিয়ে উঠে তাঁর লম্বা শরীর-খানা যথাসম্ভব দুমড়ে নমস্কার করলেন।

—আমার নাম প্রদীপ্ত বোস, নিজের পরিচয় দিলেন ডক্টর বোস।

গৌরী মৃদু হেসে বেতের চেয়ারখানায় বসে। কলকাতায় আসার পর গত এক বছরে তার চেহারায় যে পরিবর্তন সুরু হয়েছে তা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ না করলে বোঝা যাবে না। তার সেই দামালে খেলোয়াড়ি চেহারায় ক্রমশঃ এক ক্লান্ত বিষণ্ণতা নামছে। এ পরিবর্তন তার মায়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেজন্যেই তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন মেয়ের বিয়ের জন্যে। সেজন্যেই সম্প্রতি বাগবাজার বস্তির রেলকর্মচারী এবং পার্ট-টাইম বিয়ের ঘটক মুখার্জিবাবুকে এত আপ্যায়ন করে দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কারণ স্বর্ণসুন্দরী টের পান তাঁর মেয়ের সামনে যে মানসিক অনিশ্চয়তা তা বছরখানেক চললে গৌরবর্ণসত্ত্বেও তার চেহারা ক্রমে লেপাপোঁছা হয়ে যাবে। তখন বিশেষ আকর্ষণ থাকবে না।

মুখার্জি বাবুই এ সম্বন্ধ এনেছেন। মুখে মস্ত বড় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁফ, ধুতির

ওপর চকোলেট রংয়ের শার্টপরা বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক সোফায় এককোণে বসে প্রবল-ভাবে থোড়া আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন। আপাতত সে কাজে ইস্তফা দিয়ে সোজা হয়ে বললেন,—এসো মা, এসো মা, আমাদের প্রদীপ্ত হীরের টুকরো ছেলে। ওর বাবাকে চিনতাম, মাকে চিনতাম। নিজেই এসেছে। একেবারে পাগল!

স্বল্পপরিচয় কিংবা প্রায়-অপরিচয়কে অসামান্য গুরুত্বদানের যে সাফল্য তা মুখার্জি-বাবুর বরাবর আয়ত্তে। প্রদীপ্তের বাবা সাধারণ রেলকর্মচারী ছিলেন, বহুকাল আগে দেহ রেখেছেন। তবু মুখার্জিবাবু দাবী করেন যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল তাঁর সঙ্গে। তবে প্রদীপ্তর বিধবা মা যিনি শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে টিচারি করে ছেলে মানুষ করেছেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের অভিভাবকরূপে দু-একবার মুখার্জিবাবুর পরিচয় ঘটেছিল বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে। প্রদীপ্ত বোসের এসব কথা একেবারে বিস্মরণ হবার কথা নয়, তাছাড়া তার বর্তমান রাজকীয় স্বচ্ছলতায় বাল্যকালের স্মৃতি পীড়াদায়ক। একটু রূঢ়ভাবেই ডক্টর বোস বললেন,—মিস্টার মুখার্জি, আপনি একটু বাইরে যান। তারপর আত্মসচেতনভাবে তাঁর ভারী লাই-ব্রেরী ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বললেন,—আমি একটু ওঁর সঙ্গে আলাদা আলাপ করতে চাই।

স্বর্ণসুন্দরী অবাক হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন,—বেশ তো। আমরা বুড়োরা এসবের মধ্যে না থাকলেই ভাল। আসুন মুখার্জিবাবু আমরা পাশের ঘরে বসি।

পাশের ঘরখানা মস্ত, সবুজ মোজেইক-করা ভবনাথের শোবার ঘর। ভবনাথ এক-পাশের ইজিচেয়ারখানায় বসেন আর উল্টোদিকে সিঙ্গাপুরে বেতের বাহারে চেয়ারখানায় মুখার্জিবাবু অনর্গল বলে চলেন প্রদীপ্তের মায়ের অসামান্য চরিত্রগুণের কথা। ভবনাথ সবটাই বিশ্বাস করেন।

—আপনার কী সাবজেক্ট ছিল বি. এ-তে? বিজ্ঞ মাস্টারমশাইসুলভ প্রশ্ন করেন ডক্টর বোস।

গৌরী হেসে ফেলে। এতদিন বরের দাদা কাকা মামা, তার পিসী মাসী, এমনকি পাড়াসম্পর্কের শুভাকাঙ্ক্ষী দাদা এই জাতীয় লোকজনের প্রশ্ন শুনতে সে অভ্যস্ত ছিল। তারপর ভবনাথ নির্ঘাত বলবেন একটা গান করতে। তখন অর্গানে একটু বেশী গা দুলিয়েই তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে। অথবা বুদ্ধিবৃদ্ধারা বলবেন কীর্তন গাইতে। তখন তাদের বারবার বাজানো ফাটা রেকর্ডে শোনা 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল, সখী গো', গাইতে হবে। এই একবছরের রুটিনে সে এখন অভ্যস্ত। মাঝখানে অবশ্য সরাসরি মোলাকাত হয়েছিল নিভৃতে তার পাণিপ্রার্থী আই. পি. এস্. ছোকরার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে হলদে ক্যানার ঝাড়ের পাশে লোহার বেঞ্চিতে। কিন্তু ঘাড়ের কোণে আব থাকায় ছোকরাটিকে নাকচ করে দেয় গৌরী।

—আপনি কি আমেরিকাতেই থাকেন বরাবর?

গৌরীর প্রশ্নের স্বাভাবিকতায় ভদ্রলোক বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এ নিয়ে দেড়মাসের ছুটিতে তৃতীয়বার পাত্রী দেখছেন। আর দুটো ক্ষেত্রেই তাঁর তৈরী করা প্রশ্ন-বাণে বিপন্ন শাড়িগয়নার পুঁটুলি থেকে এ মেয়েটির প্রভেদ টের পান।

—হ্যাঁ, আমেরিকাতেই থাকি। ওখানে...মানে গুণের কদর আছে। এখানে আমাদের কে চায় বলুন?

—আপনার অসুবিধে হয় না?

—হয় না যে তা নয়, কিন্তু যে এমাউন্ট অফ্ কম্‌ফার্টস্ আমরা পাই তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। যেখানে আমরা থাকি সেখানে...

গৌরী কিছুটা কৌতূহলী হয়েই ভদ্রলোকের আমেরিকাবাসের বর্ণনা শোনে। ভদ্রলোকের দেহের গড়নের সঙ্গে সুধীরের লম্বা চেহারার মিল অনেকখানি। কিন্তু চুলের অভাব এবং বেশ কয়েকবছর ধরে গুরু দায়িত্বের চাপ মুখে যে রাসভারী প্রলেপ দিয়েছে তা থেকে সুধীরের কোমল মুখচ্ছবি আলাদা। ডক্টর বোস গল্প করেন তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, গাড়ি বাড়ি শুধু নয় কাজ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধের কথা। কিন্তু সেসব কথা কানে ঢোকে না গৌরীর। তার মনে হতে থাকে, এও তার জীবনে হয়ত এক চাবাগানের ক্ষণিক স্বপ্ন যেমন সে ভেবেছিল নিজেকে সুধীরের সঙ্গিনীরূপে।

—এখানে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরী কটা পর্যন্ত খোলা থাকে?

ভদ্রলোকের প্রশ্নে গৌরী অবাক হয়। লাইব্রেরীতে কয়েকবার গিয়েছে বটে আড্ডা মারবার জন্যে কিন্তু কখন বন্ধ হয় খোলে একথাগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন বোধ করে নি।

—বড় জোর সন্ধ্যে পর্যন্ত, এই তো? আর আমাদের ওখানে সারারাত। সারারাত আপনি লাইব্রেরী ফেসিলিটি পাচ্ছেন। বলুন তো, কত বড় সুবিধে।

ফর্সা চওড়া কবজির ওপর বিশাল দামী ঘড়িটা হাত নাড়াতেই চকচক করে ওঠে।

যদিও তার নিজের মানসিকতার দিক থেকে একেবারে সুদূরে, এও আর একটা ডুয়াসের চাবাগানের নৈস্তব্ধ্য কিন্তু তবু মুখ ফুটে গৌরী বলে,—সত্যি?

—আর কাজের সুবিধে? আপনি যা ইকুইপমেন্ট চাইবেন এনে দেবে।...টিচার্সস্টুডেন্ট রিলেশান? না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ডক্টর বোস যতক্ষণ তাঁর স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা দেন ততক্ষণ আপাতদৃষ্টিতে মনোযোগে মগ্ন শ্রোতাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বক্তাকে দেখতে থাকে। কোনো আব বা ঐ ধরনের কোনো শারীরিক খুঁত নজরে পড়ে না, যদিও চুলটা মাথায় আর একটু থাকলে ভাল হত। গালের দুদিকে দুটো মোটা দাগ নেমেছে, সে দাগ অভিজ্ঞতার কিংবা বিচক্ষণতার হতে পারে কিন্তু স্বামী হিসেবে গৌরীর মতে কিশিং অপ্রয়োজনীয়। চোখ দুটো ভাল। লোকটা ভালমানুষ, অন্তত তার জামাইবাবুর থেকে। ঠিক এই কারণেই হয়ত চার পাঁচ বছর আগে গৌরী খারিজ করে দিত এ ভদ্রলোককে। কিন্তু এ ক বছরের অভিজ্ঞতায় সে একটু ক্লান্ত। স্বামীর ভালমানুষীর ওপর নির্ভরতা খুঁজে না পেলে তার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বিদেশ যাত্রার ঝুঁকি নেওয়া দুষ্কর।

তাঁর যে পেপারটা বিশ্বজনমহলে খুব তারিফ পেয়েছে ভদ্রলোক সে প্রসঙ্গ তুলতেই গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা, আপনার কোন বান্ধবী ছিল না?

—বান্ধবী? কী করে বুঝলেন?

গৌরী হেসে ফেলে।—এই তো, আপনার কথাতেই বুঝলাম!

ডক্টর বোস অপ্রস্তুতভাবে বললেন,—বাঃ! আপনি ভাল ডিটেকটিভ হতে পারতেন।

—কী নাম তার? গৌরী সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে। স্পষ্টত ভদ্রলোকের যশগৌরবের চেয়েও বান্ধবী সম্পর্কে গৌরীর উৎসাহ প্রবল।

—নাম?...মানে এডিথ। ডক্টর বোস একটু ইতস্ততঃ করে বলেন। হঠাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক কথাকে তাঁর শ্রোতা কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে বুঝতে পারেন না।

—এডিথকে কেন বিয়ে করলেন না? এমন হাসিমুখে দুম্ করে প্রশ্ন করে বসে

গৌরী যে ভদ্রলোক বুঝতে পারেন না তাঁর চটা উচিত কিনা।

—অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে...হাসি আর কপট সংকোচ মিশে গৌরীকে খুব আকর্ষণীয় লাগে।

—না না আপত্তি আর কি...বিশেষ করে আপনার কাছে...আপনার তো একটা রাইট আছে এ বিষয় প্রশ্ন করার। আপনি বোধহয় জিজ্ঞেস করতে চাইছেন আমার কোনো পিছ্‌টান আছে কিনা, মানে আমি ক্লিন স্লেটে আবার আমাদের জীবন...সরি, আমার জীবন,... শুরু করব কিনা।

চাপা উত্তেজনা ভদ্রলোকের গলায়। আর গৌরী টের পায় তার সম্পর্কে এই আমেরিকাবাসী সম্পূর্ণ আগন্তুকের আগ্রহ। আরও এক কপট সংকোচে সে ছলছল করে,—না না, বন্ধু হিসেবেও না, একজন সাধারণ পরিচিত লোক হিসেবে...

—না না, মিস্ চৌধুরী, বন্ধু নয় কেন? আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শুধুমাত্র পরিচয়ের?

ভদ্রলোক যে এত তাড়াতাড়ি নিজেকে ধরা দেবেন এভাবে গৌরী তা ভাবে নি। বিশেষ করে দশ বছরের বিদেশবাসে বিদেশিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁকে আরও তৈরী করেছে বলে তার বিশ্বাস জন্মেছিল। অথবা এও হতে পারে—গৌরী হিসেব করে মাথা নীচু করে ডক্টর বোসের চকচকে আমেরিকান জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে—লোকটা হয়ত অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, আর বিচার বিবেচনা ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথম পরিচয়ের সামান্য ভালোলাগার তৃণখণ্ড ধরেই ঝাঁপ দিতে চায় ভবিষ্যতের অকূল দরিয়ায়।

—আমি একটা সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে, এডিথকে কেন বিয়ে করলেন না?

ভদ্রলোক সোফায় সোজা হয়ে বসলেন।—আসলে কি জানেন মিস্ চৌধুরী, ওরা ঠিক আমাদের মতো ম্যারিং টাইপ নয়।

গৌরী খলখলিয়ে হেসে ওঠে।—আর আমরা? আয় আমরা ডক্টর বোস?

—আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন?

—না না, সত্যি জিজ্ঞেস করছি।

ডক্টর বোস হঠাৎ দাঁড়ালেন। একটু মনমরাই দেখাল তাঁকে। বললেন—আচ্ছা মিস্ চৌধুরী, আজ উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

গৌরীও দাঁড়িয়ে উঠলে। ভাবলে বলবে কিনা, বসুন না, তাড়া কিসের? কিন্তু বুঝতে পারলে না, তার পক্ষে বলা ঠিক হবে কি না। ডক্টর বোস বেশ একটা সৌজন্যের নিরেট আবরণ দিয়ে নিজের চারপাশ ঘিরেছেন। তার বাইরে নিজেও যাবেন না, অন্যেরও প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এরকম বাধা নিষেধের মধ্যে আলাপ করতে গৌরী অনভ্যস্ত। অন্যদিন যখন পাত্রপক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গা দুলিয়ে অগ্যান বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত করে তখন এসব প্রশ্ন ওঠে না। তখন তার নিজের সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে একটি অন্যতম পারিবারিক কর্তব্যে রত থাকে। কিন্তু ডক্টর বোসের সঙ্গে আলাপ করতে তার ভালই লাগছিল। টপ্ করে তাঁর বিদায় নেওয়াতে সে বিহ্বল বোধ করে।

স্বর্ণসুন্দরী পাশের ঘরে আড়ি পেতেছিলেন। ডক্টর বোস চলে যাবার পর মেয়েকে একা পেয়ে বললেন,—ছিঃ ছিঃ। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে তুই এরকম তেল্লাফেচাং করলি! তোর আর বর জুটবে না।

গৌরী আহত হয়ে বললে,—তোমার এই দোষ দেওয়ার অভ্যেসটা এখনও গেল না।

সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না গৌরীর। কলকাতায় মাঝে মাঝে যে ভ্যাপসা গরমের রাত আসে যখন ফ্যানেও হিল্লে হয় না সেইরকম দম্‌আটকানো গুমোট রাত। গৌরী মোটা-মুটি বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। আবার নতুন পাত্র ধরার জন্যে রাজভোগ খাওয়াবেন মুখুজ্জী-বাবুকে তাঁর মা। কারণ প্রদীপ্ত বোস বোধহয় ফস্‌কালো।

আর ফস্‌কে গিয়েছে ভালই, গৌরী চিন্তা করে। তুমি খুব স্মার্ট হবে, মেজাজে আধুনিক হবে কিন্তু আমার মনের যে ধারণাটুকু তার চৌহদ্দীর মধ্যেই থাকতে হবে, তার বাইরে চলে গেলেই তোমাকে আমি চিনি না, জানি না,—ডক্টর বোস তাঁর হাবে ভাবে এই কথাটাই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যা আগে কখনও হত না, এখন তাই হয়। গৌরীর মধ্যে এখন অপরাধীর ভাব জেগে ওঠে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সে এতদিন ভেবে এসেছে তাকে আরও আকর্ষণীয় করেছে অন্যদের থেকে তাই তার ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধক, উচ্চতে বসতে স্বর্ণসুন্দরীর এই অনুযোগ সে আগের মতো একেবারে ফেলে দিতে পারে না।

সকাল সকাল গৌরী চানের ঘরে ঢোকে। আচ্ছাসে সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে চান করে যেন তার সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাবান জলে ধুয়ে মুছে তাদের মাঝের ঘরে আর এক আগন্তুকের জন্যে লেপাপোঁছা হয়ে বসতে পারে।

রোদ্দুরে তোয়ালে দিয়ে চুল ঝাড়ছিল গৌরী এমন সময় উত্তেজিতভাবে ঢুকলেন স্বর্ণ-সুন্দরী।—এই আয়, তোর ফোন। ডক্টর বোস ফোন করছেন। শিগ্‌গির। এমন উষ্ণতায় রাঙা দেখায় স্বর্ণসুন্দরীকে যেন তাঁরই কোন পাণিপ্রার্থী ডাকছে তাঁকে।

—হ্যালো মিস্‌ চৌধুরী! আমি প্রদীপ্ত...ডক্টর বোস বলছি।

—হ্যাঁ বলুন।

মুহূর্তের জন্যে চুপ। তারপর অপ্রস্তুত হাসির ভূমিকা নিয়ে কথা ভেসে আসে।—কাল হঠাৎ উঠে পড়েছিলাম। আপনার মাকে বলে আসতে পারি নি।

—মার সঙ্গে কথা বলবেন? ডেকে দেব?

—না না, দরকার নেই। মানে, আজ কি আপনি ফ্রি আছেন?

—মানে?

—মানে কোথাও এন্‌গেজমেন্ট আছে সন্ধেবেলা?

নিঃশব্দ হাসিতে টোল খায় গৌরীর গাল। ভাগ্যিস্‌ ফোনে আলাপ, গৌরী ভাবে। এক মুহূর্ত চুপ করে বলে,—না, কোথায় আবার যাব? আমাদের সময়ের অত দাম নেই।

—এটা কী বলছেন! আমি বলছিলাম কি, আজ একটা ছবি দেখে আসি চলুন। ভাল ছবি হচ্ছে মেট্রোতে। চার্লস্‌ বয়ার আছে, নেপোলিয়ানের লাইফ।...অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে...তাহলে অবশ্য...

গৌরী উত্তর দিতে আবার একটু সময় নেয়। একবার মনে হয় যদি এই প্রস্তাবটা আসত এমন এক ডক্টর বোসের কাছ থেকে যার বয়স আরও দশ বছর কম তাহলে মন্দ হত না। এখন কেমন এক কাকাবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখার মতো লাগবে তার। কিন্তু...কী আর করা যাবে!

—আমি যেতে পারি। নীচু গলায় গৌরী বলে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আমি তাহলে আসছি সন্ধেবেলা।

—আসুন।

বিকেল হতে না হতেই স্বর্ণসুন্দরী উত্তেজনা বোধ করেন। হাঁক ডাক লাগিয়ে দেন।

বস্তুতঃ এরকম উত্তেজনাই তাঁর বাঁচার অন্যতম রসদ। বড় ছেলে প্রতাপ, জামাই মদনকে নিয়ে বেরোবারে উত্তেজনার ঝড় উঠেছে, এখন সে ঝড় প্রশমিত। স্বামীও অস্তাচলে। এক্ষেত্রে বনং ব্রজেৎ-এর ভাব স্বর্ণসুন্দরীর মোটেই নেই। তাই মেয়েকে পরানোর জন্যে যখন জ্যাবড়া কানবালা নিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করেন তখন মায়ের কাণ্ড দেখে গৌরী মুচ্‌কি হাসে।

—ওটা মাঝের ঘরের জন্যে। আমি মা কানের ড্রপ-টা পরছি।

—তোর যা খুশি করগে, কিন্তু মনে রাখিস...

—কী মনে রাখব মা?

—তোমার সঙ্গে তক্ক করব না মা। এটুকু বলছি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

—একটা আব আছে মা, কানের পাশে। তুমি দেখো নি?

—অসম্ভব! মিথ্যে কথা বলিস নে। আমি এই চুনের দেয়াল সাক্ষী করে বলছি...

মাকে জড়িয়ে ধরে গৌরী। আলিঙ্গনে আবদ্ধ উত্তেজনায় অভিভূত স্বর্ণসুন্দরীকেই মেয়ের মতো দেখায়। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন—তুই আর বাগড়া দিস নে। আবার ঐ বিট্‌লেটাকে রাজভোগ খাওয়াতে হবে। আবার পাত্রের সন্ধানে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে,...আর এরা ভদ্রলোক। যৌতুক বলে এক পয়সা নেবে না। হাবে ভাবে আমাকে বলেছে প্রদীপ্ত। ও তোর দিকে ঝুঁকেছে, বুঝতে পারছিস না? কী হাব্‌লি মেয়ে বাবা!

নেপোলিয়নের জীবনে যা ছিল সম্ভবত তিল তাই তাল করে হলিউড এক ভীষণ নাটুকে কাঁদুনে ছবি ছেড়েছে বাজারে। নেপোলিয়নের প্রাক্তন প্রণয়ী এখন বৃদ্ধা, তার স্মৃতির জাবর কাটছে। হলশূন্য মহিলাদের ফোঁসফোঁস গৌরীও যোগ দেয়। প্রদীপ্ত বোসের ইন্টারেস্ট নেপোলিয়নে নয়। অন্ধকারে আবেগ-উচ্ছ্বসিত তরুণীটির হাতে মৃদু চাপ দেন তিনি। গৌরী প্রথমে হাত সরিয়ে নিয়েছিল তারপর আপত্তি করে না। আর এ বয়সে তারুণ্যের প্রথম যুগে ফিরে যেতে নিজেরই অসুবিধে হয় প্রদীপ্ত বোসের। দেড়মাসের ছুটির মধ্যে আর তিন সপ্তাহ বাকী আছে। এর মধ্যে একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে নেওয়া দরকার। প্রদীপ্ত বোস বুঝতে পারেন তাঁর আর পাত্রী দেখবার ক্ষমতা নেই। মা বেঁচে থাকলে আর বয়স তিরিশের নীচে থাকলে যে পদ্ধতিতে ভাতডাল খাওয়ার মতো অবলীলাক্রমে বিয়েটা ঘটে যায় সেই অবলীলাক্রম তাঁর জীবনে আর ঘটবে না। কাজেই গৌরীর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে গৌরীই তাঁর ভাবী স্ত্রী। সামনে দুজন শ্বেতাঙ্গিনীর পেছনে পেছনে চোখ লাল করে গৌরী যখন হলের দরজায় ঘরমুখী মানুষগুলোর শোভাযাত্রায় এসে দাঁড়ায় তখন অন্ধকারে তাঁর কমবয়সী অভ্যাসের দরুন আঙুলগুলি কাটিয়ে ওঠেন ডক্টর বোস।

তারপর চীনে রেস্তোরায় চিকেন চাওমিয়েন ও সুইট সাওয়ার প্রন।

প্লেট অর্ধেক হতে না হতেই ডক্টর বোস প্রশ্ন করেন,—আচ্ছা মিস্‌ চৌধুরী, আপনি কি...মানে আপনার আমার সম্পর্কে...কতগুলো ঝুলন্ত নুডল মুখের মধ্যে চালাতে চালাতে নিজের অপ্রস্তুত ভাবখানা কাটাবার চেষ্টা করেন।

—ছবিটা বেশ, না? চার্লস বয়ার গ্রেট!

নেপোলিয়নের কথায় হঠাৎ প্রদীপ্ত বোস বলে ফেলেন এডিথের কথা। বললেন, এডিথের নিজের পড়াশোনায় মন ছিল না কিন্তু ওর মাস্টার ছিলেন ইতিহাসে দিক্‌পাল।

—আপনি এডিথকে ভালবাসতেন?

ভদ্রলোকের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রশ্নে যে তাঁর সাজানো বাগান পুড়িয়ে ফেলার

মতো আগুনের হল্‌কা প্রচ্ছন্ন তা টের পান। তবে ভাবী স্ত্রীর কাছে নৈতিক সততার প্রশ্নটা একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—অনেকদিন হয়ে গেল, ও বোধহয় বাসত। ঠিক মনে নেই।

—আপনি? নিশ্চয় এখন না বলবেন! আবার চাপা বিপজ্জনক হাসি খেলতে থাকে গৌরীর সারা মুখ জুড়ে।

—আপনার কাছে আমি লুকোব না। আপনাকে অন্তত বলব...খুব ভাবগম্ভীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভদ্রলোকের মতো শোনায় তাঁর গলা।—কিন্তু তার আগে বলুন, আমাকে আপনার মানে...

মুহূর্তে তাদের মাঝের ঘরের দৃশ্য গৌরীর মনে খেলে যায়। মুখার্জীবাবু আবার রাজভোগ খাচ্ছেন, সে আবার সেজেগুজে প্রতীক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি বলে,—যদি বলি হয়েছে....যদির-ওপর জোর না দিয়ে।

—থ্যাঙ্ক ইউ! ভদ্রলোক প্লেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে পিঠ দিয়ে বসেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন,—এডিথ আমার কাছে আসত, তেমনি স্যামের কাছেও যেত। তারপর ইজিপ্টে চলে গেল অ্যান্‌থ্রপলজিকাল প্রোজেক্টে। আসলে ঠিক বিয়ে করবার মতো সে ছিল না।

—নইলে?

—ডোন্ট বি নটি! শুধু নিজেই প্রশ্ন করছেন। আর আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন। আর পছন্দ অনেকেই অনেককে করে মিস্ চৌধুরী। কিন্তু তার ভিত্তিতে তো...আমি চাই যার সঙ্গে ঘর বাঁধব সে আমাকে রেস্‌পেক্ট করে। সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক চুপ করে যান। একটু আত্মসচেতনভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দেন।

গৌরীও কিছু বলে না। মাথা নীচু করে কফি পান করে। অনেক কথা একসঙ্গে মনে এসে যায়। ঠিক গুছিয়ে ভাবতে পারে না তবে ভালবাসা মানে যদি প্রবল আকর্ষণ বোধ হয় তাহলে তার জামাইবাবুকেই সে ভালবেসেছে। কতখানি মন কতখানি দেহ এভাবে সে ভাবতে পারে না। বিশেষ করে 'রেসপেক্ট' কথাটায় তার হাসি পায়। ডক্টর বোসকে সে নিশ্চয় শ্রদ্ধা করে আরও অনেকের মতো, লোকে যেমন মাস্টারমশাইকে শ্রদ্ধা করে, জ্যেঠামশাইকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণসুন্দরীর সাবধানবাণীও তার কানে আসে। আর হাতের লক্ষ্মী যাতে পায়ে ঠেলার বিপদ না ঘটে সেজন্য মাঝে মাঝে ডক্টর বোসের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকায়।

—'বড্ড দেরী হয়ে গেল, না?' ডক্টর বোস বিল দেবার জন্যে ভারী গলায় হাঁক দিলেন।

এরপর দিন তিনেক চুপচাপ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। গৌরী তো মনে মনে অপমানিত বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণসুন্দরীর উপদেশের ঝড় বইতে থাকে। এমনকি ভবনাথ যিনি সাতে পাঁচে থাকেন না তিনিও রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফিরে ঘামে ভেজা তসরের কোট ছাড়তে ছাড়তে নীচু গলায় বললেন মেয়েকে,—তোর সঙ্গে প্রদীপ্তর কি কোনো কথা হয়েছিল?

সন্ধ্যের পর মুখার্জীবাবু এলেন। সশব্দে ঠাণ্ডা দই খেতে খেতে বললেন,—গিয়েছে, ভালই হয়েছে। আপনি কিছু ভাববেন না, মা। ওর থেকে আরও অনেক ভাল পাত্র আমার

হাতে আছে। তারপর গোবরডাঙা না পটলডাঙার জমিদারের একমাত্র পুত্র, রেলের এ-টি-এস, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, পোর্ট কমিশনার্সের কভেনান্টেড অফিসার, কয়লাখনি সম্রাটের নাতি থেকে শুরু করে সিলেটের নামজাদা তরুণ ব্যবসায়ী এবং বালিগঞ্জের মস্ত বাড়িওয়ালার পাইলট পুত্র সবকটার ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে গেলেন। এবং বলে গেলেন এমনভাবে যেন তাঁদের সঙ্গে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। যেমন, 'গত রোববার মনা মিত্তির ডেকেছিল। ওর ভাই আমার সম্বন্ধী। আমি বললাম মনাকে—ওরকম প্রিন্সের মতো ছেলের চেহারা, প'চিশ বছর বয়সে পনেরোশো টাকা মাইনে, গাড়ি, তোমার ছেলের বিয়ের ভাবনা?' অথবা 'লাহোরে ওর বাবা সেট্‌ল করেছে। ওখান থেকে লিখেছে,' বলে পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে কী খুঁজতে খুঁজতে হতাশভাবে বললেন, 'যা ভুলো মন, ফেলে এসেছি চিঠিটা! ছেলে এ-টি-এস্ হয়েছে কিন্তু তাই বলে কোনো খাঁই নেই। ছেলেটাকে বলতে গেলে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

স্বর্ণসুন্দরী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকেন। কিন্তু পাশের ঘর থেকে এ কথোপকথন গৌরীকে ক্লান্ত করে অপরিসীম। এইরকম জনৈক দিকপালের সম্বন্ধ এনেছিলেন একদা মুখার্জীবাবু। নিকষ কালো বৃদ্ধ ভদ্রলোক, বোধহয় পাত্রের জ্যেঠামশাই, গৌরীর গান শোনার পর হঠাৎ পাশ থেকে তার হাতখানা টেনে নিয়ে ঘষতে শুরু করলেন কব্জির অগ্রভাগ। গৌরীর চোখে জল এসেছিল। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সবাইকে হতভম্ব করে দেয়।

এমন বেজার লাগে গৌরীর যে ভাইদের নিয়ে ক্যারম্ খেলাটাও জমে না। বিশেষ করে চোঙা যখন প্রশ্ন শুরু করে, এমেরিকাতে কি ক্যারম্ খেলা হয়? কিংবা টুটুল বলে, —এবার পুজোয় আসবে না? তখন এই রঙ্গভরা বসুন্ধরা তাকে আরও বেজার করে তোলে।

পরদিন সকালে খালি ঘরে ফোন বাজছিল। গৌরী ফোন তুলতেই ডক্টর প্রদীপ্ত বোসের গলা ভেসে আসে,—হ্যালো মিস্ চৌধুরী?...ও...আচ্ছা, আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। আপনি কি সত্যিই...? মানে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমি যাচাই করছি, আপনার হয়ত সিলি লাগবে! মানে, আমার পজিশন যেন ইন্‌ফ্লুয়েন্স করে না আপনার ডিসিশন...আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না হয়তো, বাট আই মিন্ সীরিয়াসলি...

আবার এক অপরিসীম ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসে গৌরীর মন। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়, সেদিন প্রেক্ষাগৃহে হাতে হাত রাখাও। ডক্টর বোস একটু ভালবাসা-ভালবাসা খেলতে চান। এবং ক্লান্ত লাগলেও গৌরীকে তাই খেলতে হবে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে গৌরী বলে ওঠে,—এটা কী বলছেন ডক্টর বোস? আপনার কী পজিশন আমি তা কিছুই জানি না। কিছু জানার দরকার আছে—বলুন? গৌরীর গলায় হাসি জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে।

তার এই হাসিই শেষ পর্যন্ত ডক্টর বোসের দোমনাভাব ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে।

—তাহলে, তাহলে,...আমাদের বিয়েতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

—আপনি কিছু বোঝেন না! গৌরী আবার হেসে উঠল।

—থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।

গৌরীর হাসি তাঁর কানে বাজতে থাকে। এবয়সে সংসার পাতবার ভরসা দেয় বিদেশে ভারতীয় গবেষকদের অন্যতম পথিকৃৎ ডক্টর প্রদীপ্ত বোসকে।

[ক্রমশঃ]

চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পকৃতি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশশো এগারো থেকে একুশের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক যুবমানসে বেঁচে থাকার প্রকার প্রকরণ প্রত্যয় ও পুরুষার্থ ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। বলা যেতে পারে উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ক্ষণায়ু স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন যে আর সম্ভব নয় এ বোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের বিস্ফোরিত বোমাই সমাপ্তি ঘোষণা করল 'বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ান'দের ভ্রান্ত স্টেবিলিটিসাধনার। এই সময়েই বাংগালি যুবক সেই অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চেয়েছে যা তার বর্তমানকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। একই সঙ্গে সে গভীরের দিকে ঝুঁকেছে—নিজের স্বজ্ঞায় মেলাতে চেয়েছে ভাবনা এবং বাস্তবের দুই প্রান্তকে। এই সময়েই চৌদ্দ সালেই লেখা হল "চতুরঙ্গ"। তখনো ইংলন্ডে নব প্রকরণের উপন্যাস রচনা শুরু হয়নি। বাহুল্যবর্জিত, নির্মেদ, তৎপর অথচ গূঢ়ভাষী, অপরিচিত অথচ আত্মার অভিজ্ঞানে চিরচেনা এই উপন্যাস যেন মজঃফরপুরের বিস্ফোরণে আবির্ভূত বাঙ্গালি যুবক। সে আমাদের চেনার দিগন্তে ঠিক আসেনা। কিন্তু কিছুতেই আমাদের অনাত্মীয় নয়। প্রশ্ন জাগে "গোরা"র পর রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গ" লিখলেন কেন? তাঁর মধ্যে কোনোদিনই শৈল্পিক আত্মানুবর্তন নেই বলে, নেই বলে পুরাবৃত্তির প্রবণতা—এ প্রশ্ন আরো জরুরী। এ তো শুধু ফর্মের ভাঙ্গাগড়া নয়। ফরাসী চতুরঙ্গের ভূমিকায় রোলাঁ পিয়ার্সনের একটি অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। উনিশশো ষোলোয় ভারত থেকে বাইরে গিয়ে, উনিশে ফিরে এসে পিয়ারসন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এদেশের পরিবর্তনকে। উপন্যাসে কবিতায় ফর্মের ভাঙ্গাচোরা এই সময়েই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কমবেশী সেই জাতীয় উপন্যাসিক যাঁরা অভিজ্ঞতার মূল্যেই উপন্যাসকে অনিবার্য মাধ্যম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদিকে যে অভিজ্ঞতাটি তাঁরা অগ্রাধিকারী ও অবশ্যপ্রকাশ্য বলে মনে করেন, সেই মূল্যবোধটিই তাঁদের উপন্যাসের আঙ্গিকরীতির প্রকৃত দ্রষ্টা এবং যথার্থ নিয়ামক। অন্যদিকে এই আঙ্গিকরীতির আলোকবর্তিকাটি জ্বলে উঠলেই লেখক ঠিকভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য। "গোরা"-র বিপুল পটভূমি, চরিত্রমেলা, নায়কের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ এক অন্বেষা, বৃত্তধর্মী গল্প এবং সংবৃত সমাপ্তি যে অভিজ্ঞতার ভাষ্য, চতুরঙ্গের বিদ্যুল্লতা নায়িকা, কাহিনীর কাটা-ছেঁড়া রূপ, নায়কের আদ্যন্ত ব্যতিক্রমী স্বভাব এবং বিবৃত উপসংহার তা থেকে পৃথক এক অভিজ্ঞতার টাঁকা।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আমাদের একথা বুঝতে দেরি হয়নি যে 'চতুরঙ্গ' থেকেই উপন্যাসের ফর্মের ভাঙ্গাচোরা শুরু হল—এমনকি বাংলা সাহিত্যেও। এই ফর্মের ভাঙ্গা-চোরা ইংরাজি উপন্যাসেও শুরু হয়েছে বিংশের দ্বিতীয় দশক থেকেই। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ এবং কার্যকলাপের চেয়ে তাদের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করার অভিপ্রায় এই সময় থেকেই ইংরাজি সাহিত্যে উঁকি দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অভিজ্ঞতা যত জটিল থেকে জটিলতর হতে থেকেছে ততই বিশ্ববীক্ষা স্থান ছেড়ে দিয়েছে আত্মবীক্ষাকে। লেখকেরা তাঁদের বস্তুনিষ্ঠতার বিনিময়ে নিয়ে এলেন এক আত্মপ্রক্ষেপের গূঢ় কৌশল। সৃষ্ট চরিত্রের ভাবনাপ্রবাহের আড়ালে আড়ালে অনুপ্রবেশের ফলে উপন্যাসের আঙ্গিকরীতিও প্রত্যক্ষতা

থেকে দূরে সরে গেল—জয়েসীয় আঙ্গিক-নিরীক্ষা তারই চূড়ান্ত পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বিলাতভ্রমণ যখন ঘটছে তখনও কিন্তু এ জাতীয় নতুন রীতির যাত্রারম্ভ হয়নি। কিন্তু এটাও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি যে উপন্যাসসাহিত্যে—এদেশের প্রেক্ষাপটেও—ব্যক্তির সর্বৈব বন্ধন-মুক্তির প্রশ্ন ও তার প্রতিক্রিয়াই প্রধান হয়ে উঠছে। ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে, বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে সে জাতীয় কোনো পটভূমি ছিল না। কেননা, ইংলন্ডে চেখভের গল্পের অনুবাদ প্রকাশে, ফরাসী উত্তর-ইম্প্রেশনিস্টদের ফ্রাই-সংগঠিত প্রদর্শনীতে, আবছায়া বাতাসে ফ্রয়েডের ভাবনার পাখির পক্ষবিধুননে, ব্যক্তির জটিল গহনের যে প্রাধান্যবিস্তারের উদ্যোগপর্ব সূচিত হল, বাংলা দেশের এই অষ্টাবক্র ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সে-ইতিহাসের অনুবৃত্তি সম্ভব ছিল না। প্রথমটিকে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অনুভব করেছিলেন তৃতীয় বিলাতযাত্রায়—দ্বিতীয়টি তাঁর অধিগত ছিল স্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র হিসাবে—দেশীয় বুর্জোয়া শক্তির আত্মবিকাশের শোচনীয় ইতিহাসের দ্রষ্টা হিসাবে। ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন শেরিফের আহ্বানে অনুষ্ঠিত কলকাতা টাউন হলে প্রদত্ত স্বারকানাথের উল্লসিত বক্তৃতায় মফঃস্বলবাসীদের থেকে কলকাতাবাসীদের অগ্রসরতা ইংরাজদের প্রতি যে অভিনন্দন টেনে এনেছে, তার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে বর্তায়নি। তিনি বরঞ্চ ধিক্কার হেনেছেন এই অসম বিকাশের বিকারকে।

তাই যে-ভাবে ডরোথি রিচার্ডসন বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ উপন্যাস-প্রকরণে রূপান্তর ঘটান, এখানে রূপান্তর সেভাবে ঘটার কথা নয়। সেখানে নারী সাংস্কৃতিক সচেতনতা অর্জন করেছে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশভাক্ হিসাবেই। এ পথে তার গৃহগত নারী-ভূমিকার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সে পুরুষপ্রধান সমাজের আর্থনীতিক প্যাটার্নেরই এক ভগ্নাংশে পরিণত হয়। এ পরিণতি সত্ত্বেও সচেতন নারীমানস হারায় না সজাগ জিজ্ঞাসা। তাই বুর্জোয়াসংস্কৃতির অন্তর্বিরোধ যখন জটিলতর হয়ে উঠেছে, যখনই তা পূর্বের গতিশীলতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে, তখনই ঐ সজাগ মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অবশ্যম্ভাবিরূপে। নারী-স্বভাবেই এ প্রতিক্রিয়ার রূপ হয়েছে বিশিষ্ট—নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতা, তরঙ্গপ্রতিম কম্পনশীলতা এবং ইতিহাসনিরপেক্ষ ব্যক্তি-অনুভূতির অগ্রাধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ও প্রশ্ন নিরর্থক। পারিবারিক প্যাটার্নে যেখানে সামন্ততন্ত্রের জের দুর্মর, সামাজিক-আর্থনীতিক প্যাটার্নেও যেখানে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বেঘোরে প্রাণ হারায়—সেখানে ঐ জাতীয় ভাবনাপ্রবাহের কল্পনা অসঙ্গতিদুষ্ট হতে বাধ্য। দামিনী-উদ্ভাবনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এটাই নির্দিষ্ট করলেন যে এখানে—এই ইংরেজের কলোনির কারাভ্যন্তরীন কারায় নারীর বৌদ্ধিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন অপেক্ষা আরো জরুরী তার সমগ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন। লক্ষণীয় যে "সবুজ পত্রে"ই বেরিয়েছিল 'স্ত্রীর পত্র', "সবুজপত্রে"ই প্রকাশিত 'হালদার গোষ্ঠী'তে যা ব্যক্তির সত্যকে উদ্ভাসিত করল বিপরীত আলোক-সম্পাতে, 'স্ত্রীর পত্রে' তাই হল ঋজু, প্রত্যক্ষ। "সবুজপত্রে"ই বেরুল 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী'। "সবুজপত্রে"ই বেরুল "চতুরঙ্গ।" যেহেতু এই সমগ্র অস্তিত্ব শচীশ অথবা দামিনী কারো কাছেই দেশকালনিরপেক্ষ হতে পারে না, সেহেতু এ-উপন্যাসে "গোরা"র মতো উচ্চারিত না হলেও, একটা দেশকাল-চেতনা তথা ইতিহাসচেতনা উপস্থিত। সে কারণেই এর আঙ্গিক-রীতিও হয়েছে স্বয়ম্ভর।

তথাপি এ কথাও তো উপেক্ষিত হবার নয় যে উপন্যাসের ফর্মের ভাঙ্গাগড়া শুরু হয়েছে। সেই অ্যারিস্টটলীয় প্লট-বিন্যাস বা পাত্রপাত্রীদের অনুকারী নাটকস্পর্শী সংলাপ

বা আচরণ আচরণীয়, এপিক কাঠামোর প্রয়োজনও আর নেই। আর দরকার নেই নাটক বা মহাকাব্যের কাছে হাত পাতার। এতদিনে বাংলা উপন্যাস সাবালক হতে চলেছে।

দুই

"গোরা" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথক সাধারণত সেই প্রথাসিদ্ধ সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক। যদিও প্রেক্ষণ-বিন্দুর প্রয়োজনীয় স্থানান্তর ও পাত্রান্তর ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্বিষ্ট চরিত্রবাস্তবতা আবিষ্কারে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন, যদিও "চোখের বালি" ও "গোরা"-তেই সে-রীতি হয়েছে সর্বাধিক শিল্পময়—তথাপি "চতুরঙ্গে"র পূর্ব পর্যন্ত চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গে শিল্পসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথই কথক। "চতুরঙ্গে" তা নয়। চতুরঙ্গ-কথক শ্রীবিলাস। এই কথক নির্বাচন, এই প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীবিলাস তার আপাত সাধারণত্বের ছদ্মবেশে একটি বিশিষ্ট চরিত্রকল্পনাও বটে। শ্রীবিলাস সেই সাধারণ যুবক বুদ্ধি এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যে বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয় না, কিন্তু অগ্রাধিকার দেয় হৃদয়কেই। গোরার বন্ধু বিনয় এবং শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাসের মাধ্যমে প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলার নবযুগের সমাজ-ইতিহাসবোধের বিশিষ্ট সচেতনতা। লক্ষণীয় যে টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও সমাজ-ইতিহাসের একটা বিশেষ পৃষ্ঠা ছিল নির্দিষ্টভাবে মুদ্রিত। টলস্টয়ের কাছে এটা ছিল ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল রামমোহন বিদ্যাসাগরের নবযুগাভিযানের স্মৃতি। এই মানবিক প্রেরণাভূমি থেকে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নায়ক ও পাত্রপাত্রীদের পুরুষার্থের নবীন তাৎপর্য। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার মানদন্ড এই ইতিহাসচেতনা থেকেই সংগৃহীত হল। বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ানদের দুর্বলতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত ছিলেন বলেই কোনো কৃত্রিম স্থায়িত্বের জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন না। গোরা শচীশ পরেশবাবু জগমোহন প্রভৃতি চরিত্রকল্পনায় দেখা গেল সর্ববিধপাশ-বিমুক্ত, সকল রকমের 'প্রেসারগ্রুপ' থেকে মুক্তি-সন্ধানী ব্যক্তিত্ব। এরা বৃহৎ মানুষ। বিনয় বা শ্রীবিলাস এদের পাশের আর দশ জনের মত 'সাধারণ' মানুষ। কিন্তু যে কালগত পটভূমিকায় এরা স্থাপিত সে কালসমুদ্রের কম্পনের ফলে সাধারণও হয়ে ওঠে অসাধারণ। বিনয়-ললিতা এপিসোড, বা শ্রীবিলাস-দামিনী পরিণাম এ কথাই প্রমাণ করে যে বিদ্যাসাগরের জীবনের বৃহত্ত মহত্ত্ব যতই উত্তুঙ্গ হোক, সে জীবন-মন্ত্রকে মূর্তি দিতে এগিয়ে আসে শ্রীশ। সর্বৈব আলোড়নের মাঝখানে ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে যায় অনাটকীয় ভাবে ক্ষুদিরাম। যে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে লক্ষ্য রেখে গোরা বা শচীশ ছকের পর ছক ভাঙ্গতে চায়, বিনয় বা শ্রীবিলাস তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু তারাই অকস্মাৎ হয়ে ওঠে গতিময়।

"গোরা" উপন্যাসে লেখকই কথক—"চতুরঙ্গে" শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাসকে কথক নির্বাচনের কারণ খুবই দৃঢ়। শচীশ দামিনী এবং জগমোহন ননীবালা-জীবনকথায় লেখকের কথকতা শিল্পগুণের প্রতিবন্ধক হতো—ওদরে টেনশনের নাটকীয়তা লেখকমাধ্যমী বর্ণনায় প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি ও দূরত্ব বজায় রাখতে পারতো না। গুণমুগ্ধ শ্রীবিলাস ও অনুরক্ত শ্রীবিলাসকে আমরা প্রথম থেকে ঘটনায় ও নায়ক-নায়িকার জীবনবিষয়ে জড়িত বলে মেনে নিয়েছি। তার উক্তি একারণেই অত্যুক্তি হলে সখাসস্মিত ক্ষমা পায়, উনোক্তি হলেও বন্ধুবাচন বলে পার পেয়ে যায়। আবার সে, ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীর অতিসন্নিহিত থাকার ফলেই তার কাছে

কোনো কিছুই নাটকীয় দূরত্বে দৃশ্যময় নয়। শ্রীবিলাস বলেছে বলেই ঘটনার তীব্রতা বর্ণনার সংক্ষিপ্ততায় তীক্ষ্ম সূচ্যগ্র হতে পেরেছে। দামিনীর মৃত্যুতেই শ্রীবিলাসের কথকতা শেষ। তার শোকার্ত মর্মবেদনার অনুমেয় গভীরতাকে সে নৈঃশব্দ্যের অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। দামিনী এবং শচীশের মাঝখানে শ্রীবিলাসের ভূমিকা শ্রীবিলাস নিজেই বিশ্লেষণ করেছে চমৎকার—'এই নাট্যের মুখ্যপাত্র যে দুটি তাদের অভিনয় আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ'। দামিনীর স্বীকৃতি—'তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না'—শ্রীবিলাস আপাতমূল্যেই নিয়েছে। কিন্তু এই গৌণত্বজনিত কোনো ক্ষোভ বা বেদনা যদি তার থেকেও থাকে, তাকে সে উপেক্ষা করেছে সাধারণত্বের অহংকারে—যার অপর নাম অভিমানহীনতা। এবং এই সকৌতুক অভিমানহীনতার কারণেই একদিকে যেমন স্তিমিত হয়েছে নাট্যাতিশয্যের প্রলোভন, তেমনি তার নিজের ভবিতব্যের মুখোমুখী সে যখন হয়েছে, তখনো তার কথনভঙ্গীতে লাগল না করুণ নাটকের শেষ দৃশ্যের বিষণ্ণ চরিত্রের বাষ্পাচ্ছন্নতা। সুতরাং এ উপন্যাসের নিরুচ্ছ্বসিত ঋজুতা স্বভাবজ।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে নাট্যাশ্রয়ী রীতির অনুকরণ করেছেন, ঠিক সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন উপন্যাসে নাট্যরীতি প্রয়োগ করতেন না। কেন করতেন না, সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধকার তাঁর "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" গ্রন্থে করেছেন বলে পুনরাবৃত্তিতে বিরত হওয়া গেল। কিন্তু একথাও ঠিক পাত্রপাত্রীদের সমগ্র-ব্যক্তিত্ব-সম্ভূত আর এক টেন্শন তাঁর উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অন্তর্গূঢ় নাটক সৃষ্টি করে। "চতুরঙ্গে" কিন্তু সে জাতীয় নাটক সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধরেছে। এ যুগের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেরণাতে যে সতত পরিবর্তনের সংকেত উদ্ভাসিত হয়েছে, বের্গসঁ-র দর্শনে রবীন্দ্রনাথ তার এক দার্শনিক সমর্থন পেয়ে থাকবেন। জগমোহন ও শচীশের বিরতিবিহীন ক্রমোন্মোচন একদিকে বের্গসঁয়ের এই ধারণার ছায়া, অপর দিকে তা রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় ও স্বাদেশিক অভিজ্ঞতার সমর্থন –Our personality shoots, grows, ripens without ceasing. Each of moments is something new added to what was before. We may go further : it is not only something new, but something unforeseeable. জগমোহন ও শচীশ এই দুই উচ্চতম বৌদ্ধিক স্তরের ব্যক্তির জীবনে এই অননুমেয়ের ধাক্কা স্বভাবতই গতিশীলতার ফল। ননীবালা-ঘটনা এবং দামিনী-পরিণাম তার বড়ো প্রমাণ। ছোট প্রমাণগুলি ছড়িয়ে রয়েছে এর আশেপাশে। শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যতিরেকে সমস্ত ব্যাপারটি একটি মিথ্যা নাটকে পর্যবসিত হতো।

কিন্তু এ-প্রেক্ষণবিন্দু সর্বদা এবং সর্বত্র কি অক্ষুণ্ণ থেকেছে? লেখকীয় নীরবতা বা 'অথরিয়াল সাইলেন্স' যাকে বলেছেন সমালোচকেরা, তা কি কখনোই লঙ্ঘিত হয়নি? এখানে একটা কথা স্মরণীয়—ফ্লবেয়ারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত জেমসীয় সিদ্ধান্তে যাই বলা হোক লেখকের স্বকণ্ঠ বা অনুপ্রবেশ মাত্রেই অশৈল্পিক, এত জোরের সঙ্গে এমন কথা বলা চলে না। লরেন্স স্টার্ন-এর ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডিই শুধু নয়, এ ব্যাপারে খোদ ফ্লবেয়ারের "মাদাম বোভারি" থেকেও উদাহরণ টানা চলে। প্রেক্ষণবিন্দুর স্থানান্তর ঘটিয়ে লেখকের শিল্প-

সম্মত অনুপ্রবেশের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে। কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে নবকুমারের প্রেক্ষণবিন্দু। এ প্রেক্ষণবিন্দু ছিল অপরিহার্য, কেননা নবকুমারের রূপানুভূতির 'আয়রনি' এই নাট্যরসাশ্রিত উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। তার গাঢ় ভূমিকা এখানেই রচিত হল। পক্ষান্তরে নবকুমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মতিবিবির রূপবর্ণনায় উপন্যাসকথকের দৃষ্টিবিন্দু ব্যবহৃত হল। কারণ পূর্বোক্ত কোনো আয়রনি অভিপ্রেত ছিল না তো বটেই, আরো বড়ো কথা লেখক সাধারণ প্রেক্ষকের ভূমিকায় নেমে এসে মতির রূপচরিত্রের লৌকিকতাকেও স্থাপিত করেছেন। উপন্যাসাশ্রিত নাট্য-স্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে এইভাবে। "চতুরঙ্গে" শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দুকে লেখক কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমার বাইরে টেনে নিয়ে গেছেন। শ্রীবিলাস ও সর্বজ্ঞ লেখকের ভেদসীমাটি তখন যেন অস্বীকৃত হয়েছে। শচীশের দিনলিপির ব্যবহার যদিবা সে অস্বীকৃতিকে কিছুটা ছদ্মবেশ পরাতে চেয়েছে, কিন্তু অন্ততঃ উপন্যাসের 'শ্রীবিলাস' পর্বে নদীর চরে শচীশ-দামিনী সংবাদে শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দু ও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ একাকার হয়ে গেছে। এই অংশে দামিনী-শচীশ সংলাপের প্রাক্কালে যে বিখ্যাত চিত্রকল্পের সমতুলা নিসর্গবর্ণনা তা কার দৃষ্টিসম্ভূত? নিশ্চয় দামিনীর নয়? তাহলে শ্রীবিলাসের। শ্রীবিলাসের হলে সে প্রায় সর্বত্রচারী এবং সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের ক্ষমতাই অধিগত করেছে বলতে হয়।

তাহলেও ক্ষতি হয়নি। কেননা, শ্রীবিলাস, এবং সেহেতু লেখকের, মূল উদ্বেগের বিষয় দামিনী। উপন্যাসের মূল ঘটনায় দামিনীর বিদ্রোহ আসল কথা। দামিনীই প্রমাণ করল যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক আর্থনীতিক কাঠামো-ই শুধু পুরুষপ্রাধান্যসূচক, তা পুরুষাধিপত্যে চালিত নয়, আধ্যাত্মিক মুমুক্ষাও সেখানে পুরুষাধিপত্যের বশম্বদ। ননীবালার ও নবীনের স্ত্রীর ভিন্নার্থ আত্মহত্যা থেকে মনে হয় লেখক এসময়ে নারীর ব্যক্তিমর্যাদার অবদমন বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দামিনীকল্পনা তারই ফল। যে ঘটনা শচীশকে ঠেলে দিল ভক্তিসাধনায়, সেই জাতীয় ঘটনাই দামিনীকে নিয়ে গেল ব্যক্তিমুক্তির প্রত্যক্ষ প্রশ্নে। সব রকম ছক ভেঙে ভেঙে তার যাত্রা। লেখকের দামিনী-মনোভাব, ও শ্রীবিলাসের দামিনী-মনোভাব কতকটা এক বলেই এখানে প্রেক্ষণবিন্দুর সামান্য স্থানান্তরণে কোনো ক্ষতি হয়নি।

চার

তীব্র গতিচ্ছন্দকে মূর্ত করা হয়েছে শচীশ-দামিনীর ব্যক্তিত্বচিত্রনে। পর পর অবচ্ছিন্ন ঘটনাচিত্রকে যে পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে তাকে বলা যায় সিনেম্যাটোগ্রাফিক। মাঝে দ্রুত কাটের সঙ্গে তুলনীয় যেন কতকগুলি খবর বা তথ্য। 'দুই বছর শচীশের কোনো সংবাদ পাইলাম না', 'পাথর আবার গলিল', 'আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল'—এগুলি এবং এজাতীয় আরো নানা উক্তি নতুন নতুন সিকোয়েন্সের অবতারণা। যে কোনো বৈপ্লবিক ছন্দের এ উপযুক্ত আঙ্গিক রীতি। স্মরণ করলেও করা যেতে পারে বেগসংয়ের এই উক্তি—যা কিনা সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে সেই দার্শনিকের ব্যাখ্যা —This impulsion, once received, sets the mind off on a road where it finds both the information it had gathered and other details as well; it develops, analyzes itself in terms whose enumeration follows on without limit—তিনি আরো বলছেন যে it was not a thing but an urge to movement—তাই শ্রীবিলাসের বিবৃতির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বগুলির নাড়ীর স্পন্দন-মুহূর্তগুলিই ফুটে উঠেছে, যা আপাতভাবে অবচ্ছিন্ন, কিন্তু তার মাধ্যমে আকৃতি পায় অস্তিত্বের পূর্ণস্বরূপ, যা শেষ পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। চিত্রশিল্পী যেমন যা এঁকে চলেছেন তার পূর্ণপরিণতি পূর্বাহ্নে অনুমান করতে পারেন না, তেমনি each of our states, at the moment of its issue, modifies our personality being indeed the new form that we are just assuming.

ব্যক্তির এই তরঙ্গলীলা শ্রীবিলাসের মন্ময় দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবার কালে সৃষ্টির বিচিত্র নিয়মে এক স্থায়ী চিত্রকল্পের আকার পরিগ্রহ করেছে। কাব্যে এবং উপন্যাসে চিত্রকল্পের সার্থকতা বিচারের মানদণ্ড স্বভাবতই এক নয়। সার্থক শিল্পকর্মে বিশিষ্ট কবিতায় চিত্রকল্পই হতে পারে একটা অভিজ্ঞান। উপন্যাসে চিত্রকল্প সাধারণত থাকে চরিত্র বা ঘটনার অধীন। কিন্তু "পোর্ট্রেট অফ এ লেডি" উপন্যাসে ইসাবেল আর্চারের জীবনকথা প্রসঙ্গে বাগানের চিত্রকল্প যখন তারই জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে একটা ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন জলাজঙ্গলের চিত্রকল্পে রূপান্তর লাভ করে তখনই বোঝা যায় এ আরোপিত চিত্রকল্প নয়, এ চরিত্রপাত্র বা ঘটনার টানে উদ্ভূত চিত্রকল্প। কিম্বা তারও বেশী—এই চিত্রকল্পই তখন উপন্যাসের ভাবভাষা। "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে বহু ব্যবহৃত চিত্রকল্প—ঢেউ> সমুদ্র>জাহাজ বা নৌকা বিষয়ক। যথা—

(ক) মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দার কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হোক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

(খ) এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমন করিয়া চলিয়াছি—

(গ) হঠাৎ প্লাবনে উপচিয়া পড়িল.....

(ঘ) এদিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ায় ঝাপট খাইয়া অন্নদার ভরাপালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল।

(ঙ) শচীশ বলিল, 'উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে, সেখানে সমস্ত শান্ত।'

(চ) আমি বলিলাম, 'প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে তরী কি হইলে ডুবিবে না, চলিবে।'

(ছ) সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।

(জ) শচীশের এ কী চেহারা। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা খাওয়া, ছেঁড়াপাল, ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা।

(ঝ) উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া মরিত।

(ঞ) যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায়

সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির সমস্ত ঢেউ, সমস্ত সমুদ্র শচীশ দামিনী এবং শ্রীবিলাস সকলেরই মুক্তি এবং বন্ধনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের দর্পণ। এমনকি যখন তা অপরের সম্বন্ধে উক্ত তখনো তা শ্রীবিলাসেরই জীবনগত অভিজ্ঞতার ভাষায় রূপময়। কিন্তু লেখক ও শ্রীবিলাসের অনুভূতিতে দামিনীর সংগ্রামই মুখ্য। মুখ্য তার জীবনের আয়রন। তাই দামিনীর সমস্ত যন্ত্রণা এবং আর্তি যখন মৃত্যুতে সমাপ্তির দিকে চলেছে তখন আর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাসঞ্চারী বা ইলাস্ট্রেটিভ চিত্রকল্প বাতিল হয়ে গেছে। তখন দেখা দিল সেই নিগূঢ়ভাষী সংকেতময় রূপান্তরণী, ট্রান্সফর্মেটিভ চিত্রকল্প—হার্ডিতে বা লরেন্সে যার দেখা পাওয়া যায়। তখন পরিবেশ-সম্ভূত নিসর্গচিত্রই হয়ে ওঠে গূঢ়ভাষী চিত্রকল্প। শ্রীবিলাস-পর্বের প্রারম্ভেই দামিনীর স্মৃতিসর্বস্ব শ্রীবিলাস যখন ভাঙ্গা পোড়ো নীলকুঠির অরণ্য-আক্রান্ত রূপ বর্ণনাকালে বলে, 'তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের ও আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা—বাসরঘরে শ্যালির মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে।'—তখন আর কেউ নয় দামিনীর মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনবোধই চকিতে সংকেতময় হয়ে উঠেছে—সেই দামিনী, যে শ্রীবিলাসের কাছে 'গৃহিণী হইল না', 'মায়া হইল না'—'সে সত্য রহিল। সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।' এ আর অর্থপরিস্ফুটক চিত্রকল্প নয়। শ্রীবিলাসের দামিনী-অভিজ্ঞতার অভিঘাতে নিসর্গ-প্রতিবেশই হয়ে উঠেছে ভাবনাপ্রতিবিম্ব।

আর সেই নদীর চরে, যেখানে দামিনী পৌঁছে গেল 'একটা সাঁমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে', যেখানে 'পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। যেখান থেকে ঘটেছিল সব রঙের নির্বাসন—'যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে'—সেখানে এই অসামান্য যন্ত্রণাময় অন্বেষার চিত্রকল্প শ্রীবিলাসের স্মৃতির সহযোগে দামিনীর জীবনের রূপক হয়ে ওঠে। এরই পরে দামিনী পৌঁছে যায় বর্ণে বর্ণে অভিরাম জলকণায় স্নিগ্ধ সরসতার কূলে। সেখানে বসে শচীশ। শচীশের প্রত্যাখ্যান কিন্তু দামিনীকে আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যেখানে 'চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।' যে টেন্‌শন আধুনিক জীবনতায় তোলে অস্তিত্বের তারে তারে নতুন আক্ষেপস্পন্দ, এই চিত্রকল্প সেই গহন ব্যক্তিত্ব-রূপের ভাষা। এই অংশে যে, চিত্রকল্পটি গড়ে উঠে ভেঙে গিয়ে আবার গড়ে উঠেছে—তা শচীশ এবং দামিনীর ভিন্নার্থক মুক্তিবোধের দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সাধনের প্রয়াসী কল্পনা। এই দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সাধনের জন্যই শ্রীবিলাসের ভাষার ডায়েরি-রেজিস্টারও ধীরে ধীরে শেষের দিকে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে। সে ভাষার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ঐরাবতের মৃত্যু

দিনেশচন্দ্র রায়

জয়ন্তিয়া পাহাড় যেখানে অধিত্যকাতে সমতল সেখানে প্রতিদিন অপরাহ্ণকালে একটি দীর্ঘ-ছায়া রায়ডাক নদীর বেলাভূমিতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে শুয়ে থাকে। মনে হয় হাতের কনুই মাথার নীচে দিয়ে ছায়াটা ডান কাতে শুয়ে আছে। এই বেলাভূমি অগণিত প্রস্তর-খণ্ডদ্বারা সমাধিস্থ। শেষ মধ্যাহ্নে দূর থেকে এই নানা আকারের এবং বর্ণের পাথরগুলোকে চারণক্ষেত্রে বিচরণরত গরুরপাল বলে মনে হয়। আর সেই ছায়াটা অবিকল ডান কাতে শুয়ে থাকা একজন রাঁধুনী। বিকেলটা যখন আরও গভীর হয়, সূর্য যখন পশ্চিমের দিকে আরও একটু নীচে যায়, তখন ছায়াটা কোন প্রাগৈতিহাসিক লোকপালক, অন্তর্জলী যাত্রা করে এই মহানদীর তীরে মুমূর্ষু, নানা আকারের পাথরগুলো তখন নারী, পুরুষ, বালক-বালিকার রূপ নেয়। দুহাতে মুখ ঢেকে তারা শোকে এবং ক্রন্দনে মুহ্যমান।

এই অধিত্যকাতে একবর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট গ্রাম, ধানক্ষেত। কিছু গরু মোষের বাথান। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শালবন, সেইরকম শালবন যা এইসব মাঠের মধ্যে ছিমছাম পরিষ্কার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশেপাশের ছোটছোট গ্রামের মধ্যে এই শালবীথি-গুলো কেমন পটে আঁকা ছবির মতো দেখতে। কিন্তু তারপরেই রায়ডাক রিজার্ভ ফরেস্ট। বাংলা দেশের পূর্বদিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত নিবিড় নির্জন ভয়ংকর অরণ্য। রায়ডাক নদী এই জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে তেড়েফুঁড়ে দক্ষিণগামী। এই নদীর পশ্চিম দিকে বেশ বড় একটা মাঠ। মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছবির মতো একটি গ্রাম। নাম মহাকালগুড়ি। মাঠখানা পায়ে হাঁটা পথের সাদা পৈতে গলায় দিয়ে সবুজ ঘাসে শিশিরে কুয়াশাতে জলকণাতে শীতল, কোমল। পায়েহাঁটা পথ পশ্চিমে সেই ছবির মতো গ্রামে এবং পূর্বে একটা খুব মজবুত পাকা পুল পেরিয়ে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে।

মহাকালগুড়ি গ্রামে বুনো মানুষদের বসতি। বনের শ্রমিক রাভা উপজাতিদের জন্য সরকারী বন-বিভাগ এই গ্রামের পত্তন করেছে। দোতালা সমান উঁচু করে কাঠের দেওয়াল এবং পাটাতন দেওয়া বাড়ি। টিনের দোচালা ছাদ, বেশ যত্ন করে প্রতিবছরে লাল রং ফেরানো। দুশোটি পরিবারের জন্য দুশো এমনি ঘর লাইনবন্দী হয়ে দক্ষিণমুখো এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তিনটি সারিতে এই দুশো বাড়ি বানানো হয়েছে। দুসারির বাড়ির মাঝখান দিয়ে সরকারী ঢালা রাস্তা। এই এলাকাজুড়ে সাজানো বাড়িগুলোতেই কিন্তু গ্রাম শেষ নয়, পশ্চিম-পাশে একটি বিস্তর্ণি এলাকাজুড়ে প্রতিটি পরিবারের অতিরিক্ত আত্মীয়স্বজন, বুড়োবুড়ি এবং কামিনদের জন্য কাঁচা বাড়ি আছে। বাড়িগুলোর নিকানো উঠান, পরিষ্কার ডোয়া, দেওয়ালে রাশিচক্রের মতো সবুজে কালোতে কিছু বিচিত্র আলপনা। প্রতিটি পরিবারের জন্য একখানা করে তাঁত ঘর, হাঁসমুরগী এবং শুয়োরের খাঁচা। গ্রাম শেষ হলে প্রায় তিন বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে রাভারা ঝুম চাষ করছে। গ্রামের শেষে এই উন্মুক্ত অঞ্চলে সবুজ লতাপাতার একটা তীব্র গন্ধ সবসময় পাওয়া যায়।

কৃষিকাজের ক্ষেত্রে রাভারা এখনও সার, জলসেচ এবং একই জমিতে একাধিক ফসল ফলানোর কৌশল জানে না। গড়ে তিন বৎসর তারা এক একটা জমিতে চাষবাস করে এবং

তারপর সেই জমি ফেলে অন্যজমিতে সরে যায়। জমির সংগে রাভাদের মানবিক সম্পর্ক কোনদিন গড়ে ওঠে নি। অন্যদিকে সরকারী বনবিভাগের সংগে তাদের মূল সম্পর্ক মজুরীর বিনিময়ে অনিয়মিত এবং অতি অল্প কাজ করা। যে কোন বিচ্ছিন্ন উপজাতির মতোই রাভাদের যৌথ জীবনের তাই কোন বনিয়াদ নেই। কোন রক্ষাকবচকুণ্ডল এই উপজাতিদের সামগ্রিক অবলুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারছে না।

রাভারা প্রকৃতির সংগে নিজেদের একটা সম্পর্ক নিজেরাই রচনা করেছে,—আর সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাভারা মনে করে যে রায়ডাক নদী, অরণ্য, জয়ন্তিয়া পাহাড়, সবজে মাঠ, মহাকালগুড়ি বস্তির একমাত্র নিয়ামক তারা। তাদের সমস্ত পূজাপাঠ, সংস্কার, ব্রত, গান, নাচ এই কর্তৃত্ব হারানোর ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। যে কোন আদি মানবগোষ্ঠীর মতো রাভারা মহাজ্ঞানী। এক অদৃশ্য নিয়তি, যার অন্য নাম ইতিহাস, তার অস্তিত্ব তারা জানে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা হেরে যাচ্ছে। তাই একদিকে স্বাভাবিক নিয়মে মহাকালগুড়ির স্থিতিস্থাপকতার অনিবার্যতাকে তাদেরই শাসনক্ষমতা এবং সমষ্টিগত উৎকর্ষের সাফল্যের চরম প্রকাশ ভাবে। যে মানবগোষ্ঠী অর্থনৈতিক শ্রেণীচেতনার আলো থেকে বঞ্চিত এবং তজ্জনিত কারণেই সংগঠিত হতে অপারগ তার মতো অন্ধ এবং পশু আর কেউ নয়। এই কারণেই রাভারা আস্তে আস্তে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে একটি সুন্দর সবল মানবগোষ্ঠী। মেয়েরা দল বেঁধে কাপড় কাচতে আসে সকালে। একটা মোটা বেঁটে কাঠের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ওরা একগাদা সেদ্ধকরা কাপড় কাচে। কাপড় কাচার শব্দগুলো কাটাকাটা হয়ে একটার পর একটা ঢিলের মতো জঙ্গল থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। এই সময়ে মেয়েরা গান করবেই করবে, গানের তালে তালে পাথরের ওপর কাপড় আছড়াবে। শব্দগুলো জঙ্গলে ছুটে যায়, ফিরে আসে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, মনে হয় কোথায় যেন খুব বিশ্রি হচ্ছে।

মাথা ঘসবার সময় মেয়েরা ক্ষারে ভেজানো চুল মাথার ওপর দিয়ে উল্টে দেয়। একজন আর একজনের মাথা ঘসে দেয়। এই সময়ে ঐ সব নারীদের ঘাড়েরা অংশ, যা সাধারণত চুলে ঢাকা থাকে, অনাবৃত হয়ে পড়ে। রাভা রমণীদের ঐ অনাবৃত অংশ মঙ্গোলীয়পীতাভ, পাকা জামরুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওদের স্নান যখন শেষ হয় তখন নদীসংলগ্ন মাঠে মেলে দেওয়া রংবেরঙের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে কড়মড় করছে। সেই টাটকা রোদ্দুরে সদ্য শুকনো কাপড় পরে, জলভরা কলসি মাথায় নিয়ে দলবেঁধে ওরা বস্তির দিকে রওনা হয়। গভীর অবগাহন স্নানের পর এই রমণীদের মুখগুলো একটু ফ্যাকাশে লাগে, ওদের তেলহীন ভেজা চুল দুভাগে ভাগ হয়ে ডান এবং বাঁ কাঁধ বেয়ে বুকের দুদিকে পড়ে। শীতের ছোটবেলাতে বিকেলের ছায়া, কলসীগুলোর ছায়া একদল শিশুর মতো ওদের পাশে পাশে চলতে থাকে।

বস্তির বালকবালিকারা সমস্ত গরুবাছুর নিয়ে সকালেই জঙ্গলে ঢোকে। তারপর সারাদিন এক বিরাট এলাকা জুড়ে ওরা চরে বেড়ায়। প্রত্যেকটি গরু এবং বাছুরের গলাতে একটা করে ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যাতে ওরা দূরে গেলেও ঘণ্টার শব্দে হদিশ করা যায়। সেই সকাল থেকেই সারা জঙ্গল গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর প্রতিধ্বনিতে সংগীতময়। রায়ডাকের বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর দিয়ে সেই প্রতিধ্বনি যখন সাঁতার কেটে এপারে আসে তখন তা ভাগীরথী-তীরে পাঁচশত বৎসরের পুরাতন কোন পর্তুগীজ গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মতো প্রাচীন এবং পৌরাণিক।

গরুর পাল এবং রাখাল জঙ্গল ও জনপদের সংযোগরক্ষাকারী সেই মাঠে পৌঁছালেই

রাভাবস্তিতে উনোনে উনোনে ভাতের হাঁড়ি চড়ে। সূর্যঘড়ির সেই বিখ্যাত ছায়া রায়ডাকের তীরে ক্লান্ত রাখালের মতো নিদ্রিত থাকতে থাকতেই পুরুষেরা জঙ্গলের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। সেই ছায়া অন্তর্জলী যাত্রায় শায়িত মুমূর্ষু রূপে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই সবাই খেতে বসে যায়।

জয়ন্তিয়া পাহাড় যখন অন্ধকারে আকাশে প্রায় বিলীন হয়ে যায়, রায়ডাক থমথম করে, জাদুকরের রঙ্গুর মতো কুয়াশা গগনগামী, ঘোলাটে আকাশে চাঁদও একখণ্ড বিমূর্ত খদ্যোততুল্যপ্রভ, গভীর অরণ্য থেকে বিচিত্র শব্দ আলাদা আলাদা কিন্তু পরিণামে এক এবং প্রতিধ্বনিতে মূর্ত,—তখন এই মাঠে শালের গুঁড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে পাণ্ডা সর্দার প্রথম এসে বসে। দু হাঁড়ি হাড়িয়া আগুনের একপাশে পড়ে থাকে, হাঁড়ি দুটোর একাংশ আগুনের শিখাতে আলোকিত কিন্তু অধিকাংশই অন্ধকার, ফলে হাঁড়ি দুটোকে দুটো বিমূর্ত বিগ্রহের মতো দেখায়। আগুনের বৃত্তের বাইরে দুটো সানকীতে শুয়োরের নাড়িভাজা এবং ছোলা সেদ্ধ। ভোগের দুটো থালার মতো সানকি দুটো বিগ্রহযুগলের সামনে পড়ে থাকে।

পাণ্ডা সর্দার তার বিয়াল্লিশ বছরের জীবনের বত্রিশ বছর রায়ডাকের জঙ্গলে কাজ করছে। প্রথমে গরু চরাতো, তারপর শুকনো পাতা আর কাঠ কুড়িয়ে আঁটি বেঁধে এখান থেকে উনিশ মাইল দূরের জনপদে ফিরি করে বেচতো। তখন এই ড্রায়ার্সে সরকার পাকা বাড়ি করে দেয় নি। রাভারা লতাপাতার কিংবা খড়ের ছাউনি দিয়ে ঘর বানাতো, গ্রাম বসাত, বনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে পেতো চার আনা পয়সা। তখন বছরে নয়মাস বর্ষা। একটানা তিনমাস রোদ উঠতো। প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটারে পিঁপড়ের মতো মানুষ মরতো। ডাক্তার বদ্যির কোন নামগন্ধ ছিল না। আলিপুরদুয়ারে গোরুর গাড়ি নিয়ে যেতে দুদিন একরাত্তির লাগতো। কুকুর আর বেড়ালের মতো বাঘ এসে ঘরের দরজা আঁচড়াতো। সন্ধ্যে থেকে নেকড়ের চোখ জ্বলে জ্বলে উঠতো, চিতাবাঘ শুকনো পাতা চারপায়ে মড়-মড়িয়ে ওং পেতে বসে থাকতো, কথা নেই বার্তা নেই প্রতি বৎসরেই একটা না একটা গুণ্ডা হাতী এসে রাভা বস্তি তোলপাড় করে যেত।

এই বিজন বনে এমন সব জায়গা ছিল যেখানে মানুষ পৌঁছাতে পারতো না। কতো তার আব্রু ছিল, পর্দা ছিল, ইজ্জত ছিল। এখন জঙ্গলের কাপড় খুলে হাজার হাজার বেজন্মা তার ওপর বলাৎকার করছে। বনের ভিতর প্রায় পাকা সড়ক বানানো হয়েছে। গাড়ি করে এখন এই জঙ্গলের যেখানে খুশী যাও।

একটা বুড়ো বাঘ ছিল এই রায়ডাকে। লোকে বলত দেওবাঘ, পাণ্ডা ঐ বাঘটাকে রাতেবিরেতে এমনকি দিনদুপুরেও দু-একবার দেখেছে। কিন্তু বাঘটার একটা পাকা নিয়ম ছিল—সে ঠিক সন্ধেবেলা এই মাঠের উত্তর কোনা ঘেঁসে নিঃশব্দে এসে নদীতে জল খেয়ে আবার চলে যেত। কোনওদিন কারও কোন ক্ষতি করে নি। এমনি চলছিল অনেকদিন। সবাই ভাবতো এই বুড়ো বাঘ আসলে বাঘ নয়, এই জঙ্গলবাড়ির কর্তা দেও, প্রতি সন্ধ্যাতে বাঘের রূপ নিয়ে এসে সব দেখে শুনে বেড়ায়। কোন দিকে সেই বুড়ো বাঘ চাইতো না, তার সামনে মানুষ কি জানোয়ার পড়লে পাশ কাটিয়ে যেতো। বুড়ো বাঘটা এই জঙ্গলের অংশ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে সবাই তার খোঁজখবর নিত।

আজ থেকে ঠিক দুবছর আগে এমনি শীতকালের সন্ধেবেলাতে পাণ্ডাসর্দার ও অন্যান্য রাভা পুরুষরা আগুনের পাশে বসে হাড়িয়া পান করছিল, আচমকা অনেক-

গুলো গুলির আওয়াজ হোল। দূর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ওদের হুসিয়ার করে দিয়ে বললো, কেউ যেন জায়গা ছেড়ে না ওঠে—এক পা এগুলেই গুলি করবে। ততক্ষণ বুড়ো বাঘের আর্তনাদে সারা রায়ডাক আর মহাকালগুড়ি কাঁপছে। তারপর থেকে আর কেউ কোনদিন ঐ বুড়ো বাঘটাকে দেখে নি।

বিচিত্র কম্বল গায়ে দিয়ে রাভাপুরুষরা এক এক করে এসে আগুনের চারপাশে বসছে। এই বিজনমাঠে লকলকে শালকাঠের আগুন প্রায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই শীতের কুয়াশায় চিত্রবিচিত্র কম্বল গায়ে সুরাপানরত মূঢ় রাভা পুরুষরা সমস্ত চিত্রটাকে রাজকীয় করে তুলেছে। কারণ রাভারা বেশী কথা বলে না, তাদের প্রকাশভঙ্গি এবং উচ্ছ্বাস নিতান্ত সীমিত। আসলে এই অন্ধকারে লেলিহান অগ্নিশিখাই একমাত্র আশার সঞ্চার করতে পারে, অভয় দিতে পারে, বেঁচে থাকার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। বস্তিতে মেয়েরা তখন সমবেত গান ধরেছে—

চিকা জরেইঙ্ পান জেরেঙ্
ঘুঘু মাংসা হাপ্‌চো
ওকই মালাম্ মালাম্
বনেইঙ্
ওকই আপন হেপা ॥

আগুন, যূথবদ্ধ সুরাপান, নারীকুলের সমবেত গান—এই সমস্ত একটা বিন্দুতে এসে মিলে একাকার হয়ে যায়।

রায়ডাক অরণ্য মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। উত্তরের পুরো অংশ শালবন, দক্ষিণে সেগুন আর টিকের আবাদ, পুবে গর্জন, শিমুল এবং বেতের গভীর জঙ্গল, পশ্চিমে পুরোটা নতুন আবাদ।

উত্তরে শালবনে শালপ্রাংশু মহাভুজ বনস্পতির দল সোজা আকাশের দিকে, তাদের কাণ্ডগুলি মোটা, বলবান মল্লদের নগ্ন জঙ্ঘার মতো। ঘন পাতার নিরবচ্ছিন্ন বুনোনি ভেদ করে সূর্য এখানে তাকাতে পারে না। আলো-আঁধারির একটা লুকোচুরি, আলোছায়ার জাল, মুঘল স্থাপত্যের কিছু জালি, রাজপুত বীরদের দীর্ঘ উজ্জ্বল সোজা দুএকটি আলোর বর্শা, ছুটন্ত ছায়া, করোটি চক্ষুর মতো কিছু কিছু অন্ধকার জায়গা এই অঞ্চলে পাওয়া যাবে। আরও ভেতরে শোনা যাবে কল্লা ঝিঁঝিঁ পোকাদের না থামা চিৎকার। বনমুরগীর চকিত একটি কি দুটি ডাক এবং তারপর অব্যর্থ চুপচাপ। আরও ভেতরে ঢুকলে কি শোনা যাবে, কি দেখা যাবে, কি ভাবা যাবে সেটা কেউ জানে না। তবে বড় বড় বাঘ এবং চিতা নাকি পাওয়া যায়।

দক্ষিণে সেগুন আর টিকের আবাদে একটা চন্দন-চন্দন গন্ধ পাওয়া যায়। এখানে গাছগুলো এখনও সাবালক হয় নি, কিন্তু ডালপালা পাতাতে গভীর হয়েছে। গাছগুলোর তলা নিড়িয়ে পরিষ্কার করা। ফলে একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছের দূরত্বটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। শীতের দুপুরে কলসী কাঁখে ঘোমটা দেওয়া একদল বউ দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও একটু দাঁড়াতে হবে এবং তারপর বোঝা যাবে এগুলো এক ঝাঁক ছায়া। তাছাড়া শূন্যে দোদুল্যমান রজ্জুর মতো কিছু কিছু ঝুলন্ত সূর্যরশ্মি, বনপথ জুড়ে জেব্রার পিঠের মতো আলোছায়া—ছায়া—আলো।

এই বন জুড়ে শীতকালে টিয়ারা একেবারে আসর জমিয়ে বসে। সারাদিন তাদের

কোলাহল। বনমুরগীদের আড্ডাও এইদিকেই। যদিও ওরা দারুণ চালাক, চট্ করে পাত্তা পাওয়া মুস্কিল। সন্ধ্যার দিকে প্রচুর লাফারু দেখা যাবে, সজারু ঝমঝমিয়ে হাঁটবে, খাটাসের বিকৃত ডাক শোনা যাবে, ফেউএর কান্নাতে ভয় লাগবে। কালো বনশুয়োরের দল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তচনচ করে গুপ্তধন খোঁজে।

পূবের গর্জন আর শিমুলবন এই বনের অবহেলিত অংশ। ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। নিরক্ষীয় লতাপাতাতে এইজন্যই বন খুব গভীর এবং চুপচাপ। শুধু মোটা মোটা ডাল জুড়ে বহু মৌচাক ঝুলছে। গাছের কাণ্ড এবং পাতা লাল ডেঁয়ো পিঁপড়েতে ভরা, বর্ষাকালে কালো টুসটুসে জোঁক বিষ্টির মত ঝুপঝুপ করে নিচে পড়ে। বিষাক্ত বিছে এবং সাতরঙ্গা ফড়িং দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। সংগঠিত বনাঞ্চলে যেমন পথঘাট বানানো হয় এদিকে তেমন কিছু নেই। বুনো হাতীর দল এই দিকটাতে চড়ে বেড়ায়। দুমানুষ সমান হাতী ঘাসে সমস্ত অঞ্চল একেবারে অদৃশ্য। অন্ততঃ হাতে গোনা দশটি গণ্ডার এদিকে অবশ্যই আছে। সাক্ষাৎ যমদূতের মতো ভালুক দুপায়ে হেঁটে বেড়ায়। পশ্চিমের পুরো অঞ্চলে নানারকম দামী গাছের নতুন আবাদ। বালক দলের মতো লকলকে বাচ্চা গাছগুলো শিশিরে বিষ্টিতে আলোতে ঝলমল করে। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলো এই টাটকা গাছগুলোর কালচে লাল পাতা বেয়ে চলকে পড়ে। এখানে রাতে সাম্বার, নীল গাই আর চিত্রিত হরিণের দল ঝাঁক বেঁধে আসে কচি পাতার লোভে। ঘুঘুর ঝাঁক সারাদিন খুব গভীর শান্ত স্বরে ডাকে। কালো ভালুক গলায় সরু একটা সাদা বৃত্ত নিয়ে পোকামাকড় ধরে খায়। নেকড়ের দল ওৎ পেতে বসে থাকে অন্ধকারে। রায়ডাকে ফেলিং বা গাছকাটা অনেকদিন বন্ধ। সেইজন্য রায়ডাকে কোথাও ফাঁকা, পোড়া, শূন্য জায়গা নেই। রায়ডাকের সারাটা দেহে কোন ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যাবে না, এমনকি একটা জরুলচিহ্ন পর্যন্ত না।

শীতের শেষে ফুলে ফুলে শালবন ভরে যায়, সেই ফুলের তীব্র মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ম ম করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে মধু সংগ্রহ করে। বড় বড় প্রজাপতি, খুদে মাছি, দলে দলে কাঠবেড়ালির ভিড় লেগে যায়। রাভা বস্তিতে এই সময় জ্বরের মহামারী সুরু হয়। শাল ফুলের গন্ধে নাকি জ্বর আসে, সেই জ্বর ঠিক রোগ নয়, একটা নেশা। প্রবল জ্বরেও মানুষ পুরো বেহুঁশ হয় না, কিন্তু ধাপে ধাপে অবচেতনার স্তর থেকে স্তরান্তরে নামতে থাকে, নামতে নামতে তারা আলো-অন্ধকারময় গোধূলিতে নানা ছায়ামূর্তি দেখে নানা সংলাপ শোনে, টুকরো টুকরো গানও কোথা থেকে ভেসে আসে। তারপর একটা কালো, খুব কালো, পর্দাতে চেতনা ঢাকা পড়ে, আর কিছু মনে থাকে না। বর্ষাকালে কাকের ডিমের মত কালো মেঘচাপা সূর্যালোকে কেমন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, মেঘমণ্ডলীর আড়ালে কেউ যেন হ্যাজাক লাইট জ্বেলে দিয়েছে। দু একটি নিঃসঙ্গ ময়ূর এখনও দেখা যায়। তবে তারা পেখম মেলে না।

শরতে আকাশের রং জীবন্ত এবং তন্ময়, রায়ডাক ফরেস্টের বনস্পতিদের শীর্ষদেশগুলো এক নিরবিচ্ছিন্ন নিশ্ছিদ্র সবুজ মহাদেশের মতো মহাশূন্যে কাঁপতে থাকে, একটি বহুবৃদ্ধ ধনেশ পাখি তার বিরাট দুই পাখা দুপাশে ছড়িয়ে বাঁকানো বর্শার মতো ঠোঁট নিয়ে পৌরাণিক জটায়ুর মতো ঘুরে ঘুরে এই অরণ্যের শীর্ষদেশ প্রদক্ষিণ করে। আসলে পার্বত্য বর্ষার তমসা আর অন্ধকার রহিত, সূর্যের ওপর কোন ছায়া নেই, শিশুর হাতের তেলোর মত রোদটুকু মিষ্টি আর তুলতুলে,—ঠিক এই রোদে তেল না দেওয়া চুল খুলে রোদে বসে একজন রাভা রমণী অন্যের মাথার উকুন বাছে, এই রোদে এই রমণীদের ভীষণ

উক্ত এবং পরিত্রাতা মেরী মাতার মতো লাগে।

মহাকালগুড়িতে সকাল হোল। মোরগরা দারুণ ডাকাডাকি সুরু করেছে। এমনি সময়ে চার বুড়ো যারা রায়ডাকের পারে পৌঁছে গিয়েছিল তারা হাঁফাতে হাঁফাতে বস্তিতে ফিরে এলো। বুড়োদের চোখ তখন প্রায় উল্টে যাবার অবস্থা, এত হাঁফাচ্ছে যে নিশ্বাস নিতে পারছে না। তখনও নারী পুরুষ বালক বালিকা সবাই বস্তিতে, সুতরাং একটা বিরাট জনতা মুহূর্তে সেই চারজন বুড়োকে ঘিরে ধরলো, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেউ কিছু বুঝতেই পারলো না ব্যাপারটা কি। কিন্তু ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে এটা বুঝতে কারও কোন অসুবিধে হোল না। পান্ডা সর্দ্দার এসে বুড়োদের ঝাঁকাতে লাগলো। কিন্তু বুড়োরা এতো ঝাঁকানি এবং পান্ডার চিৎকারেও তখনি কিছু বলতে পারলো না। প্রায় দুঘটি করে জল খেলো এক-একজন, তারপর চোখের কোনা মুছে, ঠোঁটের ওপর হাতের চেটো ঘসে, অনেকবার কাশতে কাশতে, থেমে থেমে, তারা যা দেখেছে খুলে বললো।

পান্ডা সর্দারই প্রথম কথা বললে। পঞ্চায়েতের সদস্য ছাড়া আর সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিল। পান্ডা পরিষ্কার গলাতে, ধীরে ধীরে, আজ বস্তির বাইরে কাউকে যেতে নিষেধ করলো। জঙ্গলের কাজ বন্ধ করে দিল।

রাভা পঞ্চায়েতের পাঁচজন সদস্য এবং তার মুখিয়া পান্ডা সর্দ্দার কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না যে সমস্যাটা কোনদিক থেকে বিচার করবে। রাভারা চায় সকাল হবে, দুপুর হবে, সন্ধ্যা হবে, রায়ডাক প্রবহমান থাকবে, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সেই চূড়াটা বরফের টুপি পরে পাদ্রীসাহেবের মতো প্রার্থনায় রত থাকবে। এই নির্ভুল প্রাকৃতিক সংগঠন এবং নিখুঁত নৈমিত্তিক রোজনামচার বাইরে যদি কোন ব্যতিক্রম আসে, কোন ঘটনা ঘটে, কোন প্রতিরোধ আসে, তবেই তারা ভাবে এই আদি প্রকৃতির ওপর তাদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে গেছে। আজকের ঘটনাতেও সেই নিরাপত্তাবোধের অভাবে পঞ্চায়েত অসহায় বোধ করল।

রাভাদের পঞ্চায়েৎ কেবলমাত্র বিয়েসাদির বিচার আচার করে, জরিমানা আদায় করে, ভয় দেখায়। কোন ছোকরা কোন ছুকরীর সাথে লটপট করল, অমনি তার দুশোটাকা জরিমানা হলো। কোন রাভাই একসঙ্গে দুশো টাকা বের করতে পারবে না, ফলে পান্ডা সর্দার তাকে টাকা ধার দেবে। কিন্তু পান্ডাই বা একসঙ্গে এতো টাকা পাবে কোথায়, সুতরাং সলসলাবাড়িতে সুকুল কাইয়া খুতি নিয়ে বসে আছে, মাসে শতকরা দশটাকা সুদে টাকা আনবে, প্রতিমাসে তলব বাঁটবার সময় পান্ডা সুদের টাকা কেটে নেবে, না কুলোলে ক্ষেতের শস্য দিয়ে পুরো করতে হবে, তা না হলে ব্যাগার খাটতে হবে। এই ব্যবসায়ে সুকুল কাইয়ার সঙ্গে পান্ডার ভাগ একেবারে আধাআধি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজে সবসময় মেটে না। মাঝে মাঝে খুব গোলমাল হয়ে যায়। তখনই পঞ্চায়েতের বড় মুস্কিল। সে মুস্কিল সনাতন এবং ঐতিহাসিক। তার উদাহরণ একবছর আগে এই মহাকালগুড়িতেই পাওয়া গেছে।

ছেলেটার ডাক নাম ভূপিন, ভালো নাম কামেন, স্কুলে নাম লিখিয়েছিল সান্তারাম। ছেলেটা সন্তালপুরের মিশনারি স্কুলে পড়তো। পড়তে পড়তেই উপজাতি কল্যাণ বিভাগ থেকে একটা চাকরী পেল। বেশ ভালো বেতন। ছেলেটির কাজ হোল রাভাদের আইডিন খাওয়ানো এবং লজ্জাবতীলতা থেকে সংক্রামিত ওদের পায়ে যে বিষাক্ত ঘা তার নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা। সান্তারামকে জেলা হাসপাতালে এই জন্য তিনমাস তালিম দেওয়া হলো। কিন্তু তালিম নিয়ে সান্তারাম ফিরে এলে পান্ডা তার পেছনে

লাগলো। পান্ডার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে না গিয়ে সান্তারাম নিঃশব্দে নিয়মিত কিছু-কিছু বাছাই করা গলগন্ড এবং আসামী ঘায়ের রুগীর চিকিৎসা করে চললো। চিকিৎসায় হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। রোগযন্ত্রণাতে কাতর রোগীরা পান্ডার অপ্রত্যক্ষ চোখরাঙানী গ্রাহ্য না করে সান্তারামের চিকিৎসা সাগ্রহে গ্রহণ করলো।

রায়ডাকের জল এবং জঙ্গলের লতা রাভাদের কাছে পবিত্রতা এবং অন্নদাতার প্রতীক। কিন্তু রায়ডাকের আইডিনহীন জল ডাইনী আর বনের লতা সংমা,—তা থেকেই রাভাজাতির দুই রোগ গলগন্ড এবং দূষিত ক্ষতের জন্ম, এটা প্রমাণিত হোক পান্ডা তা কিছুতেই চাইছিল না। সান্তারাম প্রথম কিস্তিতে জিতে গেল। পান্ডা তালে থাকল কবে তাকে বাগে পাওয়া যায়। সান্তারামকে কিন্তু সহজেই বাগে পাওয়া গেল। সান্তালপুরের হেলথ সেন্টারে একটি খৃষ্টান মেয়ে হেলথ্ অ্যাসিস্টান্টের কাজ করে। তার কাজের এলাকার মধ্যে মহাকালগুড়িও পড়ে। মেয়েটি ছিপছিপে, দুই বেণী করে চুল বেঁধে রোদে মুখ লাল করে সাইকেলে সান্তারামের ডিসপেনসারিতে শুক্রবার আর সোমবার আসতো। সান্তারাম খুব মন দিয়ে কাজ করতো, আর মাঝে মাঝে তার ছোটছোট চোখ জ্বলজ্বল্ করে সেই মেয়েটির দিকে তাকাত। ক্রমে ক্রমে মহাকালগুড়ি, সন্তালপুর, সলসলাবাড়িতে মাঝে মাঝেই ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল। এর কিছু দিন পরেই সান্তারামের বাবা পান্ডাকে নালিশ করলো যে সন্তালপুরের গির্জাতে সান্তারাম খৃষ্টান মতে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। এবং সান্তারাম নিজেও খৃষ্টান হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাতেই রাভা বস্তির ঐ বিখ্যাত মাঠে রবরবিয়ে পঞ্চায়েৎ বসলো। সান্তারাম কিন্তু এটা আগে থেকেই অনুমান করেছিল এবং আলিপুরদুয়ার কোর্টে এস. ডি. ওর সঙ্গে দেখা করে সাবডিভিশনাল মেডিকেল অফিসারের সুপারিশে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য পেল। সন্ধ্যাবেলাতে যখন পঞ্চায়েতে সান্তারামের কঠিনতম শাস্তির কথা আলোচনা হচ্ছে তখন ফরেস্ট রেঞ্জারকে নিয়ে থানার বড়বাবু এলো। বড়বাবু এবং রেঞ্জারবাবু পান্ডাকে ডাকিয়ে পরিস্কার ভাবে জানালো, সান্তারামের বিবাহ এবং ধর্মান্তর পুরোপুরি আইনসম্মত। পান্ডার বা পঞ্চায়েতের বিচার করার কোন এক্তিয়ার নেই; তাছাড়া সান্তারাম আর তার স্ত্রী দুজনেই গভরমেন্টের চাকুরে, তাদের ওপর কোন অত্যাচার হলে পান্ডাকে পুরোপুরি দায়ী করা হবে। এরপর পঞ্চায়েতের পাঁচবুড়ো মাথা নীচু করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। সান্তারাম সেদিন সন্ধ্যাতে হা হা করে সারা গা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতেই বললো, সর্ষে ক্ষেতে কাক তাড়াবার জন্য বাঁশের ওপর কালো পাতিল বসানোর কোন প্রয়োজন নেই, পঞ্চায়েতের পাঁচজন মেম্বারকে পাঁচকোনায় দাঁড় করিয়ে দাও, এই জীবন্ত কাকতাড়ুয়াদের দেখে কোন কাকের সাধ্যও থাকবে না সর্ষেক্ষেতের ত্রিসীমানাতে আসবার।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল খাইচরণের বুড়ী মাকে নিয়ে। ঐ বৎসর বর্ষাশেষে মহাকালগুড়িতে খুব খারাপ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলো। সান্তারাম আর তার স্ত্রী রাতদিন খেটে রুগীদের চিকিৎসা করতে লাগলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় চার পাঁচটি শিশুর মৃত্যু ঠেকানো গেলো না। কিন্তু পান্ডা সর্দার আর পঞ্চায়েতের চারজন সদস্য ঠিক করলো যে খাইচরণের মাকে ডাইনী ধরেছে, আর তার জনাই এই অসুখ বিসুখ, শিশুমৃত্যু। ফলে গোপনে পান্ডা খাইচরণের মাকে হত্যা করার চক্রান্ত করলো। ডাইনী চক্রের মারণ উচাটনের কুসংস্কারের ফলে এখনও এই অঞ্চলে প্রচুর বৃদ্ধাকে হত্যা করা হয়। সান্তারাম এই চক্রান্তের খবর কোনভাবে জানতে পেরে রেঞ্জার সাহেব এবং পুলিশের সহায়তায় বুড়িকে খুনের

হাত থেকে বাঁচায়।

আজ এসেছে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ। আজও পান্ডা আর পঞ্চায়েতের আর চারজন সদস্য প্রচুর বিড়ি পুড়িয়ে, রাশি রাশি হাড়িয়া গিলে, সারাদিন আলোচনা করেও কোন সমাধান খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার আগে আগে তারা রেঞ্জ অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিল।

পান্ডা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে চললো, তার পিঠে বন্দুক তার কোমরে টোটার বেল্ট, পেছনে মশাল হাতে চারজন বৃদ্ধ পঞ্চ তাকে অনুসরণ করলো।

পরদিন সকালে রেঞ্জারবাবু রাভা বস্তিতে এলো। সমস্ত রাভা নারীপুরুষদের নিয়ে ঐ মাঠে মিটিং ডাকলো। রেঞ্জারবাবু এবং পঞ্চায়েতের সদস্যারা সবাইকে বুঝিয়ে দিল, যাকে রায়ডাকের তীরে হাতীঘাসের বনে দেখা গেছে, সে প্রকৃতপক্ষে গভরমেন্টের সম্পত্তি। তাকে রক্ষার দায়িত্ব রাভাদের। কিছুদিন ধরে পোচারদের উৎপাতে জঙ্গলে কোন মূল্যবান প্রাণীকেই রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং রাভাদের নজর রাখতে হবে। কারণ আশেপাশে কিছু সাংঘাতিক পোচার আছে। তারা গন্ডারের নাসাখড়্গ পর্যন্ত কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং রেঞ্জারবাবু পান্ডার সবাইকে সজাগ থাকতে বললো। ঘটনাটা ডি. এফ. ও. অফিসে রিপোর্ট করার জন্য সেই সকালেই রেঞ্জারবাবু রাজাভাতখাওয়া রওনা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সমস্ত ঘটনাটা নিজে গিয়ে দেখে আসবার জন্য রেঞ্জারবাবু পান্ডাকে নির্দেশ দিল। পান্ডার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য রেঞ্জ অফিস থেকে একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চও এসে গেল।

পান্ডা সমগ্র ডুয়ার্সে একজন নামকরা শিকারী। পায়ের দাগ দেখে জন্তুর নাম, বয়স, লিঙ্গ নির্ণয় করার দুর্লভ ক্ষমতা পান্ডার আছে। তাছাড়া গভীর বনে ঝরাপাতার মর্মর শুনে পান্ডা বলে দিতে পারে কোন জন্তু হাঁটছে, তার আয়তন কত বড়, কতো দূরে কোন দিকে মুখ করে এগুচ্ছে। এ বনের সমস্ত অঞ্চল, প্রবেশ এবং নির্গমন পথ, কোন অংশে কোন সময়ে কোন জন্তু পাওয়া যাবে—এ তথ্য পান্ডার নখদর্পণে। বনেবাদাড়ে পান্ডার একমাত্র সঙ্গী তার বন্দুক, টোটার বেল্ট। পান্ডা গভীর বনে যখন যায় তখন একেবারে একা একা যায়। জোছনাতে নিজের ছায়াটাকে পর্যন্ত তখন অসহ্য মনে হয়। গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপান করার পর পান্ডা অধিকাংশ দিন রাতেই বনে যায়। আসলে পান্ডার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অরণ্য আছে। এই অরণ্য তার অস্তিত্বেরই অংশ, জঙ্গলের বোঁটাতে সে ফলের মত ঝুলছে।

পান্ডা সম্পর্কে এ ব্যাপারে দুটো মত প্রচলিত আছে। পান্ডার চরিত্রে নারীর প্রতি একটা প্রচন্ড অনাসক্তি আছে। রাভাদের মধ্যে এটা খুবই দুর্লভ। রাভা রমণীদের গায়ের রং শরৎকালের মধ্যরাত্রির মতো পান্ডুর, মনে হয় সেই রঙের মধ্যে গভীরতা আছে, স্তরভেদ আছে। কিন্তু পান্ডা ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাই রাভারা বলে পান্ডা নানা তুকতাক জানে, আর তারই ফলে রায়ডাক জঙ্গলের ভেতর দিকে রোজরাতে মৃতাপত্নীর সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে।

পান্ডা সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হলো সে ভুটান থেকে পাচার হওয়া নানা প্রকার মূল্যবান জিনিষের স্মাগলিং করে। তাই বনে জঙ্গলে সারারাত লোকচক্ষুর অন্তরালে সে তার কাজকর্ম চালায়।

পান্ডার লম্বা লম্বা লালচে চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, কপাল ঘিরে একটা কালো সুতো

বাঁধা, বড় চুল যাতে কপালের ওপর এসে না পড়ে, নাকটা রাভাদের মত বোঁচা নয় একটু তীক্ষ্ণই বলা চলে, চোখ দুটো গোলগোল, কিন্তু ঠোঁটটা খুব লাল। রাভাদের দাড়িগোঁফ এমনিতেই কম। যেটুকু আছে সেটুকুও পান্ডা কোনদিন কামায় না।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পান্ডা একটা খাকি হাফ প্যান্ট, কালো রংএর একটা গোলগলা গেঞ্জি, লাল কেডস পরে। গলায় একটা নিকেল জাতীয় ধাতুর মালা। পান্ডা কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে যখন বনের পথে একা একা ঘোরে তখন তাকে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী অথবা যীশু যীশু লাগে।

আসলে অরণ্যের সঙ্গে পান্ডার সম্পর্কটা মানবিক এবং মমতায় ভরা। পান্ডা অরণ্যের বিশুদ্ধতা এবং প্রাণিজগতের সংরক্ষণে বিশ্বাসী। এই জঙ্গলকে বাঁচানোর জন্য সে তার লম্বা রুক্ষ লাল চুল, তামাটে দেহ, লাল ঠোঁট নিয়ে পরিত্রাতার মতো ক্রুশে বিদ্ধ হতে রাজি।

পান্ডা এই দুপুর রাতে সরকারী হুকুমে সরেজমিনে তদন্ত করতে যাচ্ছে সেই ঘটনা, যা নিয়ে সারাটা মহাকালগুড়ি তোলপাড় হচ্ছে। রাত গভীর, অন্ধকার সূচীভেদ্য হলেও পান্ডা টর্চ জ্বাললো না। দুপাশে ঘন হাতীঘাস আর আসামীলতার জঙ্গল, মাঝখানে আইবুড়ো মেয়েদের সিঁথির মতো পায়ে হাঁটা পথ, শীতের কুয়াশাতে কম্পমান, একটা যবনিকা যেন সরে সরে যাচ্ছে। বেগবান ঠান্ডা বাতাস সরীসৃপ-নিঃসৃত শিষের মতো চরাচরকে চাবুক মারছে, আকাশের অন্ধকার এবং তারকামন্ডলীর নিস্তব্ধতা একটা সমান্তরাল রেখা হয়ে রায়ডাকের বৃক্ষরাজীর শীর্ষদেশে মিশে গেছে। নিহত নিশি ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে বনস্পতির ডালে ডালে ঝুলছে। নতুন আবাদে অনেকগুলো বার্কিং ডিয়ার ডেকে উঠলো, কোথা থেকে একটা নতুন চিতাবাঘ ক্রমে কয়দিন ধরেই খুব ডাকাডাকি করছে, রাতের পাখিগুলো খুব দ্রুতলয়ে অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে একেবারে থেমে গেল। পান্ডা স্পষ্ট বুঝতে পারল একটা নিঃসঙ্গ বাঘ নদীতে জল খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, একদল সাম্বার লম্বা লম্বা পায়ে ঝরাপাতাতে ঝরনার মতো শব্দ তুলে উধাও হলো, সেই পেঁচাটা যা এই নদীর পারের শিরিশ গাছটাতে বসে বসে রোজ ডাকে, আজও ডাকছে। পান্ডা একটুও তাড়াহুড়ো না করে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে এসে পৌঁছল। এতক্ষণ পান্ডা তেমন কিছু ভাবে নি। কিন্তু এখন সে নির্দিষ্ট; চারপাশ থেকে উঁচু সেই কাছিমের পিঠের মতো ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে বুঝলো এবার তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে।

পান্ডা ভীষণ ভয় পেলো। মুখোমুখি হওয়া একটুও মুস্কিল না, এই কাছিমপিঠ ঢিপির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ,—একটা বোতাম টিপলেই পিচকারির মতো আলোর ঝটকাতে সব সলক করে দেবে এবং সে তার অদৃষ্টকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। কিন্তু পান্ডার হাত যেন অবশ হয়ে এলো। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলো। আকাশে তাকাল। পান্ডা বুঝলো তার পায়ের নিচে কাছিমের পিঠ নড়ছে। কাছিমটা যদি চলতে চলতে রায়ডাক নদীর গভীরে তাকে পিঠে নিয়ে ডুব দেয় তাতে ক্ষতি নেই,—তবু ঠিক এখন কোনপ্রকারে সচেষ্ট, ক্রিয়াশীল হতে পারবে না, সে যাকে দেখতে এসেছে তাকে দেখতে চায় না।

পান্ডা চোখ বুঁজে রাভাদের গ্রামলক্ষ্মী এবং একমাত্র দেবী রুনতুক বাশেকের ধ্যান করতে লাগলো। রুনতুক আর বাশেক দুই বোন। একটা লাল নিখুঁত মাটির পাতিলের গলা পর্যন্ত চাল ভর্তি করে পাতিলের মুখে একটা ডিম বা তৌচি বসিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে চিংসাংগং বা চারকোনা বাঁশের মাচার ওপর সেই পাতিলটা বসিয়ে দেওয়া হয়,—এই বিমূর্ত বিগ্রহের নামই রুনতুক্। ঠিক এমনি আর-একটি ঘট একই উপচারে সাজিয়ে রুন্তুকের ডানপাশে বসালে সেটাই বাশেক নামে পূজিতা হয়।

পান্ডা মনে মনে মানত করতে লাগলো,—রুন্তুক্-বাশেক, আমাকে শক্তি দাও। ধূপদীপ দেবো। সিঁদুরে রাঙাব। কাপাস্ তুলো দিয়ে সাজাব। পিটুলি দিয়ে নৈবেদ্য দেবো। সাদালাল কাপড়ের টুকরোর অঙ্গাভরণ, মদ, শুয়োর আর আতপচালের ভোগ দেব,—আমার দুটো হাত চালু রাখ, পায়ের নিচের কাছিমটাকে থামাও, আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করো।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে পান্ডা জানে না, আস্তে আস্তে চোখ খুললো। পান্ডা এবার তার হারানো শক্তি ফিরে পেতে লাগলো। হাত নাড়িয়ে দেখলো ঠিক আছে। পা দুটো শক্ত হয়ে ক্রমে মৃত কাছিমের পিঠে ঠিকঠাক, শুকনো জীবের চারপাশে লালার সঞ্চার বুঝতে পারছে।

পান্ডা রুন্তুক্-বাশেক দেবী স্তোত্র উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে সুরু করলো—

হে রুনতুক্ বাশেক তোমরা দুটি বোন,
ওগো রুনতুক্ তোমাকে দিলাম সোনার ঘর
বাশেক, তোমাকে দিলাম রুপার ঘর,
তোমরা দয়া করো।
হাতীর পিঠে চেপে রাগ করে চলে যেও না
গোসা করে ঘোড়ার চড়ে পালিও না
হে দুই দেবী, আমাদের কৃপা কর।
হল জল জি নেউ, হল জল জি নাই।
সোনা নগউ না বউ, সোনা নত্তং নাও।
হত্তিরায় তাসায়
ঘড়া বউ তাসায়
হল জল জি নেউ, হল জল জি নাই।

পান্ডার কণ্ঠনিঃসৃত এই ছন্দোবন্ধ মন্ত্র শব্দব্রহ্ম হয়ে এই মহারণ্যের সমস্ত পশুপক্ষীর কণ্ঠনাদ, শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনি এবং সরীসৃপ বাতাসের কশাঘাতের আর্তনাদকে সমাধিস্থ করলো। মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত এই কবিতার পঙ্ক্তি অটবীমধ্যে মহাসমুদ্রের মতো গর্জন করতে লাগলো, শব্দব্রহ্মের আদিনিনাদ প্রবল শৈত্যপ্রবাহে এবং সূচীভেদ্য অন্ধকারে খদ্যোততুল্য স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রাণের সঞ্চার করলো। সকলের অলক্ষ্যে আরও একবার প্রমাণ হলো,—কবিতা অনাদি এবং অমর।

পান্ডা টর্চ জ্বাললো। টর্চটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, কিছুই দেখতে পেল না, তারপর অন্ধকারের তৃতীয়নেত্রনির্গত সেই আলো জ্যোতির্বলয়ে পরিণত হলো, দেবদেবীদের ছবিতে তাঁদের মাথার পেছনে যেমন একটি জ্যোতির্বলয় থাকে কতকটা তেমনি। সেই আলোর বলয় অনেকক্ষণ এদিক ওদিক, গাছের গুঁড়িতে, গাছ থেকে নামা মোটা মোটা লতাতে, একটা ছুটন্ত শেয়ালের গায়ে ঘুরে ফিরে এসে ওর মুখে পড়লো। ওর সারাটা কালো শরীর রাতের অন্ধকারে মিশে আছে, রাতের গা থেকে ওর শরীর আলাদা করা যাচ্ছে না, শুধু জ্যোতির্বলয়ের নীলাভ আলোতে ওর মুখখানা ভেসে উঠলো। ও যেন

কোন অবতার, অন্ধকার রাতের গর্ভ থেকে মাথা তুলে উঠে আসছে—ত্রাতারূপে।

পান্ডা দেখলো ওর চোখদুটো সাধারণ আর দশটা হাতীর মতো ছোট এবং কিছুটা বর্তুলাকার। কিন্তু সেই চোখে পুরাতন পৌরাণিক দিঘীর জলের মতো কালচে হিমেল গভীরতা। এই চোখ দুটোকে প্রথমে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাতে বিষণ্ণতাই প্রধান। বিরাট শুঁড় ঝুলছে, গালের দুপাশ থেকে বিরাট দু'টো মোটা দাঁত মসৃণ কিন্তু ভীষণদর্শন এবং প্রায় ভূমি ছুঁই ছুঁই।

পান্ডা আর দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালেনি, সুতরাং ঐ গজকে আরেকবার দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিংবদন্তি অনুসারে মুমূর্ষু হাতীকে তাড়িয়ে দেবার পর গভীর বনে কোন খরস্রোতা নদীর তীর ছাড়া আর অন্য কোথাও তার যাবার জায়গা থাকে না। সেই বৈতরণীতীরে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। হাতীর দেহে মৃত্যু অকস্মাৎ আসে না। সব স্টেশনে থামা মন্থর রেলগাড়ির মত মৃত্যু আস্তে আস্তে ঝিকমিকিয়ে আসে। কিন্তু কি করে কে জানে, শকুনরা সব কিছু টের পেয়ে যায়, জঙ্গলের আকাশে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে। বনের নানা অংশ থেকে শেয়াল, নেকড়ে অন্যান্য ছ্যাঁচড়া মাংসাশী প্রাণীরা মৃত্যুপথযাত্রী গজবৃদ্ধের আশেপাশে জড়ো হতে থাকে। মাটির তলা থেকে অগণিত লাল পিঁপড়ে, গাছের কান্ড বেয়ে বিষাক্ত লাল ডাঁই, কোথা থেকে কেউ জানে না, অগণিত খুদে মাছি হাতীটার চারপাশে একটা ব্যূহ রচনা করে। তারপর আস্তে আস্তে হাতীটা মারা যায়। চারপায়ের ওপর মুখ থুবড়ে বসে থাকলেও প্রথম কয়েকদিন কিছুতেই মনে হয় না হাতীটার দেহে প্রাণ নেই। আস্তে আস্তে মৃত গজের পেট ফুলতে আরম্ভ করে, সমস্ত দেহটা বেলুনের মতো ফুলে তিনগুণ হয়ে যায়। কিন্তু ফোলারও একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করলেই শবদেহের নানা অংশ ফেটে ফেটে হাঁ হয়ে যায়। পুচ্ছকে বিন্দু ধরে শুঁড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যদি একটা সরলরেখা টানা যায় তবে সেই সরলরেখা থেকে ম্যাপের সাংকেতিক উপনদীর মতো অগণিত ফাটল পিঠ বেয়ে পেটের তলা পর্যন্ত এবং সেই সব ফাটলগুলির মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা কৃমিকীট কিলবিল করে : শেয়াল আর নেকড়েরা প্রথমেই শুঁড়টাকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু শকুনরা লেজের দিক থেকেই সুরু করে, ডাঁই আর পিঁপড়ের দল শবের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে চলে যায়, পানভোজনের পর শুঁড়হীন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এবার শেয়ালরা ক্রমশ চারটি পা, হৃৎপিন্ড অনায়াসে খেয়ে নেয়, ফলে, বুকের দুপাশে, যেখানে পাঁজরা, সেখানে গুহামুখের মতো দুটো গর্ত দিয়ে একেবারে পেটের ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। দুর্গন্ধে বনের বাতাস আহত হয়, সুরেলা পাখিরা বনান্তরে উড়ে যায়। শবের দেহনিঃসৃত রস এবং পচা মাংসের স্বাভাবিক রূপান্তরে যে জৈবিক সারের সৃষ্টি হয় তা থেকে নতুন নতুন আগ্নজোলা চারাগাছ একমাসের মধ্যেই মাথা তোলে। শবদেহে পরিত্যক্ত মাংস এবং চামড়া মাটিতে মিশতে থাকে।

এমনি করে অনেকদিন কেটে যাবার পর বর্ষা আসে, তীক্ষ্ণ এবং অবিরত বৃষ্টিধারায় ধুয়ে ধুয়ে কঙ্কালটা পরিষ্কার হয় এবং ফুলে ফেঁপে ওঠা সেই খরস্রোতা নদী গভীর বিস্তৃত হয়ে মহাগজের কঙ্কালকে ডুবিয়ে কুলুকুলু নিনাদে চৈত্রমাস পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বয়ে যায়। তারপর সেই বিরাট কঙ্কালটা আর দেখা যায় না।

ঠিক রায়ডাকের পরে, যেখানে হাতীঘাসের বিরাট জঙ্গল বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে রেখেছে, সেইখানে হাতীটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতীটা একদম চুপচাপ। খরস্রোতা রায়ডাক এখানে

ভীষণ তীব্র এবং অসংখ্য পাথরের বাধাতে ফোঁসফোঁসাচ্ছে,—ফলে হাতীঘাস, বাঁশঝাড়, আর বৃক্ষ হাতীর জলে প্রতিফলিত ছায়া ছিন্নভিন্ন, অবয়বহীন, খণ্ডখণ্ড এবং পরিবর্তনশীল। শীতের সকালের আলোতে এই ছায়াগুলি সঞ্চরণশীল অনেকগুলি কচ্ছপ, দুপুরে সূর্য পশ্চিমগামী হলে এই টুকরো টুকরো ছায়াগুলি যেন জোড়া লাগতে থাকে এবং অবশেষে বিকেলে বিসর্জন দেওয়া কষ্টিপাথরের ভৈরবমূর্তি হয়ে অন্ধকারে লয় পায়।

পরদিন সকালে নদীর পূবপারে রাভা পুরুষরমণীদের প্রচণ্ড ভিড় হলো। সবাই সমবেত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখতে লাগলো। সমবেত রাভা জনতা সার্বজনীন হতাশা,—সেইজন্যই মহৎ, মহাসমুদ্রে মধ্যরাত্রির মতো প্রগাঢ়, বর্ষণক্লান্ত দিবাশেষে রক্ত সন্ধ্যার মতো লোহিত, সন্ধ্যাতে শিবাধ্বনির মতো পিঙ্গল।

সন্ধ্যার দিকে সান্তারামের সেই খৃষ্টান বউ-ই প্রথম কথাটা তুললো। তারপর কথাটা জোর পেল আরও তিনজন তরুণীর গলাতে এবং অতঃপর একটা শ্লোগানের মতো মুখে মুখে ফিরতে লাগলো প্রস্তাবটা। আদিবাসীদের জীবনে খৃষ্টান হওয়া তাদের জীবনের মূল্যবোধের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনে না। ফলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও কুলাচার, লোকাচার, ব্রত, পূজা, পার্বণ মানতে কোন বাধা নেই। সুতরাং সান্তারামের লালটুকটুকে, নাকখ্যাঁদা, লম্বা বউটা যখন রুনতুক-বাশেকের সাবজনীন পূজোর প্রস্তাব দিল তখন সবাই স্বাভাবিক ভাবেই তা গ্রহণ করলো। রাভারা যেন একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেলো।

পরদিন সারাদিন সেই ঐতিহাসিক মাঠে হাতীটাকে ডানহাতে রায়ডাকের ওপারে রেখে চললো পূজার আয়োজন। সেই আয়োজন, চলাফেরা, আন্দোলনের মধ্যে রাভারা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে লাগলো।

সন্ধ্যাবেলাতে লকলকে আগুন জ্বললো। অনেকগুলো দীর্ঘস্থায়ী মশাল জ্বালানো হলো। ফলে মাঠটা আলোকিত কিন্তু তবু পবিত্র। এই আগুন রায়ডাকের থমথমে বিজনতা রক্ষা করে, অন্ধকারের মৃদঙ্গ থেকে উত্থিত নদীর কলতানকে বাঁচিয়ে রাখে, মশালের আলোতেও শিশিরসিক্ত অন্ধকার মন্দিরের গর্ভমুখের মতো শুচিস্নিগ্ধ।

পাণ্ডা নিজেই পূজো করলো। অনেকগুলো শূয়োর বলি দেওয়া হলো। মুরগীদের গলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো রুনতুক-বাশেকের বেদীর সামনে। মুণ্ডহীন মুরগীদের দেহগুলি ঝটপট করতে লাগলো, রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল মশালের আলো। রাত বাড়ছে, তারারা দিক পরিবর্তন শুরু করেছে, বনভূমির কীটপতঙ্গের ডাক দীর্ঘবিলম্বিত, দূরে কোথাও সেই নবাগত চিতাটা ডাকছে। সান্তারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে, মুঠোহাত আকাশে তুলে, বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। পাণ্ডাও এই সময়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সান্তারামের কোমর ডানহাতে জড়িয়ে নাচ শুরু করলো। হঠাৎ সমবেত রাভা পুরুষ রমণীরা আবিষ্কার করলো যে, 'হায়! হায়! আমরা আমাদের শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার, সমস্ত হতাশাকে জয় করবার একমাত্র সঞ্জীবনী আমাদের রাভা নাচকে ভুলে ছিলাম,—নাচো, নাচো, নাচো, সবাই নাচো নাচো।'

মাঠ জুড়ে সেই লকলকে আগুনের আলোতে, চতুর্দিকে মশাল পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্যরত নারীপুরুষদের ছায়াগুলো চঞ্চল এবং তৎপর হলো, অরণ্যের জমাট প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে মাদলের বোল রায়ডাকের জল সাঁতরে একরাশ কাঁচের চুড়ির মতো জয়ন্তিয়া পাড়াতে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হলো।

এবার শেষ রাতের তারারা বুঝি প্রথম হলো, কারণ মশালগুলো নিভে গেছে এবং

সেই পূত অগ্নিশিখাও নিভু নিভু, তবু এই মাঠ মেটে-মেটে আলোতে একটু বা সলক। সমবেত নাচের শেষে বিবাহানুগ বা বিবাহাতিগ অবিমিশ্র যৌনাচার ছাড়া রাভারা বাঁচতে পারবে না, তাই নিভু নিভু আগুন এবং প্রখর তারকামণ্ডলীর জ্যোতিতে আলোকিত মাঠের চারপাশে পুরুষ এবং নারীরা নির্বাচারে সুরতক্রিয়াতে লিপ্ত হলো। লুপ্ত হলো রক্ত-সম্পর্কের নিষেধ, স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা, বয়স এবং সম্পর্কের বাধা।

একটা অন্ধকার কোনাতে মাটিতে পোঁতা বাঁশ ধরে পাণ্ডা একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সান্তারামের বউ খুঁজতে খুঁজতে তার সামনে দাঁড়ালো। পাণ্ডা চেয়ে দেখলো মেয়েটি আলুলায়িতকুন্তলা, এই প্রচণ্ড শীতেও ঘর্মাক্ত, তার শরীর থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসছে। মেয়েটি পাণ্ডাকে জড়িয়ে ধরলো। বলশালিনী চিতাবাঘের মত মেয়েটি পাণ্ডাকে হিঁচড়ে নিয়ে চললো আরও অন্ধকারের দিকে। পাণ্ডা এতো নেশাতেও ঠিক বুঝতে পারলো যে শেষ বারের মতো সান্তারামের বউ-এর কাছে হেরে যাবে। কারণ পাণ্ডা একটা নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। পাণ্ডা প্রচণ্ড ঝটকাতে সান্তারামের বউকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর—বিশ্বচরাচরকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলো। প্রথমে সেই চিৎকার একটা নিঃসঙ্গ বার্কিং ডিয়ারের ডাক হলো এবং জ্যামুক্ত তীরের মতো অরণ্যে প্রবেশ করেই ফিরে এলো হস্তিযূথের বৃংহতি হয়ে, অবশেষে জয়ন্তিয়াপর্বতের পাদদেশে শার্দুলগর্জন হয়ে অশ্রুত।

পরের দিন। সন্ধ্যা। মাঠে আগুন। পান ভোজন। বিস্তৃতে প্রত্যাবর্তন। নিদ্রা। শুধু-মাত্র পাণ্ডা কাঁধে বন্দুক এবং কোমরে গুলির কোমরবন্ধ জড়িয়ে মাঠের প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, ফণিমনসার মতো।

পাণ্ডা ছোটবেলাতে শোনা একটা রাভা উপকথা ভাবছিল। জয়ন্তিয়া পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে আর ভুটান রাজ্য শুরু হয়েছে, সেইখানে একটা উতরাই নেবে গেছে গভীর অন্ধকার খাদের মধ্যে। রাভারা মরে গেলে সেই খাদে চলে যায় এবং সেখান থেকেই এই মহাকালগুড়ির রাভা গ্রামে সূক্ষ্মদেহে যাতায়াত করে। সেই মিলনক্ষেত্রে, অর্থাৎ জয়ন্তিয়ার শেষে আর ভুটানের শুরুর বিন্দুতে, এক যবনীর পানশালা আছে, উপকথাতে উল্লেখ আছে যে রুনতুক্ বাশেকই যবনীর রূপ ধরে ঐ ভাঁটিখানা চালায়। রাভাদের আত্মারা চিরকালের মতো খাদের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগে এখানে শেষবারের মতো পানভোজন করে। এই শীতল মাঝরাতে পাণ্ডা শুধু ভাবছিলো সেই যবনীর দোকানে শেষপাত্র পান করে গভীর খাদে মিলিয়ে যেতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

কিন্তু পাণ্ডার চিন্তাতে বাধা পড়লো একটা গাড়ির আওয়াজে। একটা জীপগাড়ির হেডলাইটে অন্ধকার সোজাসুজি দুখণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। পাণ্ডা প্রথমে ভাবলো ফরেস্টের সাহেবরা, কিন্তু যখন লক্ষ্য করলো জীপটা এসে বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে লাইট নিভিয়ে, স্টার্ট বন্ধ করে চুপচাপ, তখন বুঝলো এ অন্যকিছু। অনেকক্ষণ পর জীপ গাড়ি থেকে ছয়টি ছায়ামূর্তি নামলো। আপাদমস্তক একটা করে লম্বা কালো জোব্বাতে ঢাকা, মাথায় বাঁদর টুপি, হাতে প্রত্যেকের বন্দুক, শুধু একটা লোকের হাতে একটা অদ্ভুত বাঁকানো যন্ত্র। জীপগাড়ি থেকে নেমে সেই ছায়ামূর্তিগুলি একবারে চুপচাপ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর দলের সবচেয়ে লম্বা ছায়ামূর্তি ডান হাত আকাশে তুলে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলো। জোছনা খুব পাতলা, কিন্তু চারপাশে সব কিছু দৃশ্যমান, থোকা থোকা জোনাকীগুলো সেই সব কালো ছায়ামূর্তিগুলো ঘিরে ধরেছে। ওরা একবারও টর্চ জ্বালায় নি। ক্রমে ক্রমে দুটো মূর্তি সেই উঁচু জায়গাতে দাঁড়ালো, অনাচারটি ব্যূহ

রচনা করলো। এইভাবে ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর যে লোকটার হাতে সেই অদ্ভুত বাঁকানো যন্ত্র আছে সেই টর্চ জ্বাললো। টর্চের আলোটা একটা হিংস্র সাপোরা মতো কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে মাঠের মধ্যে বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াল। যে গাছের কাণ্ডের আড়ালে পাণ্ডা লুকিয়ে ছিল সেইখানে সেই সাপটা অন্তত দুবার এলো এবং ফিরে গেল। তারপর সেই ভয়ংকর সাপটা হিলহিলিয়ে হাতিটার সামনের ডান পা বেয়ে উঠতে লাগলো, জড়িয়ে জড়িয়ে দুটো গজদন্তকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করলো এবং অবশেষে ওর ডান কানের নিচে এসে স্থির হলো।

পাণ্ডা সজাগ হলো। কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে টোটা ভরল অন্ধকারেই, ক্যাচ করে শব্দ হলো, সেই সাপটাকে ওরা আবার ছেড়ে দিল, সাপটা বুকে হেঁটে সারাটা অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। রাতটা মেটে জোছনায় ফিরে এলো। টিবির ওপরে সেই ছায়ামূর্তিগুলো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সব চুপচাপ। আসলে ছায়ামূর্তিগুলোর কোন তাড়াহুড়ো নেই। ওরা খুব আস্তে ধীরে অসীম ধৈর্য নিয়ে এগুতে চায়। কিন্তু পাণ্ডার ধৈর্য শেষ সীমাতে পৌঁছেছে, ঐ মহাবৃদ্ধ গজ আর হয়তো এক সপ্তাহ পরেই মারা যাবে, কিন্তু আজ রাতে এই মুহূর্তে পাণ্ডা ঐ হাতীটার একসপ্তাহের পরমায়ু রক্ষা করার জন্য ছটফট করতে লাগলো। পাণ্ডার অস্থিরতা যতোই বাড়তে থাকে ততই সে তার কৌশল, পরিকল্পনা, চাতুর্য হারাতে থাকে। আর ছায়ামূর্তিদের অনড় অচল ধৈর্য ওকে আরও পাগল ক'রে তুললো। পাণ্ডা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের গণ্ডদেশ কাঁধের সঙ্গে ঘসলো, তারপর বাঁ কাঁধে বন্দুকের কুঁদো লাগিয়ে, ঘোড়াতে হাত দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো।

মোষের পিঠে চেপে পাণ্ডা বাঁশী বাজাতো। এই মাঠে ধবধবে সাদা বকের দল সেই কত ভোরে ভিড় করতো। বাঁশি বাজিয়ে ওদের পাশ দিয়ে গেলে ওরা একটুও সরতো না। ভয় পেতো না। পাণ্ডার চোখের সামনে অকস্মাৎ হাজার হাজার বক উড়তে লাগল। পাণ্ডা মাথা ঝাঁকালো। বন্দুকের সেফটি ক্লাচ আটকে বন্দুক পিঠে ঝোলাল। আবার গাছের আড়ালে চলে এলো। পাণ্ডা ক্রমশ ধীরে ধীরে বিচারক্ষমতা ফিরে পেল। বিচারক্ষমতা ফিরে পেয়েই বুঝতে পারলো সে ভয় পেয়েছে। তাছাড়া তার ব্যক্তিগত ভয় পাওয়া বা না পাওয়া ছাড়াও এটা পরিষ্কার যে এই ছায়ামূর্তিগুলো একটি সংগঠিত পোচারের দল, দ্বিতীয়তঃ এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, তৃতীয়তঃ এই দলটি এগিয়ে এলেও এদের সাহায্যের জন্য আরও লোক এবং অস্ত্র পেছনে রয়েছে। ঘটনাটা এখনি রেঞ্জারবাবুকে জানানো প্রয়োজন। বুনো বেড়ালের মতো একটুও শব্দ না করে পাণ্ডা হাতীঘাসের বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরপর দুটো শক্তিশালী রাইফেলের গুলির আওয়াজ এবং তারপরই সেই বৃদ্ধ হাতীর ফাটা শাঁখের আওয়াজের মতো করুণ আর্তনাদ আকাশ পাতাল অরণ্য পর্বত নদী কাঁপিয়ে তুললো। সেই বৃংহিত এতো তীব্র এবং করুণ যে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না, এবং সেই বৃংহিতের নিনাদে রাভা পুরুষরা বেরিয়ে এলো। রাভা জনতা এবং মশাল দেখেই সেই ছায়ামূর্তিগুলো একসঙ্গে ছয়টি রাইফেলে ফাঁকা আওয়াজ করলো, ফলে রাভারা মশাল নিভিয়ে বস্তিতে ফিরে গেলো।

ইতিমধ্যে বৃংহিত থেমে গেছে, সেই অদ্ভুত বাঁকা যন্ত্রের করাতটা নিয়ে দুটো পাঁচ ব্যাটারীর টর্চের আলোতে গজদাঁত কাটার কাজ চললো। ঘণ্টাখানেক পরে জীপটার পেছনের লাল আলোটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রাভারা আবার মশাল জ্বাললো। তারা বুঝতে পারছে না কি করবে। পাণ্ডাকেও তারা খুঁজে পাচ্ছে না। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং অবশেষে তাঁর ধনুক, ভাল্লা, মশাল নিয়ে একটি দল রেঞ্জ অফিসের দিকে রওনা হলো। প্রায় আধঘণ্টা নিঃশব্দে হাঁটার পর সেই দলের আগে আগে যে মশালধারী যাচ্ছিল সে থমকে দাঁড়ালো, তারপর নিচে নামিয়ে নিচু হয়ে কি যেন দেখতে লাগলো, অতঃপর হাঁটুগেড়ে বসে মশাল সমেত ডান হাত এবং খালি বাঁ হাত আকাশের দিকে তুললো। তৎক্ষণে দলের সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে গোল হয়ে বসে পড়ে দুহাত আকাশের দিকে তুললো। মশালটা মাটিতে পুঁতে দিল।

পাণ্ডা সর্দার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তাকে প্রায় চেনা যায় না। বিজন বনের পথ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বন্দুকটা অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে একেবারে নিশ্চিত হবার জন্য পাণ্ডা মুখের মধ্যে ব্যারেল ঢুকিয়ে তবে ঘোড়া টিপেছিল।

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রনে দেকার্ত

এই প্রাথমিক সত্যগুলি[১] হতে অন্যান্য যে-সব সত্য আমি টেনে বার করেছি, এবার আরেকটু এগিয়ে সেই সত্যগুলির আগাগোড়া সারিটিকে দেখানো আমার পক্ষে সহজ হবে[২]। কিন্তু সেটা করতে গেলে যেহেতু এমন কিছু প্রসঙ্গের[৩] আলোচনার প্রয়োজন এখন পড়বে যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং যেহেতু সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে কলহে মাতারও কোনো ইচ্ছা আমার নেই, তাই মনে হয় সে-সব বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করাই আমার পক্ষে ভালো হবে —শুধু যা করতে পারি, তা সে-প্রসঙ্গগুলি ঠিক কী-কী, সেটা অতি সাধারণভাবে বলা, যাতে আরো জ্ঞানী[৪] যাঁরা আছেন, তাঁরাই বিচার করতে পারেন এ-সব ব্যাপারে জনসাধারণকে আরো বেশি করে কিছু জানানো উচিত হবে কিনা। এখন্নি যে-তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলাম ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য, সেটি ভিন্ন অন্য কোনো তত্ত্বে আস্থা রাখতে যাব না এবং একমাত্র যে-জিনিসটি আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে এত বেশি পরিষ্কার ও নিশ্চিত-ভাবে যা জ্যামিতিজ্ঞদের কোনো প্রমাণই হতে পারেনি আগে, সেই জিনিসটি ভিন্ন অন্য কিছুকে সত্য বলে মানব না, আমার এই সিদ্ধান্তে আমি চিরকাল অবিচল থেকেছি। এবং তা সত্ত্বেও এটুকু বলব, দর্শনের ক্ষেত্রে যতরকমের প্রধান জটিলতা নিয়ে আলোচনার প্রথা আছে, শুধু যে তার সবগুলিতে অল্প সময়ের বাবধানে নিজেকে তৃপ্ত করার উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছি ঈশ্বর কোনো বিশেষ নিয়মকে প্রকৃতিতে এইভাবে বলবৎ করেছেন এবং তাদের প্রত্যয়ের এমন একটি ছাপ রেখেছেন আমাদের আত্মার মধ্যে যে যখন সেগুলি নিয়ে ভালো করে ভাবতে একবার পেরেছি, তখন যা-কিছু রয়েছে বা ঘটছে এই পৃথিবীতে, তার সব কিছুতেই যে এই একই নিয়মগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে, এ-বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। অতঃপর, নিয়মগুলি ধরে এগোলে আর কী-কী হতে পারে যখন বিচার করতে বসলাম, তখন মনে হল অন্যান্য এমন অনেক সত্যও আমি যেন আবিষ্কার করছি যেগুলি যা-কিছু আমি এতদিন শিখেছি বা শেখার আশা রেখেছি, তার সব কিছু হতে আরো প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

কিন্তু যেহেতু আগেই এক নিবন্ধে এই নিয়মসমূহের প্রধানগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি—যদিও কিছু কারণ বিবেচনা করে সে-নিবন্ধটি এখনো প্রকাশ করতে পারিনি[৫] —আমি তাই সেখানে যা বলেছি, এখানে তার মাত্র সারাংশটির উল্লেখ সমীচীন হবে মনে করছি। জড় জগৎ সম্বন্ধে যা-কিছু জানি বলে ভেবেছিলাম, সেটাকে লিপিবদ্ধ করার আগে যাতে পুরোপুরি উপলব্ধি করি, এই উদ্দেশ্যই সেখানে আমার ছিল। কিন্তু ঠিক যেমন চিত্রকরদের পক্ষে সমতল এক চিত্রে কোনো ঘন বস্তুর সকল বিভিন্ন পার্শ্ব একই রকম ভালোভাবে বর্ণিত করা সম্ভব নয় এবং তাই তাঁরা কোনো একটি মুখ্য পার্শ্ব বেছে নিয়ে সেইটিকেই আলোর দিকে তুলে ধরেন ও অন্যান্য পার্শ্বগুলিকে ছায়ায় ঢাকেন এমনভাবে যাতে আলোকিত পার্শ্বটির দিকে তাকিয়ে থাকলে তাদের যতটুকু দেখা যায় ঠিক ততটুকুই যেন এখানেও দেখতে পারা চলে, তেমনই, যা-কিছু আমার চিন্তায় ছিল, তার সবটাই আমার আলোচনায় ঢোকাতে পারব না জেনে শুধু আলো বলতে যা আমি বুঝেছিলাম, সেটারই

যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হলাম। পরে, এই অবসরে, সূর্য ও গতিহীন তারকা-রাজি সম্বন্ধেও কিছু যোগ করলাম আলোচনায়, কারণ আলোর প্রায় সমস্তটাই আসে এদের কাছ থেকে। যোগ করলাম আকাশের কিছু কথাও, কারণ তার মাধ্যমে আলো এক জায়গা হতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। কিছু কথা গ্রহাবলী, ধূমকেতু ও পৃথিবী সম্বন্ধেও, কারণ আলো প্রতিভাত হয় তাদের মাধ্যমে। এবং বিশেষ করে কিছু কথা যোগ করলাম পৃথিবীর উপরে অবস্থিত যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে, কারণ তারা হয় রঙিন, নয় স্বচ্ছ, নয়তো দীপ্যমান। এবং অবশেষে যোগ করলাম মানুষ সম্বন্ধেও কিছু কথা, কারণ সে-ই আলোর দর্শক। তবু এ-সমস্ত জিনিসকে একটু ছায়ায় যাতে ঢাকতে পারি এবং যাতে তাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত কোনো মতামত অনুসরণ অথবা খণ্ডন করতে বাধ্য না হয়ে নিজে যেটা ভাবি সেইটাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এই সব যাবতীয় লোকদের ছেড়ে দিতে এদেরই তর্কের মধ্যে এবং কথা বলতে মাত্র নিচের বিষয়টি নিয়েই : আজ যদি কোথাও কোনো কাল্পনিক স্থানে ঈশ্বর যথেষ্ট পরিমাণে জড় একত্রিত করে এক নতুন পৃথিবী রচনায় হাত দেন, সেই জড়ের বিভিন্ন অংশকে নানা রকমে ও কোনো শৃঙ্খলা না মেনে নড়াতে-চড়াতে থাকেন যতক্ষণ-না তা পরিণত হয় এমন এক অবাবস্থিত বস্তুপিণ্ডে যা তার বিশৃঙ্খলতায় কবিদের যে-কোনো কল্পনার সামিল হতে পারে, এবং পরে যদি তিনি আর কিছু না করে শুধু তাঁর সাধারণ সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দেন প্রকৃতির দিকে এবং প্রকৃতিকে ছেড়ে দেন তাঁরই প্রবর্তিত নিয়মকানুন অনুযায়ী নড়তে-চড়তে, তাহলে কী ঘটতে পারে সেই নতুন পৃথিবীতে[৬]। এইভাবে, সর্বপ্রথমে, এই জড়টির বর্ণনা আমি দিলাম এবং তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম এমনভাবে যাতে এক ঐ ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আগে যা বলা হয়েছে তা ব্যতীত পৃথিবীতে এমন আর কিছু না থাকে যা আমার কাছে ঠেকতে পারে এর চেয়ে আরো বেশি পরিষ্কার বা আরো বোধগম্য। কারণ ইচ্ছা করেই আমি ধরে নিলাম যে এই জড়ের মধ্যে এমন কোনো আকার বা গুণ নেই যা নিয়ে আমাদের দার্শনিকরা তর্কে মাততে পারেন, বা তার মধ্যে সাধারণভাবেও এমন কোনো জিনিস নেই যার সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের আত্মায় অতি স্বাভাবিকভাবে প্রতিপন্ন নয় ও তাই তাকে অস্বীকার করার ভান করা চলে। এছাড়া আমি দেখালাম প্রকৃতির নিয়মগুলি কী, এবং আমার যুক্তিকে একমাত্র ঈশ্বরের অন্তহীন সম্পূর্ণতা ভিন্ন অন্য কোনো তত্ত্বের উপর খাড়া না করে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম সেই সমস্ত নিয়মগুলি যাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ কারুর থাকতে পারে—শেষে দেখাতে সচেষ্ট হলাম, সেই নিয়মগুলি এমন যে ঈশ্বর যদি আরো বহু পৃথিবীর সৃষ্টি করতেন, তাহলেও তাদের প্রত্যেকটিতে ঐ একই নিয়মগুলি প্রতিপালিত না হয়ে যেত না। এর পরে আমি দেখালাম কী করে ঐ নিয়মগুলির অনুবর্তী হয়ে সেই বিশৃঙ্খল বস্তুপিণ্ডের জড়ের সব থেকে বড় অংশটি এক বিশেষ উপায়ে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে নিজেকে এমন গুছিয়ে নেবে যে তা হয়ে উঠবে আমাদের আকাশের অনুরূপ, দেখালাম কেমন করে সেই জড়ের কোনো-কোনো অংশে রচিত হতে পারবে এক পৃথিবী, কোনো-কোনোটিতে গ্রহসমূহ ও ধূমকেতু, আবার অন্য কোনো-কোনোটিতে বা সূর্য ও গতিহীন তারকারাজি। এবং এখানে, আলোর বিষয়ে আমার বক্তব্যটিকে আরো ব্যাপ্ত করে বেশ দীর্ঘভাবে ব্যাখ্যা করলাম কোন্ আলো খুঁজে পাওয়া যায় সূর্যে ও তারকায়, এবং কী করে সেখান হতে সেই আলো এক মুহূর্তে[৮] আকাশের বিরাট-বিরাট স্থান অতি-ক্রম করে, এবং কী করেই বা গ্রহসমূহ ও ধূমকেতু হতে প্রতিভাত হয়ে তা পৃথিবীর দিকে

আসে। এইসব আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রের উপাদান, অবস্থান, গতি ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাগুণ সম্বন্ধেও অনেক কথা এই সঙ্গে যোগ করলাম যাতে এটা যথেষ্টভাবে জানাতে পারছি বলে মনে করতে পারি যে আমি যে-পৃথিবীর বর্ণনা দিলাম, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে না বা অন্তত মিলে যাচ্ছে বলে ঠেকবে না। এর পর চলে এলাম বিশেষত পৃথিবীর কথায় : যদিও স্পষ্ট করে ধরে নিয়েছি যে পৃথিবী যে-জড় দ্বারা গঠিত, তার ভিতরে ঈশ্বর কোনো অভিকর্ষ ঢোকাননি, তবু, কী করে, সেই জড়ের সকল বিভিন্ন অংশের প্রত্যেকটি একেবারে ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখী না হয়ে পারে না; ভূ-পৃষ্ঠে জল ও বায়ু থাকার ফলে কী করে আকাশ ও নক্ষত্ররাজির বিন্যাস-পদ্ধতি, বিশেষত চাঁদের অবস্থান, সেখানে এমন এক জোয়ার-ভাটা তুলতে বাধ্য যা সম-পরিস্থিতিতে লক্ষিত আমাদের সমুদ্রগুলির জলস্ফীতি ও জলহ্রাসের অনুরূপ, এবং এ ছাড়াও যেমন জলের তেমনি বায়ুর যে-একটি গতি থাকে, পূর্ব হতে পশ্চিমে, যেমনটি গ্রীষ্মমণ্ডলেও দেখা যায়; কী করে সেই পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে আকার নেয় পর্বতমালা, সিন্ধুরাশি, উৎস-শ্রেণী ও নদীকুল, কী করে সেখানে খনিতে আসে ধাতু, প্রান্তরে গজায় উদ্ভিদ, এবং সাধারণভাবে মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ বলতে যা-কিছু বোঝায়, তারাই বা কী করে সেখানে জন্ম নেয়। এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যেহেতু নক্ষত্ররাজি ব্যতীত এক অগ্নিরই কথা জানি যা নাকি আলোক উৎপাদন করতে পারে পৃথিবীতে, তাই যা-কিছু আছে অগ্নির প্রকৃতিতে, সেটা অতি পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য আমি মনোনিবেশ করলাম : আগুন কী করে উৎপন্ন হয়, কী করে তা বৃদ্ধি পায়, কী করে তাতে কখনো শুধু আলোকহীন উত্তাপ এবং কখনো-বা শুধু উত্তাপহীন আলোই থাকে; কী করে সেই আগুন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন রঙ ও গুণাগুণের প্রবর্তন করতে পারে; কী করে তা কোনো-কোনো বস্তুকে দ্রবীভূত এবং অন্য কোনো-কোনো বস্তুকে আরো কঠিন করে; কী করে তা সেই সব বস্তুর প্রায় সমস্তটাকেই আত্মসাৎ করে অথবা তাদের পরিণত করে ভস্মে কিংবা ধোঁয়ায়; এবং অবশেষে কী করে সেই ভস্ম হতে, শুধু তার ক্রিয়ার প্রবলতার মাধ্যমে, সে রূপ দেয় কাঁচকে। ভস্মের এই কাঁচে রূপান্তরের মতো আশ্চর্য ঘটনা প্রকৃতির অন্য কোনো বস্তুতে ঘটতে দেখিনি বলেই এটির বর্ণনায় সবিশেষ আনন্দ পেলাম।

তবু এই সব থেকে এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছোতে চাইনি যে আমি যেভাবে বলছি, এ-পৃথিবী ঠিক সেইভাবেই তৈরী হয়েছে—কারণ আরো অনেক বেশি সম্ভব যা, তা হল একেবারে গোড়া হতেই ঈশ্বর এটিকে রূপায়িত করেছিলেন যেমনটি এটি হওয়া উচিত তেমনটি করে[৯]। কিন্তু এটা নিশ্চিত, এবং এ-মতটির প্রচলনও আছে ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে, যে এখন তিনি পৃথিবীকে সংরক্ষণ করে রয়েছেন যে-ক্রিয়ার মাধ্যমে, সেই একই ক্রিয়ার দ্বারা তাকে তিনি সৃষ্টিও করেন। তাই এমনও যদি মনে করা যায় যে গোড়ায় বিশৃঙ্খল বস্তুপিণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর অন্য আকার তিনি দেননি—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধরে নিতে হবে যে সেটি করার পর প্রকৃতির নিয়মগুলি প্রবর্তন করেন, পরে প্রকৃতির দিকে তাঁর সহ-যোগিতার হাতটি বাড়ান যাতে সে তার প্রথামতো কার্যক্ষম হতে পারে—তাহলেও সৃষ্টির অলৌকিকতার প্রতি অবিচার না করে[১০] এটা মেনে নেওয়া চলে যে একমাত্র এই একই উপায়ে পুরোপুরি জড় বস্তু বলতে যা-কিছু বুঝি, তার সবই কালে-কালে সেই আকারই নিতে পারবে যে-আকারে আজ আমরা তাদের দেখছি। এবং তাদের প্রকৃতিটাকেও জানা তখন আরো অনেক সহজ হবে যখন প্রথম থেকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হয়ে বরং এইভাবে ধীরে

ধীরে তারা জন্মেছে বলে আমরা বিচার করতে পারব।

প্রাণহীন বস্তু ও উদ্ভিদ হতে আমি চলে এলাম প্রাণীদের, বিশেষত মানুষের বর্ণনায়। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয়ে আগের অনুযায়ী একই প্রকারে আলোচনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আমার ছিল না—অর্থাৎ যে-প্রকারে এতক্ষণ ফলকে প্রমাণ করি হেতুর দ্বারা, এবং দেখাই কোন্ উপাদানে ও কী উপায়ে সেই ফলকে উৎপন্ন করতে প্রকৃতি বাধ্য—আমি তাই এই অনুমান করেই সন্তুষ্ট থাকলাম যে প্রথম যখন ঈশ্বর মানুষের শরীর গঠন করেন, সেটা তিনি করেন হুবহু আমাদের শরীরের অনুরূপ করেই, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আকারের ক্ষেত্রে তেমনি শরীরের বিবিধ যন্ত্রের অন্তর্গঠনেও। এবং এ-শরীর গঠন করলেন সেই একই জড়ের দ্বারা যার বর্ণনা আগে দিয়েছি। তাতে গোড়ায় ঢোকালেন না কোনো যুক্তিক্ষম আত্মা অথবা এমন অন্য কিছুও যা উদ্ভিদোপম বৃদ্ধিশীল বা সুবেদী কোনো আত্মার[১১] কাজ করতে পারে। শুধু সেই মানুষের হৃদয়ে তিনি উস্কিয়ে রাখলেন ঐরকম একটি আলোকহীন আগুন যারও কথা আগে ব্যাখ্যা করেছি, এবং যার স্বভাবের একমাত্র যে-উপমা মনে আসছে তা হল শুকনো হওয়ার আগে খড়কে এক জায়গায় বন্ধ করে রাখলে যে-আগুন তাকে গরম করে তোলে, অথবা থেঁতলানো আঙুরের উপর রেখে গাঁজানোর সময় নতুন মদকে যে-আগুন উত্তপ্ত করে ফোটায়, এও যেন ঠিক সেই আগুনের মতো। কারণ এর ফলে সেই শরীরের মধ্যে যে-যে ক্রিয়াকলাপ জাগতে পারে, তা বিচার করতে গিয়ে দেখলাম যে তার প্রত্যেকটির পক্ষে হুবহু সেইভাবেই চালু থাকা সম্ভব আমাদের এই শরীরেও, তা তার সম্বন্ধে সজ্ঞানে আমরা ভাবি বা না-ই ভাবি—ফলে দাঁড়াচ্ছে যা, তা আমাদের আত্মা, অর্থাৎ শরীর থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক সেই বস্তুটি যার বিষয়ে কিছু আগে বলা হয়েছে যে তার একমাত্র প্রকৃতিই হল চিন্তা করার সামর্থ্য, সেই আত্মা বস্তুটির এ-ক্ষেত্রে কোনো অবদান যদি নাও থাকে, তবু শরীরমাত্রেরই ক্রিয়াকলাপ সর্বত্র সমানভাবে চলতে থাকবে। এবং এই কারণেই বলা সম্ভব যে যুক্তিশক্তিহীন জন্তুরাও আমাদের সদৃশ—অর্থাৎ সেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন একটিকেও আমি খুঁজে পেলাম না যা কোনো প্রকারে চিন্তার উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে যাকে বলা চলে শুধু আমাদের বা মানুষ নামক প্রাণীর জন্যই নির্দিষ্ট[১২]। উল্টে চিন্তার উপর নির্ভরশীল যে-ক্রিয়াকলাপগুলি, তাদের প্রত্যেকটিকেই আমি মানুষের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি বেশ পরে, যখন এটা অনুমান করে নিয়েছি যে ঈশ্বর যুক্তিক্ষম এক আত্মার সৃষ্টি করেন ও পরে সেটিকে আমার বর্ণিত উপায়ে শরীরের সঙ্গে যুক্ত করেন।

কিন্তু বিষয়টিকে ঠিক কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পর্যালোচনা করছিলাম, সেটা দেখানোর জন্য হৃৎপিণ্ড ও ধমনীদের গতিবিধি নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপিত করতে চাই। এবং যেহেতু হৃৎপিণ্ড ও ধমনীদের এই গতিবিধি সকল প্রাণীর মধ্যে সর্ব-প্রথমে ও সবচেয়ে বেশি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাই এর সম্পর্কে যা বলা চলে, তার দ্বারা শরীরের অন্যান্য যাবতীয় গতিবিধি ব্যাপারে কী ভাবা যায় বা না যায় সেটা লোকে সহজেই বিচার করতে পারবে। এবং, যা ব্যাখ্যা করছি, তা বুঝতে যাতে কারুর কোনো কষ্ট না হয়, আমি তাই এখানে শারীরস্থান সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান যাদের নেই, তাদের বলব যে আমার লেখা পড়ার আগে তারা যেন একটু কষ্ট করে ফুসফুসসমন্বিত কোনো বৃহৎ জন্তু বা প্রাণী পেলে তার হৃৎপিণ্ডটাকে নিজেদের সামনে কেটে দুখানা করে। কারণ সে-হৃৎপিণ্ড মোটামুটি একেবারে মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের অনুরূপ, এবং সেটা কাটলেই তার

যে-দুটি প্রকোষ্ঠ বা অন্তঃস্থ ফাঁপা-মতন বস্তু আছে, তা তাদের নজরে পড়বে। প্রথমে দেখা যাক তার ডানদিকের প্রকোষ্ঠটি যাতে এসে মিলছে বেশ প্রশস্ত দুটি নল। সেই নল দুটির একটি হল গিয়ে মহাশিরা, যা রক্তের মুখ্য আধার এবং যা গাছের গুঁড়ির মতো, শরীরের অন্যান্য সমস্ত শিরা-উপশিরা তারই শাখা-প্রশাখা মাত্র; দ্বিতীয় হল ধামনিক শিরা, যার এমন নামকরণটি খুব উপযুক্ত হয়নি, কারণ আসলে এটি হল গিয়ে ধমনী যার উৎপত্তি হৃৎপিণ্ডে এবং যা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নানান শাখা-প্রশাখায় ফুসফুসগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এবারে দেখা যাক তার বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটি যাতেও একই ভাবে এসে মিলছে আগের মতনই বা তার চেয়ে আরো বেশি প্রশস্ত অন্য দুটি নল। এই নল দুটির একটি হল গিয়ে শিরাশ্রিত ধমনী, যে-নামকরণটিও খুব উপযুক্ত হয়নি, কারণ এটি শিরা ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এবং শিরাটি আসছে ফুসফুস দুটি হতে, যেখানে তা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং সেই শাখা-প্রশাখাগুলিও আবার ওতপ্রোতভাবে সংজড়িত একদিকে যেমন ধামনিক শিরাটির শাখাগুলির সঙ্গে, অন্য দিকে তেমনি শ্বাসনালীর যে-পথটি রয়েছে, তারও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে—এই শেষোক্ত পথটি ধরেই শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু ঢোকে; দ্বিতীয় নলটি হল মহাধমনী, যা হৃৎপিণ্ড হতে বেরিয়ে শরীরের সর্বত্র তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। যাদের এইসব দেখানো হচ্ছে, চাই সময়ে তাদের সামনে তুলে ধরা হোক সেই এগারোটি ঝিল্লীও, যা এগারোটি ছোট-ছোট দরজার মতো সেই ফাঁপা প্রকোষ্ঠ দুটির ভিতরের চারটি ছিদ্রের মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। এই এগারোটি ঝিল্লীর তিনটি রয়েছে মহাশিরার প্রবেশ-পথে—তাদের অবস্থানটি এমন যাতে যে-রক্ত তারা বহন করছে, হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের ফাঁপা প্রকোষ্ঠটিতে সে-রক্তের গড়িয়ে পড়াটা তারা কিছুতে ঠেকাতে পারছে না ঠিকই, তবু রক্তটা যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে না যায়, সে-ব্যবস্থাটি তারা নিচ্ছে। অন্য তিনটি ঝিল্লী রয়েছে ধামনিক শিরার প্রবেশ-পথে, এদের অবস্থানটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের—এমন, যাতে যে-রক্ত রয়েছে ঐ ফাঁপা জায়গাটিতে, তাকে ফুসফুস দুটির মধ্যে ঢুকতে তারা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে-রক্ত রয়েছে ফুসফুস দুটিতে, তাকে ফাঁপা জায়গাটিতে ফিরতে দিচ্ছে না। এই প্রকারে আরো দুটি ঝিল্লী রয়েছে শিরাশ্রিত ধমনীর প্রবেশ-পথে, তারা ফুসফুসের রক্তকে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের ফাঁপা স্থান অভিমুখে গড়িয়ে যেতে যদিও দিচ্ছে, সে-রক্তকে আগের জায়গায় ফিরতে দিচ্ছে না। এবং শেষ তিনটি ঝিল্লী রয়েছে মহা-ধমনীর প্রবেশ-পথে, তারা রক্তকে হৃৎপিণ্ড হতে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে, কিন্তু সেখানে ফিরে আসতে দিচ্ছে না। এবং ঝিল্লীগুলির সংখ্যা-বিভাগ এমন কেন, তার একটি ব্যতীত অন্য কারণ খোঁজার দরকার পড়ে না—আর সেই কারণটি হল এই যে জায়গাটা অমন বলেই শিরা-শ্রিত ধমনীর ছিদ্রটি যেহেতু ডিম্বাকার, সেটি দুটি ঝিল্লীতে বন্ধ হওয়া আপনা থেকেই সোজা, ঠিক যেমন অন্যান্য ধমনীর ছিদ্রগুলি গোলাকার, তাই তিনটি ঝিল্লীতে তারা আরো সহজে বন্ধ হতে পারে। যারা দেখছে এইসব, চাই এটাও তারা বিবেচনা করুক যে গঠনের দিক থেকে শিরাশ্রিত ধমনী ও মহাশিরা হতে মহাধমনী ও ধামনিক শিরা আরো অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ়, এবং প্রথম দুটি হৃৎপিণ্ডে ঢোকার আগে ঢওড়া হয়ে ওঠে ও সেখানটায় দুটি ছোট গোঁজিয়ার মতো জিনিস সৃষ্টি করে, যে-জিনিস দুটি পরিচিত হৃৎপিণ্ডের দুই কান বা অলিন্দ রূপে এবং যে-মাংসে গঠিত তারা, সেটা হৃৎপিণ্ডের মাংসের অনুরূপ। দেখা দরকার এটাও যে শরীরের অন্য কোনো জায়গা হতে হৃৎপিণ্ডে সবসময়ই বেশি উত্তাপ থাকে, এবং সেই উত্তাপের ফল এমন যে যখনই কয়েক বিন্দু রক্ত ঐ ফাঁপা জায়গা দুটিতে

প্রবেশ করে, সে-রক্ত অচিরে স্ফীত হয়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে—যেমন সাধারণত করে থাকে যে-কোনো তরল পদার্থই যখন তাকে বিন্দু-বিন্দু করে ফেলা যায় বেশ তপ্ত কোনো নলের মধ্যে।

এর পরে তাই হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য আমার অন্য কিছু যোগ করার দরকার নেই; শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে যখন ঐ ফাঁপা জায়গাগুলি রক্তে ভরা থাকে না, তখন স্বভাবতই রক্ত প্রবাহিত হয় মহাশিরা হতে ডান দিকের প্রকোষ্ঠটিতে ও শিরাশ্রিত ধমনী হতে বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটিতে—বিশেষত যখন এই নল দুটি সর্বদাই রক্তে পরিপূর্ণ থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দিকে মুখ-করা তাদের ছিদ্রগুলি তাই আর বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু যে-মুহূর্তে দুই বিন্দু রক্ত ঢুকেছে, একটি বিন্দু করে ফাঁপা জায়গা দুটির প্রতিটিতে—এবং বিন্দু দুটিও বেশ বড় আকারের না হয়ে যায় না, যেহেতু যে-ছিদ্রগুলি দিয়ে তারা ঢুকছে সেগুলি যেমন বেশ মোটা-মোটা, যে-নলগুলি দিয়ে তারা আসছে সেগুলিও রক্তে খুবই ভরতি—সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দু দুটি সেখানে যে-উত্তাপ পায় তার ফলে বিরলীকৃত হয়ে পড়ে ও ছড়িয়ে যায়। এই উপায়ে রক্ত-বিন্দু দুটি সারা হৃৎপিণ্ডটাকে স্ফীত করে তুলে যে-পাঁচটি ছোট-ছোট দরজা রয়েছে নল দুটির প্রবেশপথে—অর্থাৎ সেই নল দুটি যা দিয়ে তারা নিজেরাই এসেছে—এবারে সেই দরজা পাঁচটিকে তারা ঠেলতে থাকে ও বন্ধ করে দেয়। এটা তারা করে, যাতে বেশি রক্ত হৃৎপিণ্ডে নেমে না আসতে পারে। এবং ক্রমশই বিরলীকৃত হতে-হতে তারা একই সঙ্গে ঠেলতে থাকে ও অবশেষে খুলে ফেলে অন্য ছয়টি ছোট দরজা, যেগুলি রয়েছে সেই দুটি নলের প্রবেশ-পথে যার মধ্য দিয়ে তারা বেরিয়ে যায় অচিরেই—এবার এইভাবে স্ফীত করে ধামনিক শিরা ও মহাধমনীর সকল শাখা-প্রশাখা-গুলিকে, বলতে গেলে হৃৎপিণ্ডকে স্ফীত করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য হৃৎপিণ্ড, এবং একই ভাবে ঐ ধমনীগুলিও, মুহূর্তের মধ্যে চুপসে যায়, কারণ যে-রক্ত সেখানে ঢুকেছিল, তা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবং ওদের ছয়টি ছোট দরজা বন্ধ হতেই মহাশিরা ও শিরাশ্রিত ধমনীর পাঁচটি ছোট-ছোট দরজা খুলে গিয়ে পথ করে দেয় আরো দুটি অন্য রক্ত-বিন্দুর, যারাও ঠিক আগের বিন্দু দুটির মতোই হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলিকে পুনরায় স্ফীত করে। যেহেতু যে-রক্ত এভাবে ঢুকছে হৃৎপিণ্ডে, তা হৃৎপিণ্ডের কান বলে পরিচিত দুটি গোঁজিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই গোঁজিয়া দুটির গতিবিধি হৃৎপিণ্ডের বিপরীত—যে-কারণে হৃৎপিণ্ড যখন ফুলে ওঠে, এরা তখন চুপসে যায়। শেষে, গাণিতিক প্রমাণের শক্তি যারা জানে না, এবং সত্য যুক্তিকে সম্ভাব্য থেকে পৃথক করে দেখতেও যারা অভ্যস্ত নয়, সে-ধরনের লোক যাতে পরীক্ষা না করেই এটাকে অস্বীকার করার ঝুঁকি না নেয়, আমি তাই তাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে যে-গতিবিধির কথা আমি এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করলাম, তা বাধ্যতামূলকভাবে নির্ভরশীল এমন সব যন্ত্রের নিছক অবস্থানের উপর যাকে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে থাকতে দেখা যায় নিজের চোখ দিয়ে, সেই গতিবিধি নির্ভরশীল এমন একটি উত্তাপের উপর যাকে অনুভব করা চলে সেখানে নিজেরই আঙুল ছুঁইয়ে—সেই গতিবিধি নির্ভরশীল রক্তের যে-বিশেষ প্রকৃতির উপর, তাকেও জানা চলে পরীক্ষার দ্বারা। এই নির্ভরশীলতা ঠিক সেইরকম, যে-একই বাধ্যতামূলকভাবে কোনো বড় ঘড়ির গতিবিধি নির্ভরশীল হয় তার সমভার এবং চাকাগুলির শক্তি, অবস্থান ও আকারের উপর।

কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, এভাবে হৃৎপিণ্ডে ক্রমাগতই গড়িয়ে পড়ে-পড়েও শিরার রক্ত কেন নিঃশেষিত হয় না, এবং হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে যত রক্ত যাচ্ছে তার সবই ধমনীতে

এসে হাজির হচ্ছে বলেই ধমনীগুলিই বা কী করে রক্তে অত্যধিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না, তাহলে উত্তরে আমার অন্য কিছু বলার দরকার নেই—শুধু ইংলন্ডের এক চিকিৎসক[১৩] এ-বিষয়ে যা ইতিমধ্যেই লিখে গেছেন, তার উল্লেখই যথেষ্ট হবে। ইংরেজটি তাঁর এই আবিষ্কারে সকলের প্রশংসার্হ হয়েছেন, কারণ তিনিই প্রথম জানালেন যে, ধমনীদের প্রান্ত-সীমায় এমন বহু ছোট-ছোট পথ আছে যার মধ্যে দিয়ে যে-রক্ত ধমনীরা হৃৎপিণ্ডের কাছ থেকে পাচ্ছে তা শিরাগুলির ছোট শাখা-প্রশাখায় ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে আবার তা হৃৎপিণ্ডের দিকে ফেরে, যাতে এই রক্তের গতিবিধি হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা সঞ্চালন যা সমানে চলছে-চলছেই। সেটা তিনি বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করছেন অস্ত্রচিকিৎসকদের সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে—যে অস্ত্রচিকিৎসকেরা দেখিয়েছেন যে শিরার যে-স্থানটি তাঁরা উন্মুক্ত করছেন, তার উপরে যদি হাতটাকে সামান্য জোরের সঙ্গে বাঁধা যায় তো সেখান থেকে তখন যত বেশি রক্ত বেরোবে, ততটা রক্ত বেরোত না যদি হাতটা তাঁরা একেবারেই না বাঁধতেন। এবং ফল হত সম্পূর্ণ বিপরীত যদি হাতটাকে তাঁরা বাঁধতেন তলার দিকে, অর্থাৎ করতল ও ছিদ্রের মাঝামাঝি কোনো জায়গায়, অথবা সেই হাতকে যদি তাঁরা বাঁধতেন উপরেই, কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে। কারণ এটা অতি পরিষ্কার যে বাঁধুনিটা যদি সামান্য জোরের সঙ্গে হয় তো যে-রক্ত আগে থেকে রয়েছে হাতে, সেটাকে যেমন তা বিচার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দিকে যেতে দেবে না, তেমনি নতুন রক্ত যাতে ধমনীর মাধ্যমে ক্রমাগতই সেখানে আসতে পারে, সেটাও তা ঠেকাবে না। এটা হয়, কেন-না ধমনীগুলির অবস্থান শিরাগুলির নিচে এবং শিরাগুলির চেয়ে তাদের গাত্রাবরণ আরো শক্ত বলেই তাদের উপর চাপ দেওয়া ততটা সহজ নয়—তাছাড়া হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে তাদের মাধ্যমে করতলের দিকে যে-প্রবলতার সঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় রক্তে, তা দেখা যায় না যখন শিরাগুলি ধরে রক্ত সেখান থেকে ফেরে হৃৎপিণ্ডের দিকে। এবং যেহেতু এই রক্ত হাত থেকে বেরোচ্ছে সেই ছিদ্রের দিকে যা রয়েছে শিরাগুলির কোনো একটিতে, তাই বাঁধুনির উপরে, অর্থাৎ বাহুর প্রান্তসীমার দিকে, এমন কিছু পথ থাকতেই হবে যা ধরে রক্ত আসতে পারে ধমনীগুলি হতে। রক্ত-সঞ্চালন নিয়ে ইংরেজ চিকিৎসকটি যা বলছেন, তাতে এটাও তিনি বেশ ভালো-ভাবেই প্রমাণ করছেন যে শিরাদের আগাগোড়া পথের নানা জায়গায় কিছু-কিছু ঝিল্লীর অবস্থাননটি এমনই, যাতে রক্তকে শরীরের মাঝামাঝি কোনো স্থান হতে প্রান্তসীমার দিকে যেতে সেই ঝিল্লীগুলি কিছুতেই দেবে না—শুধু রক্ত যাতে সমস্ত প্রান্তসীমা হতে ফিরতে পারে হৃৎপিণ্ডের দিকে, একমাত্র সেই ব্যবস্থাই নেবে। এবং পরীক্ষা এটাও দেখাচ্ছে যে যে-কোনো একটি ধমনীও যদি কাটা যায়, তার মধ্য দিয়ে শরীরের যাবতীয় রক্ত অতি অল্প সময়ে বেরিয়ে আসতে পারে—এমনকি সে-ধমনী যদি হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাটি কোনো স্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে এবং তাকে কাটা হয় হৃৎপিণ্ড ও বাঁধুনির কোনো মধ্যবর্তী জায়গায়, তাহলেও ফল হবে একই, যাতে এমন কল্পনা কিছুতে না করা যায় যে এর কারণে যে-রক্ত বেরোচ্ছে, তা আসছে অন্য কোথা হতে।

কিন্তু আরো অনেক জিনিস রয়েছে যার ফলে বোঝা যায় রক্ত-সঞ্চালনের সেই কারণটিই সত্য যেটি আমি বলেছি[১৪]; কারণ, প্রথমত, যে-রক্ত বেরোচ্ছে শিরা থেকে এবং যে-রক্ত বেরোচ্ছে ধমনী থেকে, এদের মধ্যে যে-পার্থক্য[১৫] লক্ষিত হয় তার একমাত্র হেতু হল এই যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে বিরলীকৃত ও পাতিতের মতো হয়েছে বলেই সেই রক্ত আরো সূক্ষ্ম ও জীবন্ত, এবং মুহূর্তের মধ্যে হৃৎপিণ্ড থেকে বেরোনোর পর, অর্থাৎ ধমনীতে থাকা-

কালীন, সে-রক্ত আরো তপ্ততও—যতটা সূক্ষ্ম বা জীবন্ত বা তপ্ত তা ছিল না হৃৎপিণ্ডে ঢোকার একটু আগে, অর্থাৎ শিরায় তার থাকার সময়ে। এবং সতর্ক থাকলে এই পার্থক্যটা স্পষ্ট ঠেকে রক্ত যখন হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে, তখন—যেসব জায়গা হৃৎপিণ্ড হতে বহু দূরে, সেখানে এ-পার্থক্য ততটা প্রতীয়মান হবে না। এ ছাড়া ধামনিক শিরা ও মহা-ধমনীর বহিরাবরণ যে-চর্মে আচ্ছাদিত, তার কাঠিন্যটাই ভালো করে জানিয়ে দেয় যে রক্ত এই ধমনীগুলির গায়ে যতটা জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারে, শিরাগুলির ক্ষেত্রে ততটা করে না[১৬]। এবং হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটি ও মহাধমনী যদি ডান দিকের প্রকোষ্ঠটি ও ধামনিক শিরা হতে প্রশস্ততর ও বৃহত্তর হয়ই তো তার কারণ কি শুধু এই নয় যে শিরা-শ্রিত ধমনীর রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু একমাত্র ফুসফুসেই আসছে, তাই অন্য যে-রক্ত সরাসরি আগত মহাশিরা হতে, তার চেয়ে এই রক্ত একদিকে যেমন আরো সূক্ষ্ম, অন্য দিকে তেমনি এটি বিরলীকৃততও হয় আরো ভালভাবে ও আরো সহজে? এবং নাড়ী টিপে চিকিৎসকরাই বা কী ঠাওর করতে পারবেন যদি-না এটা তাঁদের জানা থাকে যে রক্তের প্রকৃতি যেভাবে বদলায়, তাতে হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ অনুযায়ী তা বিরলীকৃত হতে পারে আগের তুলনায় কম অথবা বেশি ভালভাবে, এবং কম অথবা বেশি জোরের সঙ্গে? এবং যখন বিচার করা যায় এই উত্তাপ কী প্রকারে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন স্বীকার করা কি উচিত নয় যে এটা হতে পারছে একমাত্র রক্তেরই মাধ্যমে, যে-রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে-জায়গাটায় নিজেকে উত্তপ্ত করে, পরে সেখান থেকে নিজে যেমন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, উত্তাপটাকেও ছড়িয়ে দেয়? এরই জন্য শরীরের কোনো অংশ হতে যদি রক্ত তুলে নেওয়া যায়, তার দ্বারা উত্তাপও সঙ্গে-সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে। এমন-কি হৃৎপিণ্ড যদি জ্বলন্ত কোনো লৌহখণ্ডের মতোও তপ্ত হয়, তবু হাত-পা গরম করে রাখার পক্ষে সে-উত্তাপ কিছুতে পর্যাপ্ত ঠেকবে না, যদি-না সেই হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা থাকে সর্বক্ষণই নতুন রক্তের চালান দিয়ে যাওয়ার। এর থেকে জানা যায় শ্বসন-পদ্ধতির আসল উপযোগিতা হল এই যে তা ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণে তাজা বায়ু বহন করে আনে যাতে হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের প্রকোষ্ঠ হতে যে-রক্ত ফুসফুসে আসছে, এবং যে-রক্ত সেই প্রকোষ্ঠে থাকাকালীন ইতিমধ্যে যেমন বিরলীকৃত তেমনি প্রায় বাষ্পে পরিণত, তা ফুস-ফুসে ঘন হতে পারে এবং বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠে নতুন করে পড়বার আগে আবার পরি-বর্তিত হতে পারে রক্তে[১৭]—এটা এমন যদি না হত তো যে-আগুন সেখানে রয়েছে, তার যোগ্য খাদ্য হিসেবে রক্ত ব্যবহৃত হতে পারত না। এই প্রমাণের সাক্ষ্য মেলে যখন দেখি যে-জন্তুদের ফুসফুস নেই, হৃৎপিণ্ডে একটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠও তাদের নেই; এবং শিশুরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যখন ফুসফুস ব্যবহার করতে পারে না, তখন তাদেরও থাকে এক-দিকে যেমন একটি ছিদ্র যার মাধ্যমে মহাশিরা হতে কিছু রক্ত গড়িয়ে পড়ে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটিতে, অন্যদিকে তেমনি একটি পথও যার মাধ্যমে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে না গিয়ে কিছু রক্ত ধামনিক শিরা হতে মহাধমনীতে চলে আসে। তারপর হজমের সেই ব্যাপারটা, সেটাই বা পাকস্থলীতে কী করে ঘটবে যদি-না সেখানে হৃৎপিণ্ড ধমনীদের মাধ্যমে কিছু উত্তাপ পাঠিয়ে দেয়, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে অতি প্রবহমান কিছু রক্তও, যার সাহায্যে সেখানে যে-ভুক্ত মাংসখণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, তা গলে যেতে পারে? এবং যে-ক্রিয়ার ফলে ঐ মাংসখণ্ডগুলির রস পরিণত হয় রক্তে, তাকেও বোঝা কি তখন সহজ হয়ে ওঠে না যখন বিচার করা যায় যে সেই রক্ত দিনে হয়তো একশো কি দুশো বারেরও বেশি করে

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে-গিয়ে পাতিত হয়ে চলেছে? এবং পুষ্টি ও শরীরে নানা তরল পদার্থের[১৮] উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য বেশি আর কিছু বলার কি দরকার আছে যে যে-শক্তির সংগে বিরলীকৃত হয়ে রক্ত ধায় হৃৎপিণ্ড হতে ধমনীদের প্রান্তসীমার দিকে, তারই ফলে সেই রক্তের কিছু-কিছু অংশ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্থিত অন্য রক্তে এসে আটকে যায়, পরে সেই অন্য কিছু রক্তকে হটিয়ে তার জায়গা সে দখল করে নেয়, এবং তখন যেসব লোমকূপের তা সম্মুখীন হয়, তাদের অবস্থান বা আকার বা ক্ষুদ্রতা অনুযায়ী তার কিছু অংশ এখানটার বদলে ওখানটায় ছোটে—ঠিক যেভাবে চোখ থাকলেই দেখা যায় কী করে নানা রকমের ছিদ্রবহুল নানান চালনী ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রকারের শস্য পৃথক করার কাজে? এবং অবশেষে, এই আগাগোড়া ব্যাপারটায় যেটা সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয়, সেটা হল জীবং সত্তাগুলির[১৯] জন্ম, যে-সত্তাগুলিকে তুলনা করা চলে অতি মিহি কোনো হাওয়ার সংগে, বা বরং খুব-জীবন্ত ও খুব-পবিত্র কোনো শিখার সংগে যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে উঠেই চলেছে হৃৎপিণ্ড হতে মস্তিষ্কে, সেখান থেকে স্নায়ুর পথ ধরে এগোচ্ছে পেশীর দিকে এবং গতি দিচ্ছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে। এবং রক্তের যে-অংশগুলি আপেক্ষিকভাবে বেশি চঞ্চল ও সূক্ষ্মাগ্র বলেই এই জীবং সত্তাগুলির যথার্থ উপাদান হওয়ার আরো বেশি যোগ্য, তারা অন্যত্র না গিয়ে কেন মস্তিষ্কের দিকে যায়, এর পিছনে অন্য কোনো কারণ ভাবার প্রয়োজন নেই—শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সেই রক্তকে সেখানে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে যে-বিশেষ ধমনীগুলি সেগুলি হৃৎপিণ্ড থেকে সোজা আসছে মস্তিষ্কে, এবং বলবিদ্যার নিয়মগুলি যদি ধরি, যে-নিয়ম প্রকৃতির ক্ষেত্রেও সমানই প্রযোজ্য, তো তদনুসারে দেখি অনেকগুলি জিনিস যখন একসংগে এমন একই কোনার দিকে এগোতে চায় যেখানে সকলের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ঠিক যে-জিনিসটি ঘটে রক্তের ঐ অংশগুলির পক্ষে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠটি হতে বেরিয়ে মস্তিষ্কাভিমুখে যেতে চাওয়ার সময়, তখন তাদের মধ্যে বেশি দুর্বল ও কম চঞ্চলেরা বেশি শক্তদের দাপটে সে-পথ থেকে সরে আসবেই এবং শেষে ঐ বেশি শক্তরাই একলা যাবে সেখানে।

এই সব জিনিসই অতি বিশেষ করে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম আমার সেই নিবন্ধটিতে যেটি এক সময় প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। তাতে আরো যা দেখাই, তা মনুষ্য-শরীরের স্নায়ু ও পেশীগুলির কী-রকম গঠন হওয়া উচিত যাতে তাদের শক্তি থাকে সেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করতে—এবং তাই দেখা যায় মুণ্ড শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাতে প্রাণ না থাকা সত্ত্বেও কী করে তা নড়া-চড়া করে আরো খানিকক্ষণ এবং মাটী কামড়ে পড়ে থাকে। সে-নিবন্ধে দেখাই জাগরণ এবং নিদ্রা ও স্বপ্ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন-বিশেষে মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্-কোন্ পরিবর্তন সাধিত হওয়া দরকার, কী করে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যস্থতায় আলো-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-উত্তাপ ও বিভিন্ন বাহ্যিক পদার্থের যাবতীয় অন্যান্য গুণাগুণ সেই মস্তিষ্কে নানা রকম ধারণা মুদ্রিত করতে পারে, এবং কী করেই বা সেই একই মস্তিষ্কে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি অন্যান্য আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ তাদেরও স্ব-স্ব ধারণাগুলি পাঠাতে সক্ষম হয়। দেখাই, যেখানে ঐ ধারণাগুলি গৃহীত হচ্ছে, সেই সাধারণ বোধ[২০] বলতে কী বোঝা দরকার; যে-স্মৃতিশক্তি তাদের সংরক্ষণ করে, সেটাই বা কী; বা সেই কল্পনা-শক্তিটাই বা কী, যা তাদের নানাভাবে পাল্টাতে পারে, যা কখনো এক ধারণা হতে অন্য নতুন ধারণার সৃজনেও সক্ষম হয়, এবং যা একই পদ্ধতিতে জীবং সত্তাগুলিকে বিভিন্ন পেশীর মধ্যে বিতরণ করে সেই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি চালায় এত অজস্র রকমে—এবং যে-সব

বাহ্যিক বস্তুর সংস্পর্শে আসে সেই শরীরের ইন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ, তাদেরও কারণে ঐ কল্পনাশক্তি এত অজস্রভাবে নড়ায়-চাড়ায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে যে, যেটা আমাদেরই নিজেদের শরীরের ক্ষেত্রে দেখেছি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি চলতে সক্ষম হয় আপনা থেকেই, আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করেই। এটা তাদের কাছে একেবারেই অদ্ভুত ঠেকবে না যারা জানে মানুষ মাথা খাটিয়ে অতি অল্প জিনিসের সাহায্যে যত বিচিত্র ধরনের যন্ত্রচালিত পুতুলই বানাতে পারুক না কেন—এবং যে-কোনো প্রাণীর দেহে যে-বিপুল সংখ্যক হাড়-পেশী-স্নায়ু-ধমনী-শিরা ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিস আছে, তার তুলনায় এ-ধরনের পুতুলের উপকরণ নিশ্চয় নিতান্তই সামান্য—তবু ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া বলেই এই দেহ এমন এক যন্ত্র, যা মানুষের আবিষ্কৃত যে-কোনো যন্ত্র হতে অতুলনীয়ভাবে বেশি সূক্ষ্মকৌশল হবেই, এবং যে-মনোরম গতির অধিকারী ঐ দেহ, তাও সম্ভব নয় মানুষের তৈরী কোনো পুতুলে।

এবং এখানে আমি বিশেষ করে দাঁড়াই এটি দেখাতে চেয়ে যে যদি এই ধরনের কোনো যন্ত্র পাওয়া যেত যা যুক্তিশক্তিহীন কোনো বানর বা অন্য কোনো প্রাণীর বাহ্যিক অবয়বের সকল অংগে সমশিক্ত হত তো তাহলে সেই যন্ত্রের অঙ্গগুলি যে সেই-সেই প্রাণীর অঙ্গগুলির প্রকৃতিরই হুবহু অনুরূপ নয়, সেটা বোঝার কোনো উপায়ই আমাদের থাকত না। উল্টে যদি এমন যন্ত্র পাওয়া যায় যাতে আমাদের শরীরের অনুরূপ অঙ্গ রয়েছে এবং যা সর্বরকমে যথাসম্ভব আমাদের কর্ম বা আচরণের অনুকরণ করছে, তা হলেও সেটা যে কিছুতেই যথার্থ মানুষের মতো হচ্ছে না, এ-কথা বোঝার দুটি অতি-নিশ্চিত উপায় আমাদের কিন্তু সব সময় থাকবে। সেই দুটি উপায়ের প্রথমটি হল এই যে ঐ যন্ত্রের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না কথা বলা বা কথা রচনা করতে গিয়ে নানান স্বাভাবিক ভংগী করা, যেমনটি আমরা করে থাকি যখন আমরা কী ভাবছি-না-ভাবছি তা অন্যকে জানাতে চাই। কারণ সে-রকম কোনো যন্ত্রের কল্পনা করা খুবই চলে যা তৈরী এমনভাবে যাতে তা কথা উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, এমন-কি শারীরিক কোনো ক্রিয়া যখন তার অংগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটায়, তখন সেই উপলক্ষের উপযোগী কিছু কথাও হয়তো সে আওড়ে ফেলতে পারে—এই যেমন কেউ তাকে স্পর্শ করল কোনো জায়গায় আর সংগে-সংগে সে প্রশ্ন করে বসল তাকে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, বা অন্য এক জায়গায় তাকে ছোঁয়া হল আর সে চেঁচিয়ে উঠল তার লাগছে বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তার সামনে যা-কিছু বলা হচ্ছে, সে-সবের প্রসংগ অনুযায়ী উত্তর দেবে তার কথাগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে—যেটা যত হতবুদ্ধিই হোক, সব মানুষে পারবে—এটা করা সম্ভব হবে না সে-যন্ত্রের পক্ষে। এবং উল্লিখিত দ্বিতীয় উপায়টি হল, এমনও যদি হয় যে সে-যন্ত্র বহু জিনিস করছে আমাদের যে-কোনো কারুরই মতন বা হয়তো তার চেয়ে আরো ভালো করে, তবু অন্য অনেক জিনিস থাকবেই যাতে সে ব্যর্থ হতে বাধ্য—যার থেকে বোঝা যাবে যে-জিনিসটা তাকে চালাচ্ছে, সেটা জ্ঞান নয়, শুধু তার অঙ্গগুলির বিশেষ বিন্যাস বা অবস্থান মাত্র। কারণ, যেখানে যুক্তি হল এমন এক বিশ্বজনীন কল যাকে কাজে লাগানো চলে সকল রকমের উপলক্ষে, সেখানে প্রতিটি বিশেষ কাজের জন্য ঐ যন্ত্রের দরকার হয় তার অঙ্গগুলির বিশেষ বিন্যাস-পদ্ধতি। এর ফলে এমন যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব ঠেকে না যার নাকি এত রকমের বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে যে সেগুলিকে তা জীবনের সর্ব প্রয়োজন অনুযায়ী চালাতে পারবে ঠিক সেইভাবে যে-ভাবে আমাদের যুক্তি চালায় আমাদের।

অর্থাৎ, পশু ও মানুষের পার্থক্যটা কোথায়[২১] সেটাও জানা যায় উপরে বর্ণিত ঐ

ত্রুটি উপায় হতেই। কারণ, যেটা খুবই লক্ষ্য করার বিষয়, তা হল এমন মানুষ কোথাও নেই —তা সে-মানুষ যত হতবুদ্ধি বা যত বোকাই হোক না কেন, এমন-কি পাগলদেরও এর থেকে বাদ দিচ্ছি না—যে নাকি সক্ষম নয় একটি কথার সমষ্টিকে সাজাতে এবং তার দ্বারা তৈরী করতে এমন একটি ভাষণ যার মাধ্যমে সে অন্যকে বোঝাতে পারে তার চিন্তা-ভাবনা। এবং পক্ষান্তরে, এমন আর অন্য কোনো প্রাণীই নেই যার পক্ষে হেন কাজ সম্ভব, তা সে-প্রাণী যত সম্পূর্ণই হোক না বা যত ভাগ্য নিয়েই জন্মে থাকুক না। এ-রকমটা যে হচ্ছে, তার কারণ এই নয় যে ঐ সব প্রাণীদের অঙ্গের দিক থেকে কোনো ঘাটতি আছে, যেহেতু দোয়েল ও তোতা পাখিদের যদিও দেখা যায় কিছু কথা আমাদের মতো উচ্চারণ করতে, আমাদের মতো কথা তারা বলতে পারে না—অর্থাৎ যেটা ভেবেছে, স্পষ্টত সেটাই তারা বলছে, এমন নয়। অন্যদিকে মানুষের বেলায় দেখি, যারা মূক ও বধির হয়ে জন্মেছে এবং তাই যারা পশুদেরই মতো কি আরো বেশি করে বঞ্চিত সেই অঙ্গগুলি হতে যা অন্যদের বাকশক্তি দেয়, তারাও স্বয়ং আবিষ্কার করে থাকে এমন কিছু সংকেত যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বোঝাতে পারে অন্যদের কাছে—যে-অনোরা সাধারণত তাদের সঙ্গে থাকে বলেই তাদের ভাষা শেখারও অবকাশ পায়। এবং এর মানে শুধু এই নয় যে মানুষের থেকে পশুর যুক্তিশক্তি কম—কথা যা, তা হল ঐ যুক্তিশক্তিটা পশুদের একেবারেই নেই। কারণ সকলেই জানে কথা বলতে পারার জন্য খুব কম যুক্তিশক্তিরই দরকার পড়ে—এবং যত বৈষম্যই লক্ষ্য করা যাক না কেন একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে, অথবা এক মানুষ থেকে আরেক মানুষেও, এবং যতই বলা যাক না কেন যে একজনদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলা আরেকজনদের থেকে সোজা, তবু একটা বানর বা তোতা পাখি, তা তারা হয় হোক না কেন তাদের স্ব-স্ব প্রজাতির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিনিধিই, তারা যে এ-ব্যাপারে নির্বোধতম বা ন্যূনপক্ষে বিকৃতমস্তিষ্ক কোনো মনুষ্য-শিশুরও সমান হতে পারবে, এ-কথা বিশ্বাস করা কিছুতেই যাবে না। এর কারণ হল এই যে আমাদের চৈতন্যের প্রকৃতি আর তাদের চৈতন্যের প্রকৃতি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এবং আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহের তাগিদে শরীরে যে-স্বাভাবিক গতিবিধি জাগে, এবং যা যন্ত্র ও প্রাণী উভয়েই অনুকরণ করতে পারে, তার সঙ্গে কিন্তু কথা বলার ক্ষমতাটাকে এক করে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। কোনো-কোনো প্রাচীনদের মতো এমন ভাবাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে পশুরা আসলে সত্যিই কথা বলে, শুধু আমরাই তাদের ভাষাটা বুঝি না। কারণ সেটা যদি সত্যি হত তো তাদের ও আমাদের বহু অঙ্গ একই রকমের বলেই তাদের জাতভাইকে যেটা বোঝাচ্ছে, সেটা তারা আমাদেরও বোঝাতে পারত। এটাও রীতিমতো লক্ষ্য করার বিষয় যে যদিও তাদের কোনো-কোনো কাজে কিছু প্রাণী আমাদের চেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখায়, অন্য বহু কাজে সেই একই প্রাণীদের কোনো নৈপুণ্যই দর্শিত হয় না। যার ফলে কোনো-কোনো কাজ তারা আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে করছে বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে তাদের বুদ্ধি আছে, কারণ কাজ ভালো করছে বলেই যদি বুদ্ধি থাকে তো তাহলে সে-বুদ্ধি আমাদের যে-কোনো কারুর চেয়েই বেশি থাকত তাদের এবং সে-ক্ষেত্রে অন্য সকল কাজই তারা আরো ভালো করত। বরং যেটা প্রমাণিত হচ্ছে, সেটা হল বুদ্ধি তাদের নেই এবং একমাত্র প্রকৃতিই তাদের চালাচ্ছে, তাদেরই অঙ্গসমূহের বিন্যাস অনুযায়ী। ঠিক যেমন বড় কোনো ঘাঁড়, যা তৈরী শুধু চাকায় আর স্প্রিং-এ, তা ঘণ্টা গুনে যায় কাঁটায়-কাঁটায় এবং সময়ের মাপ রাখে এমন যথাযথভাবে, যেটা নাকি আমরা পারব না আমাদের সকল সতর্কতা অবলম্বন করেও।

এর পরে আমি বর্ণনা দিই আত্মার, যা সম্পন্ন যুক্তিশক্তিতে, এবং দেখাই কেন তার পক্ষে জড়ের শক্তি হতে উদ্ভূত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, যেমন নাকি উদ্ভূত হয়েছে অন্য অনেক জিনিস যার কথা আগে বলেছি। উল্টে বলি, সে-আত্মাকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করার দরকার, এবং দেখাই, কোনো কর্ণধার যেভাবে তার জাহাজে উপস্থিত থাকে, কেন শুধু সেইভাবে মনুষ্য-শরীরে অবস্থিত হওয়াটাই আত্মার পক্ষে যথেষ্ট নয়—সেটা হয়তো যথেষ্ট ঠেকত শুধু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার জন্য। কিন্তু এখানে দরকার যা, তা সেই আত্মার পক্ষে শরীরের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও মিলিত হওয়া, যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা ছাড়াও যে-ধরনের ভাব ও বাসনা আমাদের থাকে, সেগুলি জাগতে পারে, এবং এইভাবে রচিত হতে পারে এক যথার্থ মানুষ। এ ছাড়া, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আত্মার প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি এখানটায় একটু বিস্তারিতভাবে মাতি। কারণ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে কেউ-কেউ যে-ভুলটি করে—যে-ভুল কিছু আগে উচিত মতো খণ্ডিত করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি—সেই ভুলটা বাদ দিলে অন্য যে-কোনো ভুলের থেকে যা সবচেয়ে বেশি করে ধর্মের সোজা রাস্তা হতে দুর্বলমতিদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা হল এই ধারণা যে পশুদের ও আমাদের চৈতন্যের প্রকৃতি এক এবং তাই মাছি বা পিঁপড়ের ক্ষেত্রে যেমন, আমাদেরও তেমনি এ-জীবনের পরে কিছু ভয়ের নেই, কিছু আশা করারও নেই। আসলে এই দুই চৈতন্যের প্রকৃতিতে তফাতটা যে কতখানি, তা জানলে বোঝা যায় অন্য সেই যুক্তিও যা আমাদের আত্মাকে শরীর হতে সম্পূর্ণ এক স্বাধীন প্রকৃতির বলে প্রমাণ করে। এবং তাই শরীর গেলেও আত্মা মৃত্যুর অধীন হয় না; তা ছাড়া এমন কোনো কারণই যেহেতু দেখছি না যার দ্বারা সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আমরা স্বভাবতই এই বিচারে প্রবৃত্ত হই যে এ-আত্মা অবিনশ্বর।

পাদ-টীকা

[১]কোনো জ্যামিতিক প্রমাণের প্রতিজ্ঞাগুলির ক্ষেত্রে যেমন, কার্তেজীয় পদার্থবিদ্যায় সত্যগুলিও একটি থেকে আরেকটি অনুমিত হয়।

[২]স্পষ্টতই, অধিবিদ্যার থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বলতে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। এর আগের খণ্ডে আলোচনা করেছেন অধিবিদ্যা। এখানে আলোচ্য পদার্থবিদ্যা।

[৩]যেমন, পৃথিবীর গতিবিধি বিষয়ক প্রসঙ্গ।

[৪]অর্থাৎ যাজকীয় কর্তৃপক্ষেরা।

[৫]রচনাটি হল "পৃথিবী অথবা আলোক-বিষয়ক নিবন্ধ", যেটি দেকার্ত লিখতে সুরু করেন ১৬২৯-এ। কিন্তু ১৬৩৩-এ গ্যালিলিও-র (১৫৬৪-১৬৪২) শাস্তির খবর পেয়ে লেখাটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৬৬৪-তে, দেকার্তের মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে।

[৬]দেকার্তের এই প্রকল্পটির সহজ অর্থ হল এই যে একবার যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি-কর্ম সমাধা করেছেন, তখন পৃথিবী সম্পূর্ণ নিজের উপরই নির্ভর করে থাকবে এবং পরিচালিত হবে একমাত্র বল-বিদ্যার নিয়ম-কানুন অনুযায়ী। পাস্কাল (১৬২৩-১৬৬২) এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন ও বলেন : "দেকার্তের এটা আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। তাঁর দর্শনে সর্বত্র ঈশ্বরকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন, শুধু পৃথিবীকে তার গতিপথে চালিয়ে দেওয়ার বেলায় তাঁর দরকার পড়ল ঈশ্বরের আঙুলের টোকাটির। কিন্তু তার পরেই, ঈশ্বরকে নিয়ে আর কিছু করার তাঁর নেই।"

[৭]অর্থাৎ মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তাধারার উল্লেখ করেছেন দেকার্ত।

[৮]দেকার্তের এ-ধারণা ভুল—কারণ আলোর পক্ষে মহাকাশের বিরাট-বিরাট দূরত্ব এক মুহূর্তে পার হওয়া সম্ভব নয়।

[৯]এ-ব্যাপারে তৎকালীন খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে চাননি বলেই দেকার্ত এ-কথা বলছেন।

[১০]অর্থাৎ সৃষ্টির অলৌকিকতাকে দেকার্তও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বস্তুর পক্ষে আপনা থেকে উদ্ভূত

হওয়া সম্ভব নয়—কারণ আগে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে হবে জড়, পরে প্রকৃতির নিয়মগুলি বেঁধে দিয়ে বস্তুকে তিনি সংরক্ষণ করবেন প্রতি পদে।

১১ অর্থাৎ যা-কিছু চিন্তা নয়, তার সবই যান্ত্রিক, যেমন যন্ত্র মনুষ্য-শরীরও—এই দৃঢ়বিশ্বাস দেকার্তের।

১২ আত্মা ও শরীরের মধ্যে যে-সারগত পার্থক্য দেকার্ত করছেন, কার্তেজীয় যান্ত্রিকতা বলে যা পরিচিত, সেটা তারই স্বাভাবিক ফল। দেকার্ত যান্ত্রিকতার প্রচার করছেন, জড়বাদের কথা বলছেন না।

১৩ উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)।

১৪ অর্থাৎ এখন এই অনুচ্ছেদে যা বলছেন, তা সবই হার্ভের বিরোধিতা করে।

১৫ দেকার্ত বলছেন, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যে-উত্তাপ আছে, তারই ফলে রক্ত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও গতিবিধির কারণ সেইটাই। অন্যদিকে হার্ভের মত হল এই যে হৃৎপিণ্ডই কুঞ্চিত হওয়ার সময় ধমনীতে রক্ত পাঠিয়ে দেয়, এবং তার প্রকল্প অনুযায়ী শিরাশ্রিত রক্তের ধামনিক রক্তে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা অব্যাখ্যাত থেকে যায়, যদিও দেকার্তের প্রকল্পে সেটি অব্যাখ্যাত থাকে না। কিন্তু শিরাশ্রিত রক্তের ধামনিক রক্তে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা ঘটছে হৃৎপিণ্ডে, এমন বিশ্বাস করে দেকার্ত ভুল করেন—আসলে ঘটনাটা ঘটছে ফুসফুসে, শ্বসন-প্রক্রিয়ার পরিণাম হিসেবে, যেটা ১৭৭৭ সালে ফরাসী রসায়নবিদ লাভোআজিএ (১৭৪৩-১৭৯৪) পরিষ্কার করে দেখাবেন।

১৬ শিরা ও ধমনীর পারস্পরিক গঠন বিষয়ে এই যে-পার্থক্যটি করছেন দেকার্ত, সেটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—কারণ ফুসফুসের যে-ধমনীটি, তাতে থাকে শিরার রক্ত। রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাপারটা আজ আমরা যেভাবে জানি, দেকার্ত সেভাবে বোঝেননি। তাঁর ধারণা ছিল, হৃৎপিণ্ড হতে ধমনী দিয়ে একমাত্র ধামনিক রক্তই বেরোতে পারে (ফুটন্ত অবস্থায়) এবং শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে যা ফিরে আসে, তা শিরাশ্রিত রক্ত মাত্র (হিমশীতল হয়ে)।

১৭ সমসাময়িক অধিকাংশ চিকিৎসাবিদদের মতোই দেকার্তও ধরতে পারেননি ফুসফুসের আসল ক্রিয়াটি। সেই ক্রিয়াটিকে তিনি ভেবেছিলেন ফুসফুসের এক হিমায়ন পদ্ধতি হিসেবে।

১৮ অর্থাৎ ঘর্ম, প্রস্রাব, ঘাম।

১৯ জৈব পদার্থের মধ্যে নিহিত অদৃশ্য কিছু কণিকা, একমাত্র যাতেই লুকিয়ে থাকে প্রাণের রহস্য সমস্ত জীবের। এরকম একটি ধারণা মধ্য যুগের দার্শনিকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

২০ মস্তিষ্কের মধ্যখানের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি, যেখানে এসে হাজির হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত অনুভূতির প্রতিবিম্ব।

২১ এই অনুচ্ছেদে দেকার্ত খণ্ডন করছেন ম'তেইন-এর (১৫৩৩-১১১২) একটি প্রিয় প্রতিপাদ্য। ম'তেইন বলতে চেয়েছিলেন, পশুরা আসলে যুক্তিশক্তিহীন নয়—শুধু মানুষই পশু ও তার নিজের মধ্যের পার্থক্যটাকে বাড়িয়ে দেখে। এমনও তিনি বলেন যে কখনো-কখনো এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের যে-বৈষম্য দেখা যায়, তা মানুষের সঙ্গে পশুর বৈষম্য থেকে বেশি। পশুরা যে যুক্তিশক্তিহীন নয়, তার স্বপক্ষে ম'তেইন-এর যুক্তি হল : এক, পশুদের ভাষা আছে, যদিও মানুষে সেটা বোঝে না; দুই, কোনো-কোনো পশু-পক্ষী-কীটের (যেমন, বাঘই পাখি, বা মৌমাছি, বা পিঁপড়ে) মধ্যে এমন দক্ষতা ও গুণপনা দেখা যায় যা মানুষে মেলা ভার। কিন্তু দেকার্ত কোনো পশুকেই কোনো রকমের যুক্তিশক্তির অধিকারী বলে মনে করেন না। কোনো ব্যাপারে দক্ষতা মানেই যে যুক্তিশক্তিরও অধিকারী হওয়া, তা নয়।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে দেওয়া হল, সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী। এখানে প্রদত্ত কোনো-কোনো ফরাসী শব্দ আজকের প্রচলিত রীতি হতে পৃথক ঠেকতে পারে, কিন্তু দেকার্ত সেইভাবেই তাদের ব্যবহার করেছিলেন। প্রদত্ত কোনো-কোনো শব্দের বাংলা তর্জমাও হয়তো একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে, কিন্তু তেমন সব শব্দের সেই অর্থই এখানে দেওয়া হয়েছে যে-অর্থে দেকার্ত তাদের ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুবাদক ধারণা করেন।

অঙ্গ, organe, organ
অধিবিদ্যা, metaphysique, metaphysics
অনুমিত, déduit, deduced
অভিকর্ষ, pesanteur, gravity
অস্ত্রচিকিৎসক, chirurgien, surgeon
আত্মা, âme, soul
আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ, passions intérieures, interior sensations

উদ্ভিদোপম বুদ্ধিশূন্য আত্মা, âme végétante, vegetative soul
কর্ণধার, pilote, pilot
গোজিয়া, bourse, purse
গ্রন্থি, glande, gland
গ্রীষ্মমণ্ডল, tropiques, the tropics
জড়, matière, matter
জড়বাদ, matérialisme, materialism
জীবৎ সত্তাগুলি, esprits animaux, animal spirits
ঝিল্লী, petite peau, membrane
তত্ত্ব, principe, principle
ধামনিক শিরা, veine artérieuse, arterial vein
নিবন্ধ, traité, treatise
পদার্থবিদ্যা, physique, physics
পরীক্ষা, expérience, experiment
পাতিত, distillé, distilled
প্রকল্প, hypothèse, hypothesis
প্রজাতি, espèce, species
প্রতিজ্ঞা, proposition, proposition
প্রাণহীন বস্তু, corpse inanimé, inanimate body
বলবিদ্যা, mécanique, mechanics
বিরলীকৃত হওয়া, se raréfier, to rarefy
মধ্য যুগের দার্শনিকরা, scolastiques, scholastics
মহাধমনী, grande artère, aorta
মহাশিরা, veine cave, vena cava
যন্ত্র, machine, machine
যন্ত্র, organe, organ
যান্ত্রিকতা, mécanisme, mechanism
যুক্তিক্ষম আত্মা, âme raisonnable, rational soul
যৌগিক পদার্থ, corps composé, compound body
শারীরস্থান, anatomie, anatomy
শিরাশ্রিত ধমনী, artère veineuse, venous artery
শ্বাসনালী, trachée-artère, wind-pipe
সমভার, contrepoids, counterweight
সম্ভাব্য, vraisemblable, probable
সম্পূর্ণ, parfait, perfect
সংবেদী আত্মা, âme sensitive, sensitive soul
সূক্ষ্মভেদী, pénétrante, pointedly penetrating
স্থান, espace, space
স্নায়ু, nerf, nerve
স্প্রিং, ressort, spring
হিমায়ন, réfrigération, refrigeration

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সমালোচনা

গোধূলিতে জ্যামিতি—লোকনাথ ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা-১৭। মূল্য তিন টাকা

যে কবিতা চমকিত করে আর যে কবিতা দীক্ষিত করে, তাদের দুয়ের মধ্যে তফাতটা শুধু গুণগতই নয়—প্রকারগতও বটে। যা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করবে একটা ভঙ্গি, যা সহসা খুলে দেবে একটা জানলার পর্দা, তা মুগ্ধও করতে পারে, চমকিতও করতে পারে—কোনটাই ফেলে দেবার বিষয় নয়। কিন্তু যা কিছুই করে না, শুধু সন্ধ্যার মতো ঘন হয়ে আসে, মেঘের মতো গাঢ়, যা এক অনতিলক্ষ্য, অথচ নির্ভুল, পদক্ষেপে উত্তরোত্তর অধিগত করে, অধিকৃত করে—তা অন্য ধরনের কবিতা। এরা বিরল হতে পারে, সে সুবাদেই এদের দেখা পেলে স্বীকৃতি জানানোও আনন্দিত আবশ্যিকতা। লোকনাথ ভট্টাচার্যের "গোধূলিতে জ্যামিতি" এজাতীয় কবিতা। এ কিন্তু তাঁর আজকের অকস্মাৎ উচ্চারণ নয়। একদা যুবকের প্রথম দিনগুলিতে ইনিই কোনারকের ভগ্ন মন্দির-মূর্তির ভাবানুষঙ্গে এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। নিশ্চয় তাতে ছিল অনেক কথা যা শ্রুতি-অভিরাম, যা প্রথম প্রেমিকের উচ্চারণের মতোই আবেগকে উন্মোচিত রাখতেই ভালোবেসেছিল। কিন্তু সেদিনের ঐ কবির সঙ্গে আজকের এই কবির যত ব্যবধানই থাক না কেন, সেই ব্যবহিত দূরত্বটুকু পূর্ণ করে রেখেছে প্রস্তুতি ও বিকাশের দীর্ঘমাত্রার ছন্দ। একথা ঠিক, আজ বলার চাল পাল্টেছে, কবিতাকে কবিতার মতো পঙ্‌ক্তিবিন্যাস দিতে তাঁর পরাঙ্মুখতার কথাও আজকে নতুন নয়—তবু আজও যখনই শিল্পের জগৎ ও বর্তমান জগতের সর্বত্র নানা অনন্বয়ের কথা তিনি বলেন, বলেন মানুষের অন্তর্গূঢ় বিষণ্ণতার কথা, বিষণ্ণতার নীল পাপড়িগুলির মধ্যবিন্দুর স্থিত গন্ধটুকুর কথা—তখন সেই যাত্রারম্ভের পদক্ষেপটিকেও সর্বমিলিয়ে নতুন করে জানা যায়।

তিনি অবশ্যই এখনই পৌঁছানোর কথা ভাবছেন না। সে কারণেই তাঁর পদচারণা অনলস—অথচ তা লক্ষ্যবিস্মৃত নয়। তাঁর এই চলার দিকে তাকালে দুটো বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এক, তিনি কবিতাকে কোনো পক্ষের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন নি; দুই, অথচ, তিনি আঙ্গিককে খুঁজেছেন বহতা জীবনেরই উৎসে। এবং, আর একটি প্রধান কথাও তাঁর সম্বন্ধে জেগে ওঠে অবারিতভাবেই—লোকনাথ সেই সময়ের বাঙালী কবিদের একজন প্রবল ব্যতিক্রম, যখন জীবনানন্দকে অনুসরণ করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। শুধু এই কেতাকে পরিহার করে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য থাকলে, কথাটা এত বড়ো করে বলার কিছু ছিল না। যেহেতু তাঁর বলার বিষয় ছিল সহযাত্রীদের থেকে ব্যাপকতর, স্বতন্ত্র, সেইহেতুই তিনি বুঝেছিলেন, জীবনানন্দের একার্থসাধক বাচ্যাশ্রিত তাঁর অনুধাবনীয় হতে পারে, অনুকরণীয় নয়। তাঁর কবিতাকে তিনি প্রত্যক্ষের জলহাওয়া থেকে এতটা দূরে নিলেন না, যেখানে ব্যক্তির শব্দবিলাস হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বেরই যথেচ্ছ বিহার, যথা-অভিরুচি লীলা। আবার এ কবিতা হয়ে উঠল না সাধারণ্যের কবিতা। লোকনাথ জনগণের কবিও নন।

"গোধূলিতে জ্যামিতি" কবিরই ব্যক্তিগত স্বর। বিন্যাসে এবং প্রক্ষেপে সে-স্বর অর্জন

করেছে এক চারিত্র। চারিত্রের সেই সহজাত আধুনিকতাই এই কাব্যের নির্দিষ্ট আত্মকথা। আমিই ক্ষমাহ যদি এ ধারণা আমার ভ্রান্ত হয় যে, "গোধূলিতে জ্যামিতি" অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি নয়, একটিই দীর্ঘ কবিতা। নামকরণ থেকেই শুরু করা যায় কবিতাপাঠ। গোধূলির সঙ্গে যে-রঙের অনুষঙ্গ, জানালার আঁকিবুঁকিতে যে-বাস্তিগত বিষণ্ণতা ও স্বপ্ন—এই দীর্ঘ কবিতার বিষয় হল সেটাই। ঐ দুয়ের বিপরীত সমাবেশের মধ্যে অন্বয় এবং অনন্বয়ের যে কাটাকুটি, কিন্তু যাকে পেরিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রেখার ভাষা—এ কবিতার শব্দসম্পাতে তাইই রূপ পেয়েছে। উৎসর্গপত্রে উচ্চারিত হয়েছে একালের বন্দী শব্দদের আর্তি—

> এই শতাব্দীর আমি এক মানুষ, অন্যান্য শতাব্দীর
> মতোই—শুধু আমারই মতো কতিপয় মানুষের জন্য
> আমার আত্মীয়তার সযত্নে সাজানো কথাগুলি
> এ-দুর্গের চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছে উদ্ধারের
> প্রার্থনা নিয়ে বুকে।
> (পর্দার ওপারে পর্দা)

এক বিস্ময়কর মৃদু আস্তিকতা ধূপের মতো নীরবে ছড়িয়ে দিয়ে আপন অস্তিত্ব কবিতাগুলিতে—'গরুকে দেখছি না, যদিও পাশেই তিনি আছেনই—নইলে এ অন্ধকার কী করে শিল্প হল, কেন মন শুনছে মৃদঙ্গ বাজছে?' অথবা 'আমি তো জগৎ নয়, আমি থেকে আমরা-য় যাওয়াতেই নিসর্গ।' ত্রিকোণের প্রথম বাহুতে শিল্পে ও নিসর্গে যে-জগৎ কম্পমান অবিনশ্বরতায় বিরাজিত, তা প্রাধান্য পেয়েছে। একটা সামূহিক জীবনচেতনাও হয়তো ব্যক্তিগত উচ্চারণের ভিতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ হতে চেয়েছে। ত্রিভুজের দ্বিতীয় বায়ুতে ছায়া ফেলেছে সমকাল। 'আততায়ী'দের কথা, 'প্রতিশোধে'র ভাষা, সংশয় ও তৃষ্ণার রুক্ষতার প্রসঙ্গগুলি কলকাতা ও বাঙালীর তথা আমাদেরই তাৎকালিক অনপনেয় ক্লান্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> আমাদের যুগটা শেষ হয়ে এল নাকি? ঘড়া জলশূন্য প্রায়? এক
> বিন্দু পানীয়ের কসরতে যদি এখনো মাতি তো নিজেরই ঘাম ঝরবে
> মেরে কেটে দুয়েক ফোঁটা, ক্লান্ত খচ্চরের মতো হাঁপাবো, তবু পাত্রের
> তলানি হতে হয়তো পাঁকই উঠবে, আচিরে তাও উঠবে না।

যদিও 'দেয়ালে দেয়ালে ভীষণ বার্তার' মধ্যে 'কাকচক্ষু পানীয়' দুঃসম্ভব তথাপি; 'আশা তুমি রাখবেই হে সন্ধ্যার মানুষ—আমি ক্ষীণকণ্ঠ আজ বহুদূর হতে, সঙ্গী তোমার'। ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুতে প্রমাণিত হয় ব্যক্তির উত্তরণের বাসনা, বাত্যাতাড়িতের প্রতীক্ষা উপকূলের জন্য। 'একদিন এ আকাশ জ্বলবে-জ্বলবে দেখি, এ অরণ্য আনন্দে নাচবে।' কিংবা—

> যত নারী চিনেছি, হে'টেছি আমি যত পথ—
>
> চারিপাশের চেয়ে-থাকা নিসর্গের নন্দিত নিশ্বাসের হাওয়ায়
> হাওয়ায় তারা ছুটে মিলতে, মিশে যেতে চায় এসে
> তোমারই নামাঙ্কিত দরজায়।

তৃতীয় বা ত্রিকোণের শেষবাহুর প্রথম কবিতাটি আমার কাছে একটি সার্থক কবিতা—'তোমার সঙ্গে সঙ্গমের সময় সুজাতা'। একটা আচমকা বিষয়ের জন্যই যে কবিতাটির

গৌরব নয়—সে কথা যেকোনো মনোযোগী পাঠকই জানেন। কাকে শ্লীল বলে, কাকে অশ্লীল বলে, এ তর্কে যাঁরা মশগুল হতে ভালোবাসেন, এই ধরনের লেখাই তাঁদের জানিয়ে দেয়—কাউকে শ্লীল বলে না, কাউকে অশ্লীলও বলে না—অ্যাটিট্যুডই ব্যাপারটির বিচারক। কিন্তু সেটাও এখানে বড়ো কথা নয়। এই অসামান্য কবিতাটির প্রধান কথা হল আর্ত উদ্বেগাকুল আধুনিক মানুষের পার হয়ে যাবার, পৌঁছে যাবার তীব্র ঘন বাসনা। ব্যর্থতা যে মানুষের শিয়রে সতত অপেক্ষমান তারই জন্য লোকনাথ একটি অলৌকিক প্রতীকাধার নির্মাণ করেছেন—অথচ শেষ আশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। মানুষের সেই বাঞ্ছিত উত্তরণের মতো কবিতাটিও উত্তীর্ণ হয়েছে এক অমল আলোয়। 'অতএব সুরঞ্জনা' গভীরতায় অনুরূপ আর একটি। আজ আমাদেরই গড়া কথা থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। অনেক কথাই ঢালাই হয়েছে অনেক দিনের পুরনো ধাতুতে। আমাদের সমস্ত স্বীকারোক্তি তার আসন্ন মুহূর্তে সেই ছাঁচে ঢুকে পড়তে চায়—'হতভাগা কথা পাশেই রয়েছে ঘুপটি মেরে, মুড়ি দিয়ে শুয়ে'।

> অতএব হে আশ্চর্য স্তনের সুরঞ্জনা, একলা যুঝতে আমি
> আর পারছি না যে-যুদ্ধ এত পথ ভেঙে পৌঁছেছে বলেই
> অন্তত তোমারও আংশিক—অনেক দূর এসেছ, আরেকটু
> এগোতে হবে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে যে,
>
> তাকে করতে চাই মৃতদেহ, পরে দুজনে ধরাধরি
> করে নিয়ে যাব মর্গে।

কথার ওপারে যে নীরবতা এ যেমন তার জন্য খুঁজে ফেরা—'মর্গে' তেমনি জানিয়ে দিচ্ছে ব্যাধিমূল সম্বন্ধে কৌতূহলকে। 'এরাত্রে দরকার যা, তা মন্ত্রের, অগ্নিগর্ভ উচ্চারণের'—এই গাঢ় উচ্চারণ কখনো কখনো স্তোত্রের মতো উদাত্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এক কাঙ্ক্ষিত সংবেদিতার কারণে তা স্তোত্রের মতো সুদূর হয়ে ওঠে না। ত্রিকোণের দ্বিতীয় বাহু পর্যায়ের 'পাগলটা কথকটা' কবিতাটি স্মরণীয়। এক নাগরিক স্থূলতাকে আঘাত হানেন কবি, স্বার্থপরতাকেও—

> ভিতরে দাঁড়িয়ে-থাকা উত্তরতিরিশ এক খুকু, ঘামে
> জ্যাবজেবে, চেপ্টে যাওয়া, চশমাপরা, অল্প একটু আকাশের
> জন্য আকুল। আমার দিকে তাকাস কেন নেকি—মনে মনে
> বলি—আমি তোকে দেব আকাশ?

এই স্থূলতার সামনেও পাগলটা নেচে চলে। পাগলটাকে তার যথাযথতা থেকে একটুও উদ্ধার করা হয়নি। কবির নিজস্ব প্রার্থনা আর পাগলের ঘৃণিত ধিক্কারের মাঝখানে সমাসন্ন সার্বিক রাত্রির মুখে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা এই, 'পাগলটা কথকটা শিখেছিল একদিন, অবশ্য শিখেছিল'—। এইভাবে বস্তুতে নিহিত জ্ঞানেরই আর এক ছবি ফুটে ওঠে 'নেতার ছবি' কবিতায় অথবা 'মদিগ্লিয়ানি, জানি'-তে।

সব ছাপিয়ে যে-দুটি ব্যাপার আমাকে সংক্রামিত করে, যে বেদনায় আমিও হয়ে উঠি প্রণয়াহত, তার একটি হল এই কবির বিনয়ী ভালবাসা—আজ বহু উদ্ধৃত উক্তির আত্ম-নিনাদের স্মৃতিতে আকীর্ণ হৃদয় এমন কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে চায়—

> মুক্তা হয়নি যে-মলিন শঙ্খের কুচি, যখন তাকে খুঁজে

> পাবে এই ভাঙা ঘরের বেদীতে—পাবেই, কারণ এ-পথ
> দিয়েই তোমায়-তোমাদের যেতে হবে—জেনো এখানে
> তোমাদের এক আত্মীয় ছিল, রইল, তোমাদেরই মতো
> দুঃখের দুরন্ত সমবেত যাত্রায় যে দীপ্ত চোখে হাঁটতে
> চেয়েছিল।

এই প্রাণময় মানবিকতার কারণেই লোকনাথের কবিতা কখনো শব্দের খেলায় মাতে না, ইতস্তত 'রকচারী' হয়ে যুবকত্ব ফলায় না। আত্মীয়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা কম্যুনিকেট করার আকুলতায় সূচিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের পণ। এইখানেই লোকনাথের তাৎপর্যময় আধুনিকতার ব্যাখ্যাসূত্র। আত্মীয়তা তাই তাঁর এত প্রিয় প্রসঙ্গ—আত্মীয়হারা মানুষের হয়ে তাঁর এই আকুলতা। দ্বিতীয় গুণটি হল, এক স্বস্থ নাতিপ্রকট দার্শনিক আস্তিক্য। এখানে লোকনাথ একেবারেই ভারতীয়। সে-সব মুহূর্তে ধরা পড়ে তাঁর দেওয়া জীবনের মানে—'ধুঁকতে ধুঁকতে নয়, বলতে চাই আমার বাঁচা ভুরু কুঁচকেও নয়', অথবা 'মানুষের স্পন্দিত হৃদয়' কবিতাটি, যে অংশে কবির আশ্রয়বাসনার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে চরিতার্থ সমাপ্তির বাসনা।

এই স্বতন্ত্র স্বরের মূল্যায়নে আমাদের ভুল হয় না। নানা অভিজ্ঞতার আলো ঋজু ও তির্যক নানা রেখায় এসে মিলিত হয় অনুভূতির বিন্দুতে। জীবনকেও দিতে চাইতে হবে শিল্পের নিভৃত মর্যাদা। জানতে হবে শিল্প যেমন শিল্পীর প্রতিকৃতি, তেমনই নিসর্গেরও। এটাই "গোধূলিতে জ্যামিতি"র আবহ-সুর।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনির্মল রচনাসম্ভার ১ম খণ্ড। সম্পাদক : নির্মলেন্দু গৌতম ও হরিবন্ধু মুখটি। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন। কলিকাতা। মূল্য ষোল টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গত দুই বছর গ্রন্থাবলীর বছর বলে চিহ্নিত থাকবে। বিদ্যাসাগর রচনাবলীর বিক্রয়সাফল্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বহু প্রকাশক গ্রন্থাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। বাঙালী হুজুগে বলে একটা বদনাম আছে। এ হুজুগটা বেশ চলেছে। তবে অন্যান্য হুজুগের সঙ্গে এ হুজুগের একটা-গুণগত পার্থক্য আছে। বই বিক্রী হওয়াটা খুবই আনন্দের কথা। অনেকেই হয়তো গৃহশোভা বর্ধনের জন্য বই কিনবেন, আবার অনেকে পড়বেনও। চাই কি, অন্যান্য বই কিনতেও উদ্যোগী হতে পারেন। আরেকটি আনন্দের কথা এই হুজুগের ফলে বহু বই প্রকাশিত হচ্ছে যে সব বই বা যে সব লেখক এতদিন প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে ছিলেন। আবার ত্রৈলোক্যনাথের বই পাওয়া যাচ্ছে, মীর মশারফের বই পাওয়া যাচ্ছে এ আমাদের সৌভাগ্য। শিশুসাহিত্যও এ হুজুগের ফলে কিছুটা সুবিধা পেয়েছে। বেশ কয়েকজন প্রকাশক শিশুসাহিত্যের চিরকালের সেরা বইগুলি আবার প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। সুনির্মল বসু গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিশোরসাহিত্য এবং শিশুসাহিত্য দুটিই তার মধ্যে পড়ে। অথচ এ দুটি সাহিত্যের জাত আলাদা। কিশোর-

সাহিত্যের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের কোনো যোগ থাকতে বাধা নেই। বস্তুত সম্প্রতি অত্যন্ত জনপ্রিয় কয়েকটি উপন্যাস মূলত কিশোরদের জন্য লেখা হ'লেও সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের এক সাপ্তাহিকের পাতায়। কিশোরসাহিত্য পড়ে বড়রাও আনন্দ পান কিন্তু শিশুসাহিত্য শিশুর নিজস্ব জগতের ব্যাপার। হারাধনের দশটি ছেলের নানা দুঃখের কাহিনী শিশুদের মন উদ্বেলিত করে। চিরকাল তাদের কথা তার মনে থাকে। শিশুসাহিত্যের পাঠকরা ছোট মাপের দেহ কিন্তু কষ্টিপাথরের মতো মনের অধিকারী। সেই কষ্টিপাথর খুব সহজেই বলে দিতে পারে কোনটা খাঁটি কোনটা বা মেকী। তাই কিশোরসাহিত্য রচনা করা যত সহজ শিশুসাহিত্যিক হওয়া তত সহজ নয়। অন্তত বাংলা সাহিত্য এ দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হবার পরও শিশুসাহিত্যে এর অনগ্রসরতা দেখে সেই সন্দেহই হয়।

শিশুসাহিত্যের দিকপালরা হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার। এ'দের রচনা কালজয়ী। "ঠাকুরমার ঝুলি" আজ পর্যন্ত সমান আদৃত। আজ যখন বাংলা দেশ সাহেব হ'বার বিশ্বামিত্র সাধনায় নিমগ্ন তখনো কেমন করে জানি বুদ্ধু ভুতুম কিংবা দেড় আঙুলেরা টিকে গেছে। কয়েকবছর আগে প্রকাশিত "ঠাকুরমার ঝুলি"র রেকর্ডও হাজার হাজার বিক্রী হয়ে সেই প্রমাণই দিয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের "টুনটুনির বই"এর অন্তত দশটা সংস্করণ বাজারে চলছে এবং প্রত্যেকটারই কাটতি অসাধারণ। যোগীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে কিছুটা অনাদৃত ব্যক্তি। বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর পর্বতপ্রমাণ দানের তুলনায় তাঁর সমাদর নিতান্তই অল্প। তবু "হাসিখুশি", "হাসিরাশি", "হিজিবিজি", "আষাঢ়ে গল্প" আজও শিশুচিত্তজয়ী। সুনির্মল বসু সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী এবং বোধহয় সেই ঐতিহ্যের শেষ চিহ্ন। এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সুনির্মল বসু তাঁর লেখার জাদুতে ছোটদের মনে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। সহজ ভাষায় সরস ভাবে তিনি লিখতেন ছোটদের জন্য। সব কিছুই তিনি লিখেছেন : গল্প কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক। তাঁর "বেড়ে মজা" যেমন সদ্য-পড়তে-শেখা ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়েছে তেমনি আরেকটু বড়রা আনন্দ পেয়েছে "দিল্লীকা লাড্ডু"র গল্পগুলিতে। পাতাবাহারে গল্প আর ছবি আজো চোখবুজলে দেখতে পাই। ত্রিশ আর চল্লিশের দশকে যেসব পূজাবার্ষিকী বেরোত তার একটা বড় আকর্ষণ ছিল শিম্পাজী পরিবারের রঙচঙে মনমাতানো ছবির সঙ্গে সুনির্মল বসুর অসামান্য কবিতাগুলি। সুনির্মল এখন নেই, শিম্পাজী পরিবারের ছবি যিনি আঁকতেন তিনিও আর আঁকেন না। প্রকাশক তাই অন্যদের দিয়ে সেই ছবিগুলি আঁকান এবং কবিতা লেখান। কিন্তু তেমনটি আর হয় না।

বাঙালীর দুর্ভাগ্য সুনির্মলের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই বাজার থেকে সুনির্মলের বই উধাও হয়ে গেল। সংস্করণ শেষ হবার পর ছাপাবার তাগিদ আর কেউ অনুভব করলেন না। ততদিনে বাঙালীরা বুঝে গেছেন যে ছোটদের "ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশীপ" কবিতা শেখানোটাই যুগধর্ম, কমিকস্‌ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সুতরাং সুনির্মলদের প্রয়োজন আর নেই। মাত্র সতেরো বছর আগে মৃত্যু হ'লেও তিনি প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী হয়েছেন।

ভাগ্যে গ্রন্থাবলীর হুজুগ এসেছিল। তাই আজ আবার সুনির্মল বসুর নাম মনে পড়েছে। ৫০টি ছোট গল্প, তিনটি ছোট উপন্যাস, ১৪টি নাটিকা আর চারটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী নিয়ে সুনির্মল রচনাসম্ভার বেরিয়েছে। সেই সব বারবার পড়া গল্প আবার পড়ছি, দেখছি তার উজ্জ্বলতা একটুকু ম্লান হয় নি। স্মৃতিব্যাকুল হয়ে শুধু ভাবছি কি ভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব কীর্তিকে অবহেলা করে চলেছি।

কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ আমাদের কপালে লেখা নেই। নইলে এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থের এত বিশ্রী ছাপা হ'বে কেন। যেমনি নিম্নশ্রেণীর কাগজ, তেমনি ছাপা। ওপরের প্রচ্ছদের কালি হাতে উঠে আসে। বাড়ীতে আনবার আগেই বইটি মলিন লাগে। বই পড়া শেষ হবার আগেই বাঁধাই ঢলঢলে। বইটি ছাপার মধ্যে কোথাও কোনো শ্রদ্ধার নিদর্শন নেই। সবটাই দায়সারা গোছের। সুনির্মল বসুর পাওনা আরেকটু বেশী। অবহেলা বা অবমাননা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবাদ

বিদেশে ঘটনাপ্রধান রচনাকে গুণানুযায়ী আখ্যায়িত করতে 'নভেল', 'ফিক্‌শান' অথবা 'ন্যারেটিভ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়; বাংলা ভাষায় সেখানে শব্দের দৈন্য—উপন্যাস বা নভেল নামে অভিহিতকরণ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। যদিচ ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় বাংলা উপন্যাস নামীয় গ্রন্থরাজিকে যথার্থই উক্ত আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, তা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়; তথাপি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রই বাংলায় একমাত্র ঐতিহ্য এবং মানদণ্ড হিসাবে গণ্য এবং তার প্রতিই আমাদের বিশ্বাসস্থাপনা। অবশ্য পরিণামে যে সার্বত্রিক দুর্দশার নরকে আমাদের নির্বাসন ঘটেছে, সে-সত্যে অচেতন থেকেই প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছেন কালান্তরের ঔপন্যাসিকেরা; কিন্তু ইতিপূর্বেই যে-সর্বনাশ ঘরে ও বাইরে ব্যপ্ত হয়েছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কোন উৎসাহ কদাচ পরিলক্ষিত হয়নি। ইউরোপে শিল্পায়ন এবং তার ফললাভে যে-সামাজিক ও আর্থনীতিক ঘটনাবলী ব্যক্তিজীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিল, সে-সমবেত ঘটনাবলীর সূত্রে উপন্যাসের জন্ম; এবং একপ্রকার জাগতিক মূল্যজ্ঞান যেমন ঔপন্যাসিকের অনায়ত্ত থাকলে, নিতান্ত ভাবুকতায় তার স্বধর্মবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী, তেমনি প্রত্যয় ও প্রকরণও যে সমাজসম্পর্ক বদলের সঙ্গেই রূপান্তরের দাবী জানায়, তা অর্বাচীনেরও অগোচর থাকা পাপ। র‍্যালফ্ ফক্স যদিচ বুর্জোআ সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে উপন্যাসেরও ভিন্ন প্রকার পরিণামের চিন্তায় কিছু অতিশয়োক্তিই করেন, তথাপি প্রাথমিক সত্য হিসাবে তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ এখানে অনিবার্য : —The novel is the epic art form of our modern, bourgeois, society; it reached its full stature in the youth of that society, and it appears to be affected with bourgeois society's decay in our time. কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্ভবের প্রশ্নই নয়, ব্যক্তিচেতনায় বিশেষ সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াও উপন্যাস রচনাক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর। এবং প্রায় সকল অর্থেই ঔপন্যাসিককে কার্যত কঠিন প্রয়াসেই আয়ত্ত করতে হয় সামাজিক প্রতিনিধিত্ব। কারণ চেতনার উজ্জীবনের ধাপগুলি নিতান্ত সামাজিক সংঘটের ফলাফল, এ-ধারণায় শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক জড়বাদই প্রশ্রয় পায়। অন্যথায় এতাবৎ লিখিত বাংলা ভাষায় লিখিত কাহিনীগুলি উপন্যাসেরই মর্যাদা পেত; অনাদৃত হতো না নিতান্ত কেচ্ছা-কাহিনীরূপে। এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, 'শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ

পৌরস্ত্রী'—বিজ্ঞ মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েই লজ্জায় অধোবদন হতে হতো না একালীন শিল্পীসমাজকে।

অবশ্য যে-আত্মতৃপ্তির কারণে বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের অনাসৃষ্টিকেই শিল্পের পরাকাষ্ঠা ভাবেন, তা যে কেবলমাত্র তাঁদের অজ্ঞতাপ্রসূত তাই নয়, তাদের অক্ষমতাও অন্যতম প্রধান কারণরূপে চিহ্নিত হতে পারে। একান্তভাবে বাজার-কাটতিকেই যাঁরা পরমার্থজ্ঞান করেন, তাঁদের বিষয়ে কোন গুরুত্ব না দিয়েও, যে-সৎ ও পরিশ্রমী ঔপন্যাসিকেরা যথার্থই সৃষ্টিতে আন্তরিক, তাঁদের ব্যর্থতাই প্রধান আলোচ্য এবং এর কারণের অনুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের সৃষ্টিকর্মের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্বই প্রধান; তাঁকে একক প্রয়াসে যেমন একদিকে অতীত প্রয়াসের মূল্যায়নে নিরত হতে হয়, তেমনি ভবিষ্যতের সামনেও উচ্চারণ করতে হয় কঠোর সতর্কবাণী। দুর্ভাগ্য যে বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় এবম্প্রকার সমালোচকের আবির্ভাব ইতিপূর্বে ঘটেনি; ভালো বা মন্দের অর্থহীন সংজ্ঞায় এতাবৎ বাংলা উপন্যাসের আলোচনা সীমাবন্ধ থেকেছে; সামাজিক কারণসমূহ, প্রকরণগত দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রধান বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভবত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে লিখিত তাঁর 'তারাশঙ্কর' সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতেও কোন চিন্তাবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় নি। তথাপি উক্ত বিষয়ের আলোচনায় তিনিই আমাদের কুলগুরু এবং তাঁর আকরগ্রন্থের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ভিন্ন আমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হতে বাধ্য। অবশ্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার বা অচ্যুত গোস্বামী প্রমুখের নাম আমার অপরিজ্ঞাত নয়। তারাশঙ্কর বিষয়ে কার্তিক লাহিড়ীর আলোচনা ('ঐতিহ্য প্রগতি তারাশঙ্করের উপন্যাস'; "এক্ষণ" পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৮) সাম্প্রতিক আলোচনাক্ষেত্রে উদাহরণযোগ্য।

কিন্তু কার্তিক লাহিড়ীর যে গ্রন্থটিকে* কেন্দ্র করে বর্তমান আলোচনা, তার বিষয়-বস্তু মুখ্যত ঐতিহ্যের স্বরূপ নির্ধারণ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যার মধ্যমণি, এবং বিষয় প্রধানত 'বক্তব্য রূপায়ণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও রীতি'। বিস্তারিত আলোচনার স্বার্থে লেখক সমগ্র বিষয়টিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন : (ক) ঘটনা-প্রধান উপন্যাস, (খ) মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, ও (গ) মননধর্মী-উপন্যাস। এবম্প্রকার পর্ববিভাগে সংশয় থাকা স্বাভাবিক এবং সে-সংশয় থেকে লেখকও মুক্ত নন। তথাচ স্বদেশে ও বিদেশে লেখকমাত্রেই অবগত যে এরূপ স্থূল পর্ববিভাগ করা ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই। ব্যাপারটা যে কোন ক্ষেত্রেই আপোষ নয়, এ-তত্ত্ব পপ্-ইন্‌টেলেক্‌চুয়লদের বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক এবং রিচার্ডসের গ্রন্থ রচনা ও ক্লিয়েন্থ ব্রুক্‌স্, উইলিয়ম উইম্‌স্যাট বা রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর পদ্ধতি প্রয়োগেই যে আধুনিকতার চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া চলে এ-মতামত উক্ত বুদ্ধিজীবীদেরই যোগ্য। যদিচ সামান্যতম সুস্থবুদ্ধি ও বিষয়টির ওপর সশ্রদ্ধ আগ্রহ থাকলেই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারতেন ক্লোদ্ ভিগ্নে', লেঅঁ তোরাঁ, এমানেল্ রোবে কিংবা আর্মা রেনাঁ প্রমুখকে, যাঁদের প্রথাসিদ্ধ সমালোচনাতেই যথার্থ ব্যাখ্যাত হয়েছেন কামু বা সার্ত্র এবং প্রায় একই সঙ্গে ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের ঐতিহ্য। অবশ্য সাহিত্য বা শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক; এমনকি লেখক নিজেও সামান্যকাল পরেই নিজের বক্তব্যে সন্তুষ্ট থাকেন না, হার্বার্ট রীড যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কার্তিক লাহিড়ী নিজেও ভূমিকায় লেখেন, 'গ্রন্থের সমস্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি এখন একমত নই, এমন

* বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি : ডঃ কার্তিক লাহিড়ী। সারস্বত লাইব্রেরী।

কি এখন লিখলে হয়ত এভাবে লিখতাম না'। সুতরাং অনস্বীকার্য যে বিষয়টি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায় এবং লেখককেও কখনও কখনও বিরোধী পক্ষেই দাঁড়াতে হয়। কিন্তু আপাতত এবম্প্রকার বিতর্কে আমার অনীহা।

পূর্বেই উল্লেখিত যে কার্তিক লাহিড়ীর আলোচনা প্রধানত বাংলা উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়ে; যদিচ প্রত্যয় ও প্রকরণের সংযুক্তিতেই উপন্যাস এবং একের অভাবে অন্যের স্বরূপ নির্ণয় যথার্থই অসম্ভব, তথাপি নামত এই আংশিক বিষয়ের আলোচনা তাৎপর্য হারায় না সম্ভবত এ-কারণেই যে উপন্যাস ও শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যেকার ভেদরেখা শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়; সেকারণেই রূপকল্প ও প্রযুক্তির প্রসঙ্গেই অনিবার্যভাবেই দৃশ্যমান হয় প্রত্যয়ের স্বরূপ, যা স্বভাবতই উপন্যাসের আত্মাকেও ক্ষণিক আভাসে পাঠকের গোচরীভূত করে। যদিচ লেখক এখানে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মেনে নিয়েই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, 'বক্ষ্যমান আলোচনায় উপন্যাসের আত্মা অপেক্ষা শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ব'লে আলোচনাটি সমালোচককের বিচারে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য, যেহেতু আত্মা ও শরীরের হরিহর মিলনই সজীবতা, সম্পূর্ণতা।'

প্যারীচাঁদ মিত্রের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে "আলালের ঘরের দুলাল"-কে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি দিয়েই লেখকের আলোচনার সূত্রপাত। না-মেনেও উপায় নেই, কারণ তাহলে তো অস্বীকার করতে হয় স্পেনে "লাইফ অব দা জারিল্লো দে তরমিস"-এর ভূমিকা, যা পরবর্তীকালে সম্ভবপর করে পিকারো উপন্যাসের সৃষ্টি। লেখকের বিবেচনায় এই পর্বের নামকরণ, 'ঘটনা-প্রধান উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের প্রস্ন পর্যায়', ব্যাপ্তি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-প্রসঙ্গে লেখকের যুক্তির উল্লেখ অনিবার্য, 'বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনাপরম্পরার বিবরণদানই চূড়ান্ত নয়, উপন্যাসে স্বীয় বক্তব্য ও তত্ত্বপ্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তৎপর ও মনোযোগী পুরুষ সত্যই দুর্লভ। জীবনের বিভিন্ন, বা সময় সময় একই সমস্যা রূপায়ণের জন্য তাঁর প্রযত্ন বিস্ময়ের; এবং উপন্যাসের আদি কর্মিকের পক্ষে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকা অবশ্যই দুঃসাহসিক। কিন্তু বক্তব্য বা তত্ত্বপ্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বহির্ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সংলাপ বা পরিবেশ চিত্রণে বঙ্কিম-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর অন্তরের চিত্র বহুসময় সুতীব্র উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়, তবু সমগ্র উপন্যাসে বহির্জগৎ ও ঘটনার আধিপত্য সর্বদা প্রবল ও প্রকট। সেজন্য বঙ্কিম-উপন্যাস, আমাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হলেও 'ঘটনাপ্রধান উপন্যাস' রূপেই চিহ্নিত।' প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ অল্প। তাঁর বয়স্ক মননে বাংলা উপন্যাস যে কেবল সাবালকত্ব অর্জন করেছে তাই নয়, তিনিই প্রথম আমাদের সচেতন করেন ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববোধ বিষয়ে। এতাবৎকালের বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় বঙ্কিম-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর পরিচয়, 'জীবনের অপরিমেয় অতলস্পর্শ গভীরতা' (?) ইত্যাদি বহু শব্দসম্ভারসম্বলিত আলোচনা হয়েছে কিন্তু কদাচ কোন ভাবনায় বিশ্লেষিত হয়নি কেন তিনি সামাজিক উপন্যাসের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী না হয়ে একান্তভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন, অথবা কোন সামাজিক কার্যকারণসূত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত, তাঁর উপন্যাসকেই

বিপর্যস্ত করেছে। এ-সমস্যাবলী কার্তিক লাহিড়ীর বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত নয়, তথাপি 'ঔপন্যাসিক ও নীতিবিদের দ্বন্দ্ব' নামীয় অংশে প্রসঙ্গক্রমে যে সূত্রাবলীর উল্লেখ করেন তা সর্বাংশে পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে। অবশ্য অনস্বীকার্য যে প্লটের বিবেচনায় এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতার সঙ্গে উক্ত সূত্রের যোগাযোগ কিছুমাত্র অবহেলার নয়।

দ্বিতীয় পর্ব, 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের নব পর্যায়' মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাস (যা লেখকের বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস) থেকে সুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সূত্রপাতে লেখকের বক্তব্য, পাত্র-পাত্রীর সজীবত্ব অনেকখানিই মনস্তত্ত্বে বিধৃত, কারণ অভিজ্ঞতা বস্তুনির্ভর হলেও অভিজ্ঞতার আত্মমুখীন বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য। ঘটনা-উৎক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে বা বিশেষ মুহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে, সেই প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এবং এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচিত পদ্ধতি মনোবিকলনমূলক, এ-পদ্ধতি চরিত্রের আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে ব'লেই মনস্তত্ত্বমস্লক উপন্যাসে আকস্মিক অতর্কিত অসম্ভব ঘটনার সংখ্যা প্রায় শূন্য। লেখককৃত এই পর্বটি জটিল ও বিতর্কের বিষয়। কারণ ঔপন্যাসিককৃত পাত্র-পাত্রীর ভাষা স্বগতোক্তিরূপে হলেই তা মনস্তত্ত্বসম্মত হয় না বা তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না। কারণ তত্ত্ব হিসাবে এ-সত্য অনস্বীকার্য যে অবচেতন ও অচেতন মনই মানুষের চেতনমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর যেহেতু এই অচেতন মন মানুষের আয়ত্তাতীত, সেহেতুই বহুলাংশে তার অসহায়তা। তদুপরি চেতনমনের অজ্ঞাতে উক্ত প্রক্রিয়ায় মানসিকতার জন্ম হওয়াতে, ব্যক্তির জাগতিক কর্মকাণ্ডও বহুলাংশে তার আয়ত্তাধীন নয়। এইপ্রকার আকস্মিকতালব্ধ মানসিকতা থেকে ব্যক্তিচেতনার উন্মেষের ফলে জাগতিক বহু সংঘাতের সূত্রপাত। হৃদয়বৃত্তিজনিত এই বিভিন্নতা অবশ্যই শিল্পীর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু মন ও শরীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে, ইউঙ্গ-এর ভাষায়, 'সাইকো-ফিজিওলজিকাল ইন্সটিঙ্কটস অ্যান্ড রিফ্লেক্সেস'-এর প্রয়োগ সকল অর্থেই দুরূহ। সম্ভবত এ-কারণেই বাংলা উপন্যাস মনস্তাত্ত্বিকের আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু তার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হবার দাবি যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি স্ট্রীম অব কনসাশনেস-এর লেবেল যে-সব বাংলা উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত, সেগুলির ক্ষেত্রেও উক্ত মন্তব্যই প্রযোজ্য।

সম্ভবত উক্ত তত্ত্বাবলী কার্তিক লাহিড়ীর অগোচর নয় এবং কার্যত এ-কারণেই উক্ত পর্বে বিধৃত অনেক উপন্যাস বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন থেকেই যায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য যে "রজনী" প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'অন্ধের রূপোন্মাদের তির্যক্, চক্ষুহীনতায় প্রতিরুদ্ধ, অভিব্যক্তি, শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া তাহার দেহমনে প্রেমের অমৃতস্পর্শ সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে' ('বাংলা উপন্যাস')—স্বীকার করেই কার্তিক লাহিড়ী লেখেন, 'শচীন্দ্রের প্রথম স্পর্শের সময়, জলমগ্ন হওয়ার পূর্বমুহূর্তে রজনীর অনুভূতি, নিবিড় সুখ ও দুঃখ বোধের আলেখ্যটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।" এই মন্তব্যে সর্বাংশে আমি ঐক্যমত নই, সম্ভবত বলা উচিত উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। বরং কয়েক লাইন পরেই শচীন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য : 'শচীন্দ্রর কথা আপাতদৃষ্টিতে মনস্তত্ত্বমূলক মনে হলেও, আসলে এগুলি লবঙ্গর ভাষায় 'সন্ন্যাসীর কীর্তি'। আরও কয়েকটি স্থানের প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসাগুলি নাটকের স্বগতোক্তির মতই এক প্রকারের উচ্চারিত

সংলাপ।" এই পর্বে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসটিকেও আমি যথার্থ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে নারাজ, যদিচ লেখকের মতে, এই উপন্যাসে 'লেখকের বক্তব্য উপন্যাসের সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত, সেজন্য চরিত্রগুলি লেখকের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে না, প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ও সজীব, এবং উপন্যাসটির জগৎ আমাদের দৈনন্দিন জগৎ থেকে দূরে অবস্থিত নয় বলেই "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসই নয়, প্রথম বাস্তব উপন্যাসও বটে।' এই উপন্যাসে অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে রচনার যথেষ্ট উপকরণ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন ? আর পারলে কি নায়িকা বিনোদিনীর আকাশলোকবিহারী স্বপ্নময়তা মাটির স্পর্শ পেত না ? আর কেবলমাত্র জৈবিক আত্মনিবেদনে তার নিয়তি নির্ধারিত হতো লেখকের হাতে ? বিনোদিনীর এই আত্মনিবেদনের মুহূর্তে যেখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করেছেন ! আত্মকথাকে সর্বদা মনস্তত্ত্বের আখ্যায় অভিহিতিকরণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাচর্চাকে প্রশ্রয় দেয় না।

তৃতীয় পর্ব, 'মননধর্মী উপন্যাস : বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা'। মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের আধুনিকতা এই পর্বের আলোচ্য। কার্তিক লাহিড়ীর বক্তব্যে, মার্সেল প্রুস্ৎ, ডরোথি রিচার্ডসন্, ও জেমস জয়েসের পুস্তকাবলীতে যে আধুনিকতার সূত্রপাত, প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এঁদেরই সহযাত্রী। ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গেই সিনক্লেয়ার ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্ট্রীম অব কনশাসনেস কথাটির প্রয়োগ করেন। এই চৈতন্যপ্রবাহ সম্পর্কে উইলিয়ম জেমস্-এর বক্তব্য, consciousness does not appear to itself chopped up in bits . . . It is nothing jointed, it flows. Let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life. বাংলা উপন্যাসে ডরোথী বা জেমস্ জয়েসের তুলনা খোঁজা অর্থহীন, এমনকি সাম্প্রতিক কালেও; তথাচ "চতুরঙ্গ"-এর শিথিল ও অযত্নবিন্যস্ত আঙ্গিকের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের যে মননশীলতা প্রকাশ পায়, তাকে আধুনিক নামকরণে আপত্তির হেতু নেই। দামিনীর আধুনিকতর স্বরূপ বিষয়ে কার্তিক লাহিড়ীর বক্তব্য এ-কারণেই যথার্থ : সে আত্মপরিচয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যগ্র। সেজন্য বিলাসের মত মাঝারি গোছের ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘর বাঁধার সংকল্প সমস্ত দিক থেকেই দামিনীর পক্ষে ট্র্যাজিক। শচীশ দামিনীর আইডিয়া, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ও প্রেম, অথচ সেই আইডিয়া মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস বলেই এত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই ট্র্যাজিডি পরিবেশ বা বহিঃশক্তির ক্রিয়া নয়, দামিনীর অস্তিত্বের মূলেই নিহিত। এর ফলেই সে আত্মসচেতন, তাই আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের জন্য এত হাহাকার। এবং এইখানেই সে আধুনিক ব্যক্তি, মাত্র নারী নয়। আর এজন্যই সে নিজে বিপন্ন, এবং সমস্ত জীবন (নিজের সত্তার প্রতিরূপ দেখার পর) অতৃপ্তি ও অতুষ্টির দাবানলে প্রজ্বলিত ও হাহাকারে মরুর মত ধূধূ।'

এই গ্রন্থে উপসংহারের পূর্বে 'আখ্যানভঙ্গী' ও 'ভাষা' নামীয় দুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযুক্ত করেছেন লেখক। এবং স্বীকার্য যে এই যোজনা ভিন্ন তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ হতো না। আমার ধারণায় এই গ্রন্থের উপসংহারটি সবিশেষ মূল্যবান এবং তা থেকে কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া কর্তব্য : 'আমাদের আলোচনার সীমা প্রথম যথার্থ উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" থেকে "চার অধ্যায়" পর্যন্ত প্রসারিত। তবু এ-বিচারণা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র,

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কেন্দ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক মনন, এবং শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এই পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। আমরা ভাবাবেগতাড়িত জীব, তাই অতি সহজে শরৎচন্দ্রের ভাবালুতায় গা ভাসিয়ে চিন্তা-ভাবনা-বর্জিত উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ অভিধায় ভূষিত করি, সেই ভাবাবেগের তাড়নায় বলি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা ও অক্ষমতা শরৎচন্দ্র অতিক্রম করেছেন এবং শরৎ-উপন্যাস বাঙালী জীবন ও বাঙালী ঘরের অকপট প্রতিছবি।...বাংলা গদ্যের রূপ স্থিরীকৃত ক'রে ঘটনার বিবরণের মধ্যে জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান কৃতিত্বের সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃতিত্বের অধিকারী। উপন্যাস রচনা যে মননের ব্যাপার, সেই কথাটি বঙ্কিম-উপন্যাস পাঠ করলে সহজে বোঝা যায়, অবশ্য বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের হাতেই যৌবন লাভ করেছে...' তথাপি, 'স্বীকারে লজ্জা নেই যে বিশ্বের অনবদ্য উপন্যাস-সাহিত্যের পাশে রাখার মত বাংলা সাহিত্যের একটি উপন্যাসেরও নাম করা যায় না।'

উক্ত মন্তব্যে কোন নতুন সত্য নেই এবং ইতিপূর্বেও হয়তো বলা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ এ-নয় যে একবার উচ্চারিত হলেই সে-সত্য উচ্চারণে পরবর্তী লেখকের আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোচে। আর বাংলা উপন্যাসের সঙ্কট ঘোচাতে কবিতার প্রয়োগ? সে উপন্যাসের পক্ষে বাড়তিই হোক বা কমতিই হোক, তা এই শ্রীচৈতন্যের দেশে উপন্যাসের অপমৃত্যুর কারণরূপেই প্রতিভাত হবে এবং কোনক্রমেই তা কোন মঙ্গল বহন করে আনবে না। "কপালকুণ্ডলা" ও "চতুরঙ্গ"-এর যেটুকু ব্যর্থতা তা অবশ্যই উক্ত কারণে; আর "শেষের কবিতা"? সে প্রশ্ন না তোলাই শ্রেয়। আর কার্তিক লাহিড়ীর ভাষা? না, একেবারেই সুধীন্দ্রনাথ-অনুসারী নয়, অবশ্য হলে আমিই সর্বাধিক আনন্দিত হতাম; কিন্তু যাঁদের সামান্যতম ভাষাজ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন সে-ভাষার অনুসরণ কী দুরূহ, কী পরিমাণ আয়াসসাধ্য!

নির্মল ঘোষ

লেখকের উত্তর

কার্তিক লাহিড়ীর "বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি"র পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীনির্মল ঘোষ বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯) আমার লেখা সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। অবশ্য নামোল্লেখ করেননি কোথাও।

আমার আপত্তি ছিলো, বইটির পর্ববিভাগের মধ্যেই কার্তিকবাবুর আপোষপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। নির্মলবাবু লিখেছেন, 'সবদেশে ও বিদেশে লেখকমাত্রেই অবগত যে এবম্প্রকার স্থূল পর্ববিভাগ করা ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই।' কেন নেই, বুঝতে পারলাম না। তাহ'লে কি এ-বিষয়ে সব বই-ই এই এক ছাঁচে লিখতে হবে? লেখকের কলমের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বয়লুও শিউরে উঠতেন নিশ্চয়ই। নির্মলবাবুর কাছে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অজানা নয়—তিনি নিজেই লিখেছেন। কিন্তু "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" বইটি তাঁর পড়া থাকলে দেখতে পেতেন, স্বল্প পরিসরে হ'লেও, আঙ্গিক আলোচনার ভিন্নতর পদ্ধতি বিদেশী ভাষায় নয়, বাঙলাতেই আছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ের স্বরূপ প্রযুক্তির আলোচনায় অবশ্যই আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় তো স্বয়ম্ভু নয়, তার শেকড় কোথায় ও কতো গভীরে, কীভাবে ও কোন্ মূল্যে সে-

প্রত্যহ অর্জিত (উপন্যাসের পরিভাষায় এই সমগ্রতাকেই বলে 'প্যাটার্ন')—আগের লেখাতেই বলেছিলাম, কার্তিকবাবুর বইতে সে-আলোচনার বিন্দুবিসর্গও আছে কি? থাকতে পারেও না, কারণ কার্তিকবাবুর মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

কার্তিকবাবুর সাফাই যে তিনি তাঁর বইয়ের সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখন আর একমত নন—নির্মলবাবু মেনে নিয়েছেন। মনে হয়, তিনি ভক্ত মানুষ। তিনি মানুন। আমার বক্তব্য : যদি তিনি একমত নন, যদি এভাবে লেখা এখন তাঁর মনোমতো না-হয়, তাহ'লে এভাবে বই তিনি ছাপতে দিলেন কেন? ৮ মে ১৯৭২ তারিখে লেখা 'লেখকের কথা ও কৃতজ্ঞতা'য় ডঃ লাহিড়ী লিখেছেন, বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর ডি. ফিল. গবেষণাপত্রের 'আদ্যন্ত সংশোধিত পরিমার্জিত একটি সহজপাঠ্য রূপ'। বইটির প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার এক, আর উপন্যাস কাব্য হ'য়ে-ওঠা অন্য ব্যাপার। "শেষের কবিতা"য় কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। "চতুরঙ্গ" কাব্য হ'য়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য সত্ত্বেও যদি রঘুনন্দন রামমোহন বাঙলাদেশে জন্মে থাকেন, তাহ'লে মহৎ ঔপন্যাসিক জন্মাতে বাধা কোথায়? উপন্যাসের অপমৃত্যু ঘটার দায় তাঁর হ'তে যাবে কেন? আর কাব্যাশ্রয় মঙ্গলজনক হবে কিনা সে তো নির্ভর করবে ঔপন্যাসিকের ক্ষমতার ওপর।

পঞ্চম, কার্তিকবাবুর লেখায় সুধীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণচেষ্টা আছে কিনা তা ভাষাজ্ঞানীরাই বিচার করবেন। সে-ভাষার অনুসরণ 'দুরূহ' ও 'আয়াসসাধ্য' ব'লেই আয়াসের অভাবে শব্দের সংঘট্ট ঘটে মাত্র। নির্মলবাবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও অবশ্য তা ভালোভাবেই জানবেন।

জেম্‌স্-এর যে-উদ্ধৃতি নির্মলবাবু উৎকলন করেছেন, সেটি যে-বইতে আছে তার প্রকাশকাল ১৮৯০। মে সিন্‌ক্লেয়ার লিখছেন ১৯১৮-য়। তাহলে স্ট্রীম অব কনসাশনেস শব্দবন্ধ সিন্‌ক্লেয়ার 'প্রথম' প্রয়োগ করলেন কীভাবে? আসলে এটা শিশির চট্টোপাধ্যায়ের "উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা" (পৃ. ২৬) অন্ধভাবে অনুসরণের ফল।

সাহিত্যে কোনো-একটি পদ্ধতি প্রয়োগে আধুনিকতার চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া চলে—এ-কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা পপ্-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কেন,—আশিক্ষিত। কিন্তু তাই ব'লে তার মধ্যে কোনো 'শিক্ষণীয় ইঙ্গিত' গ্রহণেও যাঁরা নারাজ, তাঁরা কী?

স্বপন মজুমদার

স্থানাভাবে বর্তমান সংখ্যায় "রাজনগর" প্রকাশিত হলো না।